শমথ ও বিদর্শন ভাবনার পূর্ণাঙ্গ গাইড

জানা ও দেখা

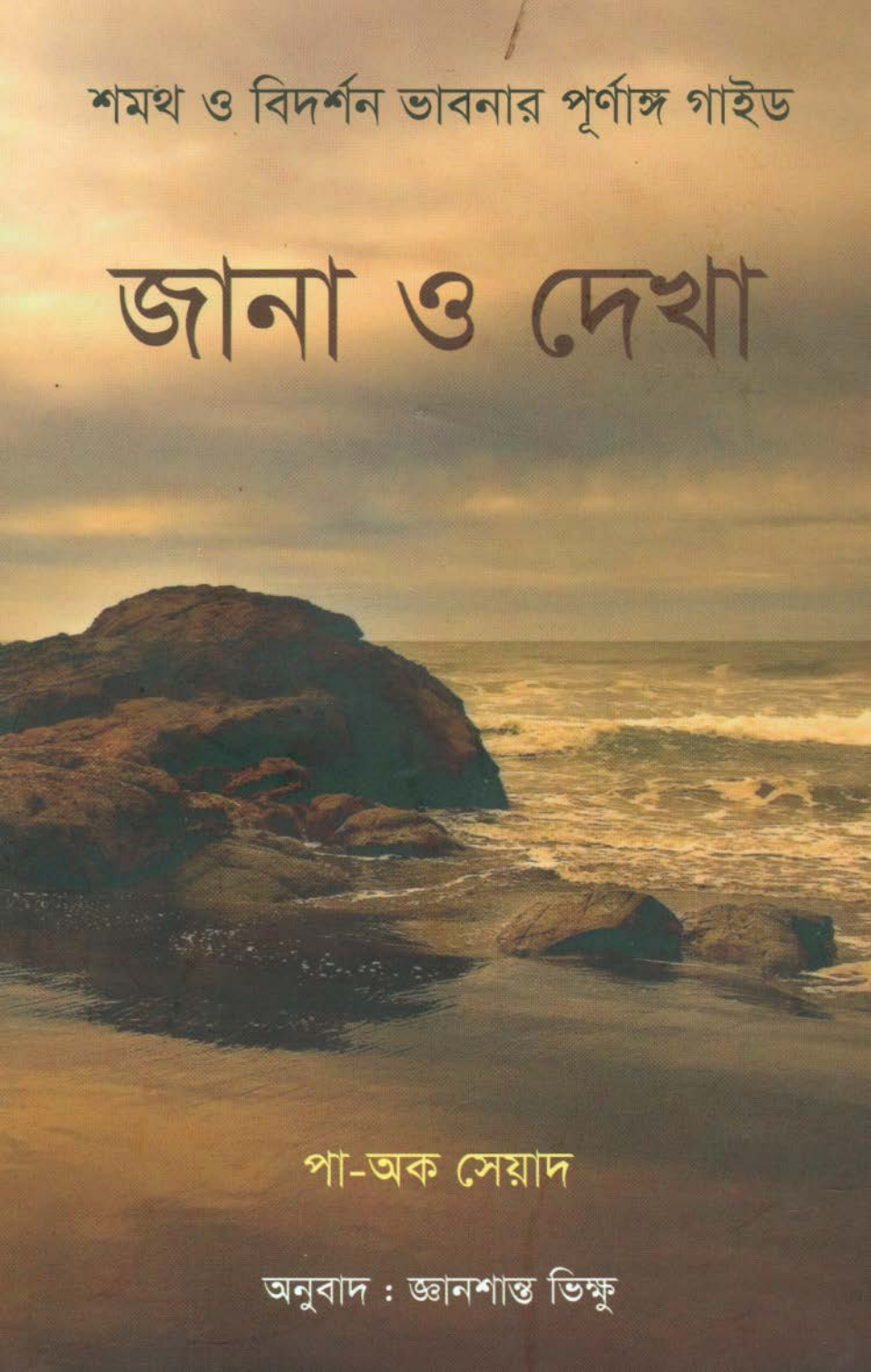

পা-অক সেয়াদ

অনুবাদ : জ্ঞানশান্ত ভিক্ষু

জানা ও দেখা

[Knowing and Seeing]

[শমথ ও বিদর্শন ভাবনার পূর্ণাঙ্গ গাইড]

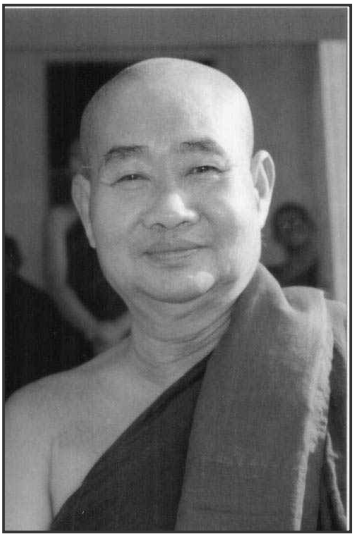

পা-অক সেয়াদ

অনুবাদ : জ্ঞানশান্ত ভিক্ষু

কল্পতরু

রাঙামাটি ৪৫০০, বাংলাদেশ

জানা ও দেখা

পা-অক সেয়াদ
অনুবাদ : জ্ঞানশান্ত ভিক্ষু
গ্রন্থস্বত্ব : লেখক
প্রথম প্রকাশ : পৌষ ১৪২০, ডিসেম্বর ২০১৩
দ্বিতীয় প্রকাশ :
প্রকাশক : কল্পতরু, রাঙামাটি ৪৫০০, বাংলাদেশ
প্রচ্ছদ পরিকল্পনা : ভদন্ত করুণাবংশ ভিক্ষু

শ্রদ্ধাদান : ১৫০ টাকা

Knowing and Seeing
by Pa-Ak Sayadaw
Translated by Gansanto Bhikkhu
Published in Bangladesh by Kalpataru
Rangamati 4500, Bangladesh
e-mail : kbangsharg@gmail.com

Price : Taka 150 only

পা-অক সেয়াদের জীবনী

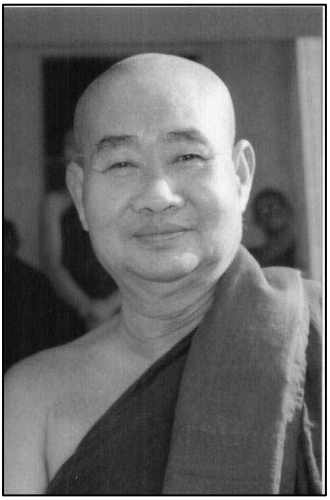

আচিণ্ন ভন্তে, সাধারণত যাকে 'পা-অক সেয়াদ' অথবা 'পা-অক তয়া সেয়াদ' বলা হয়, তিনি বর্তমানে মায়ানমারের মন প্রদেশের (Mon State) পা-অক বনবিহারের অধ্যক্ষ এবং প্রধান গুরু। 'সেয়াদ' একটি বার্মিজ সম্মানসূচক উপাধি, যার অর্থ হচ্ছে 'শ্রদ্ধেয় শিক্ষক'।

সেয়াদের জন্ম ১৯৩৪ সালে, মায়ানমারের রেঙ্গুনের প্রায় একশ মাইল উত্তর-পশ্চিমে হিনথদ নামের একটি মফস্বল শহরের লেই-চোং নামের গ্রামে। ১৯৪৪ সালে দশ বছর বয়সে তিনি তার গ্রামের একটি বিহারে শ্রামণ হিসেবে প্রব্রজ্যা নেন। পরের এক দশক ধরে তিনি সাধারণ পড়ুয়া-শ্রামণ হিসেবে জীবনযাপন করেন এবং বিভিন্ন গুরুর অধীনে পালি ত্রিপিটক শিক্ষা করেন। তিনি শ্রমণ থাকা অবস্থায় তিনটি পালি ভাষা পরীক্ষায় পাস করেন।

১৯৫৪ সালে বিশ বছর বয়সে সেয়াদ ভিক্ষু হিসেবে উপসম্পদা লাভ করেন। ১৯৫৬ সালে তিনি মর্যাদাসূচক ধম্মাচারিয়া পরীক্ষায় পাস করেন। এটি পালি শিক্ষায় বিএ পাসের সমমান এবং এতে করে তাকে 'ধর্মাচার্য' খেতাবে ভূষিত করা হয়।

পরবর্তী আট বছর ধরে তিনি ধর্মের অনুসন্ধানে সারা মায়ানমার চষে বেড়ান এবং বিভিন্ন বিখ্যাত গুরুর কাছে ধর্ম শিক্ষা করেন। ১৯৬৪ সালে তার দশম বর্ষায় তিনি তার ভাবনা চর্চায় জোর দেন এবং অরণ্যে প্রবেশ করেন। পালি ত্রিপিটক সম্বন্ধে পড়াশোনার পাশাপাশি তিনি সেই সময়কার বিখ্যাত এবং সম্মানিত ভাবনা গুরুদের কাছ থেকে অনেক মূল্যবান নির্দেশনা খুঁজে নেন।

পরের ষোল বছর ধরে তিনি অরণ্যে ভাবনা করাকেই তার প্রধান কাজ

হিসেবে নেন। তিনি সেই বছরগুলো কাটিয়েছিলেন মায়ানমারের দক্ষিণ অংশে, মন প্রদেশে (Mon State)। এই সময়ে তিনি খুব সাদাসিধে জীবনযাপন করতেন, পুরো সময়টা ভাবনা ও পালিশাস্ত্র পড়ে কাটাতেন।

১৯৮১ সালে তিনি পা-অক বনবিহারের অধ্যক্ষ অগ্গপঞ্ঞা ভন্তের কাছ থেকে একটি বার্তা পান। সেখানকার অধ্যক্ষ মুমূর্ষ অবস্থায় আছেন এবং আচিণ্ণ ভন্তেকে তার বিহারের দেখাশোনার ভার নিতে বলেছেন। পাঁচ দিন পরে অগ্গপঞ্ঞা ভন্তে মারা যান। বিহারের নতুন অধ্যক্ষ হিসেবে আচিণ্ণা ভন্তে পরিচিত হন 'পা-অক তয়া সেয়াদ' নামে। যদিও তিনি বিহার পরিচালনার কাজ তত্ত্বাবধান করতেন, তবে বেশির ভাগ সময় কাটাতেন নির্জনে, বিহারের উত্তরের জঙ্গলের অংশে একটি বাঁশের তৈরি কুটিরের মধ্যে। ১৯৮৩ সাল থেকে ভিক্ষু এবং গৃহী লোকজন তার কাছে ভাবনা শিখতে আসতে থাকে। বিদেশি ভাবনাকারীরা বিহারে আসতে শুরু করে ১৯৯০ এর শুরুর দিকে। সেয়াদের সুনাম ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়তে থাকে আর উত্তর বিহারের সেই জঙ্গলে আড়াই শ'রও বেশি কুটির গড়ে ওঠে। এই অঞ্চলটি উপরের বিহার (Upper Monastery) হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। সেখানে পুরুষদের জন্য দোতলা ভাবনা হল, একটি লাইব্রেরি (সাথে অফিস, কম্পিউটার রুম, এবং নিচের তলাগুলোতে পুরুষদের ডর্মিটরি), একটি ক্লিনিক, একটি হাসপাতাল, একটি পিন্ডদানের হল, একটি দোতলা ভোজনশালা, এবং একটি অভ্যর্থনা কক্ষ ও সেয়াদের জন্য একটি বাসভবন নির্মিত হয়। নিচের বিহারে (Lower Monastery) একশ আশিটিরও বেশি কুটির আছে, একটি নতুন রান্নাঘর, এবং মহিলাদের জন্য একটি তিনতলা ভাবনা হল এবং একটি পাঁচতলা ডর্মিটরি আছে। ত্রৈমাসিক বর্ষাবাসের সময় বিহারের মোট ভিক্ষুর সংখ্যা গড়ে ছয় শ থেকে সাত শ জন থাকে। গৃহী ভাবনাকারী লোকজনসহ মাঝে মাঝে উৎসবের সময় বিহারের আবাসিক জনসংখ্যা পনেরশ জনের ঊর্ধ্বে চলে যায়।

১৯৯৭ সালে সেয়াদ তার ভাবনা-পদ্ধতির বিস্তারিত সবকিছুকে পাঁচ খণ্ডের বিশাল একটি বইয়ের আকারে প্রকাশ করেন, নাম- *যে চর্চা নির্বাণে পৌঁছে দেয়* (The Practice that Leads to Nibbana), যেখানে পুরো ভাবনাশিক্ষা পদ্ধতিটি বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং পালিশাস্ত্র থেকে প্রচুর উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে; তবে এটি বর্তমানে কেবল বার্মিজ ও সিংহলিজ ভাষায় পাওয়া যাচ্ছে। ১৯৯৯ সালের ৪ জানুয়ারি, সেয়াদের অর্জনের স্বীকৃতিস্বরূপ সরকার তাঁকে *অগ্গমহাকম্মট্ঠানাচারিয়* উপাধিতে ভূষিত করে। ❑

অনুবাদকের কথা

ভাবনা বা ধ্যান বিষয়ে আমার অভিজ্ঞতাগুলো আগ্রহী সবার সাথে শেয়ার করা দরকার বলে মনে করেই এই ছোট্ট লেখা। আমি গৃহী অবস্থায়ও আনাপান ভাবনা করতাম আধ ঘণ্টা বা তারও বেশি সময় ধরে, যদিও তা খুব অনিয়মিতভাবে। দুয়েকদিন নিয়মিত ভাবনা করতাম, পরে আবার কয়েকদিন গ্যাপ হতো। প্রব্রজ্যা নিলাম সারা দিন ভাবনা এবং চংক্রমণে কাটাব এমন সংকল্প নিয়ে। আধ ঘণ্টা ভাবনা, এরপর চংক্রমণ, আবার ভাবনা, আবার চংক্রমণ—এভাবে যতক্ষণ না সন্ধ্যা হয় সারা দিন ধরে, কেবল খাওয়া এবং প্রয়োজনীয় কাজগুলো বাদে।

এভাবে একাগ্র মনে ভাবনা করতে গিয়ে একদিন হঠাৎ আমার সামনে কেবল পানি এসে হাজির হলো। শান্ত পুকুরের পানির মতো নিস্তরঙ্গ এবং দিগন্ত-বিস্তৃত। আমার সামনে যেন হঠাৎ করে কাপ্তাই লেকটি ভেসে উঠল। আমি আচমকা এমন পানি-নিমিত্ত দেখে কিছুটা হতবুদ্ধি হলাম। ছোট বেলায় আমি যখন ভাবনা করতাম তখন একটু একাগ্র মন হলেই দেখতাম, ছোট্ট পাহাড়ি ঝরনা থেকে পানি গড়িয়ে পড়ছে, অথবা ছোট্ট নুড়ি পাথরের ফাঁক দিয়ে বয়ে চলেছে পাহাড়ি নদী।

আমি বিশুদ্ধিমার্গে আপ কৃৎস্ন-ভাবনায় পড়েছিলাম, পানি যখন প্রবহমান হিসেবে দেখা যাবে সেটা উদ্গ্রহ-নিমিত্ত, আর শান্ত স্থির পানি হলে সেটা হবে প্রতিভাগ-নিমিত্ত। আমি যেহেতু শান্ত লেকের পানির মতো এমন নিমিত্ত দেখলাম তখন সেই পানি-নিমিত্তে মনোযোগ দিলাম, এবং 'পানি, পানি' বলে মনে মনে জপ করতে লাগলাম।

আমি সেই পানিকে বাড়াতে কমাতে চেষ্টা করলাম। প্রথমে ইচ্ছা করলেও ওটি বাড়ত-কমত না। পরে চর্চা করতে করতে পানির বাড়া-কমাটা আমার আয়ত্বে চলে এলো। আমি এখন ইচ্ছা করলে ফুরমোনের চূড়া পর্যন্ত পানিকে বাড়াতে পারি, অথবা ইচ্ছে করলে পানিকে কমিয়ে শুকনো খটখটে ভূমি

বানাতে পারি। আমি এভাবে নিমিত্ত নিয়ে খেলছিলাম। এভাবে কয়েকদিন গেল। এরপরে আমি গোল পানির ফোটা বানাতে চাইলাম। প্রথমে অনেকবার ব্যর্থ হলাম। শেষে কচুর পাতা থেকে পানির ফোটা গড়িয়ে পড়ার সময় তা শূন্যে ধরে রাখতে সমর্থ হলাম। এরপর এটিকে বড়-ছোট করতে শিখলাম। এমন করতে গিয়ে আমি আবিষ্কার করলাম, চোখ খোলা রেখেও এখন সেই পানি-নিমিত্ত দিয়ে যেকোনো কিছু ভরিয়ে দিতে পারি। অর্থাৎ স্বাভাবিক অবস্থায়ও ইচ্ছা করলে পাতার উপর, ঘাসের উপর, রুমের মধ্যে ইত্যাদি যেকোনো জায়গাকে পানি দিয়ে তৎক্ষণাৎ ভরিয়ে দিতে পারতাম।

কিন্তু এতে সমস্যা দেখা দিল। আমি ঘুমাতে গিয়ে চোখ বন্ধ করলেই পানির নিমিত্ত ভাসত চোখের সামনে, যেন আমার সামনে ধু ধু সাগর! শুধু সেটা হলেও সমস্যা হতো না। ব্যাপারটা যেন আমার নিয়ন্ত্রনের বাইরে চলে যেতে শুরু করল। সেই পানি এখন ঘোলাটে ও গভীর কালো হতে শুরু করল। কিছু অস্বস্তিকর অবয়ব দেখা দিতে শুরু করল সেই পানির মধ্যে। আমার মনে ভয় ঢুকে গেল। ঘুমাতে গেলেই সেই পানি, আর পানিতে সেই বিভীষিকা! অতএব গুরুর আশ্রয় নিতে হলো আমাকে।

আমার প্রব্রজ্যাগুরু ছিলেন শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ করুণাকীর্তি স্থবির। তিনি মনোযোগ দিয়ে আমার কথা শুনলেন এবং বললেন, তোমার কর্মস্থান কোনটা? আনাপান নাকি আপ কৃৎস্ন? 'আনাপান' আমি উত্তর দিলাম। তিনি বললেন, তোমার আলম্বন হচ্ছে 'শ্বাসপ্রশ্বাস'। আর তুমি পানির নিমিত্ত নিয়ে খেলায় মেতেছ। ওসব বাদ দিয়ে কেবল শ্বাসপ্রশ্বাসে মন দাও। তিনি আমাকে আরও অনেক উপদেশ দিলেন।

পানির নিমিত্ত নিয়ে এত দূর এসে আবার আনাপানে ফিরে যাওয়া মোটেও সহজ ছিল না। মনটা কিছুতেই শ্বাসপ্রশ্বাসে যেতে চাচ্ছিল না। আমার স্বাভাবিক ঘুম ব্যাহত হচ্ছিল। একটি রাত নির্ঘুম কাটাতে হলো। চোখ বন্ধ করলেই সেই বিভীষিকা! আমি কেন যেন অস্থির হয়ে পড়লাম।

কিন্তু, দু-তিন দিন প্রচেষ্টা করে ধীরে ধীরে আবার শ্বাসপ্রশ্বাসে মন দিতে সক্ষম হলাম। এরপর এমন নিমিত্ত বিষয়ে সতর্ক থাকাতে আর তেমন কোনো সমস্যা হয়নি। একটি জিনিস বুঝেছি, নিমিত্ত অনেক কিছুই আসতে পারে, কিন্তু সেগুলো নিয়ে খেলায় মেতে উঠলে বা গুরুত্ব দিলে খারাপ কিছু হবার সম্ভাবনা আছে। আর কয়েকদিন হলে আমি হয়তো পাগল হয়ে যেতাম।

এখন আমার মনে হয়, নিমিত্ত যা আসে আসুক, শ্বাসপ্রশ্বাসেই মনোযোগ দিতে হবে প্রথমদিকে। এরপরে আনাপান নিমিত্ত আসলে এবং সেটি যদি

শ্বাসপ্রশ্বাসের স্পর্শের স্থানে এসে স্থির হয়, তবেই মনোযোগটা শ্বাসপ্রশ্বাস থেকে আনাপান নিমিত্তে দেওয়া উচিত। বিজ্ঞজনের হয়তো অন্য মতও থাকতে পারে। তবে অন্তত আমি এই পথ ধরেই এগোতে চাচ্ছি, Trial and Error Method ধরে। দেখা যাক, আমার অভিজ্ঞতায় কী হয়!

জ্ঞানশান্ত ভিক্ষু
সারনাথ বনবিহার
করল্যাছড়ি, খাগড়াছড়ি
২২ নভেম্বর ২০১৩

কল্পতরু হতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলি

[illegible] :

- **[illegible]** [illegible] : ৬০০/-
  [illegible]
- **[illegible]** ([illegible]) [illegible] : ৬০০/-
  [illegible]
- **[illegible]** ([illegible]) [illegible] : ৬০০/-
  [illegible]

বাংলায় প্রকাশিত বই :

- **হৃদয়ের দরজা খুলে দিন** (হৃদয় নাড়া দেওয়া গল্প, সত্যি ঘটনা) মূল্য : ১৫০/-
  মূল : আজান ব্রহ্মবংশ মহাথেরো • অনুবাদ : জ্ঞানশান্ত ভিক্ষু
- **জানা ও দেখা** (শমথ ও বিদর্শন ভাবনার পূর্ণাঙ্গ গাইড) মূল্য : ১৫০/-
  মূল : পা-অক সেয়াদ • অনুবাদ : জ্ঞানশান্ত ভিক্ষু
- **বৌদ্ধ ভিক্ষু বিধি** (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড) (পুরো সেট) মূল্য : ১২০০/-
  মূল : ঠানিস্‌সারো ভিক্ষু • অনুবাদ : জ্ঞানশান্ত ভিক্ষু
- **জাতক পঞ্চাশক** (বিনামূল্যে বিতরণের জন্য)
  অনুবাদ : শ্রীমৎ জিনবংশ মহাস্থবির
- **পারাজিকা-অর্থকথা (প্রথম খণ্ড)** (বিনামূল্যে বিতরণের জন্য)
  অনুবাদ : শ্রীমৎ প্রজ্ঞাবংশ মহাস্থবির, শ্রীমৎ ইন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষু, শ্রীমৎ সুমন ভিক্ষু, ভদন্ত করুণাবংশ ভিক্ষু, শ্রীমৎ বঙ্গীশ ভিক্ষু, শ্রীমৎ অজিত ভিক্ষু ও শ্রীমৎ সীবক ভিক্ষু
- **ভালো? মন্দ? কে জানে?** মূল্য : ১৫০/-
  মূল : আজান ব্রহ্ম • অনুবাদ : সুব্রত বড়ুয়া

প্রকাশের অপেক্ষায়...

- **বিশুদ্ধিমার্গ** (মূলানুগ পূর্ণাঙ্গ বাংলা অনুবাদ)
  মূল : আচার্য বুদ্ধঘোষ • অনুবাদ : জ্ঞানশান্ত ভিক্ষু
- **[illegible]** ([illegible])
  [illegible]
- **[illegible]** ([illegible])
  [illegible]

প্রাপ্তিস্থান :

- রাজবন বিহার, রাঙামাটি। মোবাইল : ০১৫৫-৬৬১৩০৭১, ০১৫২-১২৪১৩৬৯
- রাসেল স্টোর, স্কেপ মার্কেট, বনরূপা, রাঙামাটি। মোবাইল : ০১৮২-০৩০২৪৬৫
- পার্বত্য লাইব্রেরী, কোর্ট রোড, খাগড়াছড়ি। মোবাইল : ০১৫৫-৬৭৪৫০০৯

সূ চি প ত্র

দেশনা ১

কীভাবে আনাপানস্মৃতিকে অর্পণা ধ্যানে উন্নীত করা যায়

ভূমিকা ১৫
কেন ভাবনা করবেন? ১৫
ভাবনা কী? ১৬
আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ..... ১৭
সমাধি কীভাবে বাড়ানো যায় ১৯
আনাপানস্মৃতি ১৯
প্রথম ধাপ ১৯
দ্বিতীয় ধাপ ২০
কীভাবে আপনি সপ্ত বোধ্যঙ্গকে সমতায় আনবেন ২৮
কীভাবে আপনি ধ্যান লাভ করবেন ২৯
প্রশ্নোত্তর পর্ব - ১ ..... ৩১

দেশনা ২

অন্যান্য বিষয় নিয়ে ধ্যান ৩৭
দেহের বত্রিশটি অংশ ৩৭
নির্বাণের তিন প্রবেশপথ ৩৯
কঙ্কাল ৩৯
ধ্যানের পাঁচটি অঙ্গ ৪০
দশবিধ কৃৎস্ন ৪২
    বর্ণ কৃৎস্ন ৪২
    সাদা কৃৎস্ন ৪২
    পৃথিবী কৃৎস্ন ৪৫
    পানি কৃৎস্ন ৪৬

আগুন কৃৎস্ন ৪৬
বাতাস কৃৎস্ন ৪৭
আলো কৃৎস্ন ৪৭
আকাশ কৃৎস্ন ৪৭
চার অরূপ ধ্যান ৪৮
অসীম আকাশ ভূমি (আকাশ-অনন্ত-আয়তন) ৪৮
অসীম চেতনাভূমি (বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন) ৪৯
শূন্যভূমি (আকিঞ্চনায়তন) ৫০
সংজ্ঞা-অসংজ্ঞাহীন ভূমি (নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন) ৫০
প্রশ্নোত্তর পর্ব - ২ .....৫১

দেশনা ৩

মৈত্রী-ভাবনা ৫৯
আপনার পছন্দের এবং সম্মানিত ব্যক্তির প্রতি মৈত্রীভাব ৬১
ভেদাভেদের সীমা ভেঙে ফেলা *(সীমাসম্ভেদ)* ৬৩
বাইশটি শ্রেণি ৬৫
অনির্দিষ্ট এবং নির্দিষ্ট শ্রেণি ৬৬
দশ দিকনির্দেশক শ্রেণি ৬৭
করুণা ভাবনা ৬৭
মুদিতা-ভাবনা ৬৯
উপেক্ষা-ভাবনা ৬৯
চারটি আরক্ষা ভাবনা ৭০
বিরূপতা ভাবনা *(অসুভ)* ৭২
মৃত্যু-ভাবনা (মরণানুস্মৃতি) ৭২
সারমর্ম ৭৩
প্রশ্নোত্তর পর্ব - ৩ .....৭৫

দেশনা ৪

কীভাবে রূপকে দেখবেন ৮৬
চার ধাতু ভাবনা ৮৬
রূপকলাপ বিশ্লেষণ ৯৪
স্বচ্ছ ধাতুরূপের বিশ্লেষণ ৯৭

চোখের মধ্যে চুয়াল্লিশ প্রকার রূপ ৯৯
চিত্ত দ্বারা উৎপন্ন রূপ (চিত্তজ-রূপ) ১০০
ঋতু দ্বারা উৎপন্ন রূপ (ঋতুজ-রূপ) ১০০
আহার দ্বারা উৎপন্ন রূপ (আহারজ-রূপ) ১০০
সারাংশ ১০২
প্রশ্নোত্তর পর্ব - ৪ .....১০৩

দেশনা ৫

কীভাবে আপনি নামকে দেখবেন ১১৮
ধ্যান-চিত্তবীথি ১১৯
কামাবচর-বীথি ১২১
যোনিশ এবং অযোনিশ মনস্কার ১২১
মনোদ্বার-চিত্তবীথি ১২২
পঞ্চদ্বার-চিত্তবীথি ১২২
বাহ্যিক নামকে দেখা ১২৪
প্রশ্নোত্তর পর্ব - ৫ .....১২৫

দেশনা ৬

প্রতীত্যসমুৎপাদ-নীতি ১৩৪
প্রতীত্যসমুৎপাদ-নীতির তিন বৃত্ত (ত্রিবর্ত) ১৩৫
অতীতকে দেখা ১৩৫
বাস্তব উদাহরণ ১৩৭
ভবিষ্যৎকে দেখা ১৩৯
প্রশ্নোত্তর পর্ব - ৬ .....১৪০

দেশনা ৭

বিদর্শন জ্ঞান ও নির্বাণ ১৫৪
সংমর্শন জ্ঞান (বুঝার বা উপলব্ধির জ্ঞান) ১৫৪
সপ্ত রূপ-পদ্ধতি ১৫৮
সপ্ত অরূপ-পদ্ধতি (অরূপ-সত্তক) ১৫৯
উদয়-ব্যয় জ্ঞান ১৬১
সংক্ষিপ্ত উপায় ১৬১

বিস্তারিত উপায় ১৬১
উৎপত্তি স্বভাবকে দেখা (সমুদয়ধম্মানুপস্সি) ১৬২
বিলয় স্বভাবকে দেখা (বয়ধম্মানুপস্সি) ১৬২
উৎপত্তি-বিলয় স্বভাবকে দেখা (সমুদয়বয়ধম্মানুপস্সি) ১৬৩
দশ উপক্লেশ (বিদর্শনের দশটি অপূর্ণতা) ১৬৫
ভঙ্গ জ্ঞান (বিলুপ্তি জ্ঞান) ১৬৬
অবশিষ্ট জ্ঞানগুলো ১৬৬
প্রশ্নোত্তর পর্ব - ৭ ..... ১৬৭
ভাবনাকারীদের জন্য নির্দেশনা ১৭৭

[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[**দেশনা ১**]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]

কীভাবে আনাপানস্মৃতিকে অর্পণা ধ্যানে উন্নীত করা যায়

ভূমিকা

কিছু তাইওয়ানিজ ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীর আমন্ত্রণে তাইওয়ানে আসতে পেরে আমরা অতীব খুশি হয়েছি, যারা ইতিপূর্বে মায়ানমারের মায়লামানের সন্নিকটে অবস্থিত *পা-অক মেডিটেশন সেন্টারে* অবস্থান করেছিল। তাইওয়ানে অবস্থানকালে আমরা আপনাদের *পা-অক মেডিটেশন সেন্টারে* চর্চিত ভাবনা-পদ্ধতি সম্পর্কে কিছুটা শিখিয়ে দিতে চাই, আর তা সম্পূর্ণ মূল ত্রিপিটক ও আচার্য বুদ্ধঘোষ বিরচিত বিখ্যাত *বিসুদ্ধিমগ্‌গ* গ্রন্থে বিধৃত দিকনির্দেশনার আলোকে। আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, মূল পালি ত্রিপিটকে যে ভাবনা-পদ্ধতি শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, তা বুদ্ধ তথাগত নিজেই অনুশীলন করেছেন এবং তাঁর জীবদ্দশায় তিনি নিজেই তাঁর শিষ্যদের শিক্ষা দিয়ে গেছেন।

কেন ভাবনা করবেন?

প্রথমেই আমাদের নিজেদের প্রশ্ন করা উচিত : 'বুদ্ধ কেন ভাবনা শিক্ষা দিয়েছিলেন?' অথবা 'ভাবনার উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যই কী?'

বৌদ্ধ ভাবনার মূল উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যই হচ্ছে নির্বাণ লাভ করা। 'নির্বাণ' হচ্ছে নাম (মন) এবং রূপ (জৈবিক দেহ) এই দুয়ের সম্পূর্ণ নিরোধ বা নিবৃত্তি। অতএব নির্বাণে পৌঁছুতে হলে আমাদের অতি অবশ্যই কুশল ও অকুশল এই উভয় মানসিক অবস্থাকে সমূলে ক্ষয় করতে হবে; যথা : হিতকর কুশলমূল—অলোভ, অদ্বেষ ও অমোহ এবং অহিতকর অকুশলমূল—লোভ, দ্বেষ ও মোহ। এগুলোই আমাদের জন্মজন্মান্তরে জন্ম, জরা, ব্যাধি ও মৃত্যুর

মুখোমুখী করায়। আমরা যদি এগুলোকে মার্গজ্ঞান *(অরিয়মগ্গ)* দিয়ে পুরোপুরি ক্ষয় করতে পারি, তবেই নির্বাণে পৌঁছুতে সক্ষম হবো। অন্যভাবে বলতে গেলে, নির্বাণ হচ্ছে সমস্ত সংসারদুঃখের কবল হতে মুক্ত হওয়া এবং জন্ম, জরা, ব্যাধি ও মৃত্যুর অনবশেষ ক্ষয়সাধন। আমরা সবাই জন্মদুঃখ, জরাদুঃখ, ব্যাধিদুঃখ ও মরণদুঃখের অধীন। অতএব আমরা নিজেদের সেসব দুঃখ হতে চিরমুক্ত করতে চাইলে অবশ্যই ভাবনা করতে হবে। আমরা যেহেতু সকল প্রকার দুঃখ হতে মুক্ত হতে চাই, অতএব আমাদের অবশ্যই কীভাবে ক্রমান্বয়ে নির্বাণ লাভ করা যায় তা শিক্ষা করতে হবে।

ভাবনা কী?

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, ভাবনা আসলে কী? ভাবনা দু ধরনের; যথা : শমথ-ভাবনা ও বিদর্শন-ভাবনা। এই দু ধরনের ভাবনা আবার কায়িক ও বাচনিক সদাচারের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। অন্য কথায়, ভাবনা হচ্ছে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের সম্যক গঠন, অনুশীলন ও পরম পরাকাষ্ঠা।

সেই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ হচ্ছে : সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি। তন্মধ্যে সম্যক দৃষ্টি ও সম্যক সংকল্পকে একত্রে বলা হয় 'প্রজ্ঞাশিক্ষা'। বুদ্ধ আবার সম্যক দৃষ্টিকে দু-ভাগে ভাগ করেছেন, বিদর্শন সম্যক দৃষ্টি *(বিপস্সনা-সম্মাদিট্ঠি)* ও মার্গ-সম্যক দৃষ্টি *(মগ্গ-সম্মাদিট্ঠি)*।

সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম ও সম্যক জীবিকাকে একত্রে বলা হয় 'শীলশিক্ষা'। আর সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধিকে একত্রে বলা হয় 'সমাধিশিক্ষা'। এই সমাধিশিক্ষাই হচ্ছে মূলত শমথ-ভাবনা।

আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ

এখন আমি আপনাদের সামনে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গে যে আটটি অঙ্গের কথা বলা হয়েছে সেগুলো সম্পর্কে সামান্য একটু বিশ্লেষণ করতে চাই।

তন্মধ্যে প্রথম অঙ্গ হচ্ছে সম্যক দৃষ্টি। সম্যক দৃষ্টি কী? সম্যক দৃষ্টি হচ্ছে মূলত চারি প্রকার জ্ঞান। তন্মধ্যে প্রথম হচ্ছে, দুঃখ আর্যসত্য তথা পঞ্চ-উপাদান-স্কন্ধ বিষয়ে ভাবনাময় জ্ঞান। দ্বিতীয় হচ্ছে, দুঃখ-সমুদয় আর্যসত্য তথা পঞ্চ-উপাদান-স্কন্ধ উৎপত্তির মূল কারণ বিষয়ে ভাবনাময় জ্ঞান। অন্য

কথায়, ইহা হচ্ছে প্রতীত্যসমুৎপাদ-নীতি বিষয়ে ভাবনাময় জ্ঞান। তৃতীয় হচ্ছে, দুঃখনিরোধ আর্যসত্য তথা নির্বাণ উপলব্ধি বা প্রত্যক্ষকরণ বিষয়ে জ্ঞান, যা মূলত পঞ্চ-উপাদান-স্কন্ধের পুরোপুরি নিবৃত্তি। আর চতুর্থ হচ্ছে, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ বিষয়ে গভীর জ্ঞান, যা মূলত নির্বাণ যাবার একমাত্র পথও বটে।

আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের দ্বিতীয় অঙ্গ হচ্ছে সম্যক সংকল্প। আর সম্যক সংকল্প হচ্ছে মূলত দুঃখ আর্যসত্য তথা পঞ্চ-উপাদান-স্কন্ধ বিষয়ে পরিশীলিত চিন্তা, দুঃখসমুদয় আর্যসত্য বিষয়ে পরিশীলিত চিন্তা, দুঃখনিরোধ আর্যসত্য বিষয়ে পরিশীলিত চিন্তা এবং পরিশেষে দুঃখনিরোধগামিনী প্রতিপদা তথা আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ বিষয়ে পরিশীলিত চিন্তা।

সম্যক সংকল্প তথা পরিশীলিত চিন্তা মনকে দুঃখ আর্যসত্য তথা পঞ্চ-উপাদান-স্কন্ধ বিষয়ে যথাযথ মনোনিবেশ করায় এবং সম্যক দৃষ্টি তখন পঞ্চ-উপাদান-স্কন্ধকে যথাযথভাবে বুঝে, উপলব্ধি করে। এই দুটি বিষয় মনকে চতুরার্যসত্যে গভীরভাবে মনোনিবেশ করাতে ও তাদের বুঝতে একত্রে কাজ করে। তারা যেহেতু একত্রে এই পদ্ধতিতে কাজ করে, তাই তাদের একত্রে বলা হয় প্রজ্ঞাশিক্ষা *(পঞ্ঞাসিক্খা)*।

আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের তৃতীয় অঙ্গ হচ্ছে সম্যক বাক্য। আর সম্যক বাক্য হচ্ছে মিথ্যা, ভেদ, কর্কশ ও বাজে আলাপ থেকে সম্পূর্ণ বিরতি।

আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের চতুর্থ অঙ্গ হচ্ছে সম্যক কর্ম। আর সম্যক কর্ম হচ্ছে প্রাণীহত্যা, চুরি ও ব্যভিচার হতে সম্পূর্ণ বিরতি।

আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের পঞ্চম অঙ্গ হচ্ছে সম্যক জীবিকা। সম্যক জীবিকা মানে হচ্ছে, প্রাণীহত্যা, চুরি বা মিথ্যাবাক্যের মতো খারাপ কথা ও খারাপ কাজের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করা থেকে বিরত থাকা। গৃহী উপাসক-উপাসিকাদের জন্যে নিম্নোক্ত পাঁচটি বাণিজ্য নিষিদ্ধ; যথা : অস্ত্রবাণিজ্য, প্রাণীবাণিজ্য, মাংসবাণিজ্য, নেশাবাণিজ্য ও বিষবাণিজ্য।

সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম ও সম্যক জীবিকা এই তিনটি অঙ্গকে একত্রে বলা হয় 'শীলশিক্ষা' *(সীলসিক্খা)*।

আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের ষষ্ঠ অঙ্গ হচ্ছে সম্যক প্রচেষ্টা। সম্যক প্রচেষ্টা চার প্রকার; যথা : অনুৎপন্ন অকুশল অনুৎপত্তির চেষ্টা, উৎপন্ন অকুশল ধ্বংসের চেষ্টা, অনুৎপন্ন কুশল উৎপত্তির চেষ্টা এবং উৎপন্ন কুশল বৃদ্ধির চেষ্টা। এভাবে ক্রমান্বয়ে এই চারি সম্যক প্রচেষ্টাকে বাড়াতে হলে আমাদের অবশ্যই শীলশিক্ষা, সমাধিশিক্ষা ও প্রজ্ঞাশিক্ষাকে বর্ধিত করতে হবে এবং অনুশীলনে পরিপুষ্ট করতে হবে।

আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের সপ্তম অঙ্গ হচ্ছে সম্যক স্মৃতি। সম্যক স্মৃতি চার প্রকার; যথা : কায়ানুদর্শন, বেদনানুদর্শন, চিত্তানুদর্শন ও ধর্মানুদর্শন। এখানে 'ধর্ম' বলতে বেদনা চৈতসিক বাদে বাকি একান্নটি চৈতসিককে বুঝানো হয়েছে। অথবা অন্যভাবে বলতে গেলে, পঞ্চ-উপাদান-স্কন্ধ, দ্বাদশ আধ্যাত্মিক ও বাহ্যিক আয়তন, অষ্টাদশ ধাতু, সপ্ত বোধ্যঙ্গ, চতুরার্যসত্য প্রভৃতি। কিন্তু উপর্যুক্ত চার প্রকার অনুদর্শনকে আমরা মাত্র দুভাগে ভাগ করতে পারি; যথা : রূপানুদর্শন ও নামানুদর্শন।

আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের অষ্টম অঙ্গ হচ্ছে সম্যক সমাধি। আর সম্যক সমাধি মানে হচ্ছে : প্রথম ধ্যান, দ্বিতীয় ধ্যান, তৃতীয় ধ্যান ও চতুর্থ ধ্যান। বুদ্ধের ভাবনা-বিষয়ক বিখ্যাত সূত্র—*সতিপট্ঠানসুত্ত*—অনুসারে এই সমস্ত ধ্যানগুলোকেই সম্যক সমাধি বলা হয়। তবে আচার্য বুদ্ধঘোষ-বিরচিত *বিসুদ্ধিমগ্গ* গ্রন্থে সম্যক সমাধিকে আরও বিশদভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে; যেমন : চার প্রকার রূপধ্যান, চার প্রকার অরূপধ্যান ও উপচার সমাধি।

কিছু মানুষের অসম্ভব রকম পুণ্যপারমী আছে, তারা কেবল ধর্মদেশনা শুনেই নির্বাণ লাভ করতে পারে, তা সংক্ষিপ্ত হোক আর বিস্তৃত হোক। তবে বিশ্বের অধিকাংশ মানুষের সে-রকম অমিত পুণ্যপারমী নেই। তাই তাদের অবশ্যই ক্রমান্বয়ে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের সম্যক অনুশীলন করতে হয়। তাদের বলা হয় 'নেয়্য-পুদ্গল' *(নেয়্য-পুগ্গল)*। তাদের ধাপে ধাপে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করতে হয় এবং ক্রমান্বয়ে শীলশিক্ষা, সমাধিশিক্ষা ও প্রজ্ঞাশিক্ষা পরিপূরণ করতে হয়। প্রথমে শীলকে পরিশুদ্ধ করার পর তাদের অবশ্যই সমাধির চর্চা করতে হবে এবং সমাধি চর্চার মধ্য দিয়ে মনকে স্বচ্ছ ও নির্মল করার পর তাদের অবশ্যই প্রজ্ঞা শিক্ষা করতে হবে।

সমাধি কীভাবে বাড়ানো যায়

কীভাবে তাদের সমাধি বাড়ানো উচিত?

শমথ-ভাবনার বিষয় মোট চল্লিশটি। যে কেউ এই চল্লিশ প্রকার শমথ-ভাবনার বিষয়ের মধ্য থেকে যেকোনো একটিকে সমাধি লাভের কাজে ব্যবহার করতে পারেন।

যারা চল্লিশ প্রকার শমথ-ভাবনার বিষয়ের মধ্যে কোনটি দিয়ে শুরু করবেন সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন না তারা শ্বাসপ্রশ্বাসের ভাবনা *আনাপানস্মৃতি* দিয়ে শুরু করতে পারেন। অধিকাংশ মানুষ আনাপানস্মৃতি ভাবনা বা চার ধাতু-ভাবনার

যেকোনো একটি অনুশীলন করে ভাবনায় সফল হন। অতএব, এখন আমি খুব সংক্ষেপে কীভাবে আনাপানস্মৃতি তথা শ্বাসপ্রশ্বাসের ভাবনা অনুশীলন করতে হয় সে-বিষয়ে ব্যাখ্যা করব।

আনাপানস্মৃতি

বুদ্ধ দীর্ঘনিকায়ের মহাসতিপট্ঠান সূত্রে শ্বাসপ্রশ্বাসকে নিয়ে কীভাবে ভাবনা করতে হয়, তা বলে দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'ভিক্ষুগণ, এই বুদ্ধশাসনে একজন ভিক্ষু বনে, বা কোনো গাছের গোড়ায়, অথবা খালি কোনো জায়গায় গিয়ে পদ্মাসনে বসে এবং শরীরকে সোজা রাখে। সে তার মনোযোগকে কেন্দ্রীভূত করে ধ্যানের বিষয়ের [আলম্বনের] উপরে। সে মনোযোগের সাথে শ্বাস নেয় ও মনোযোগের সাথে শ্বাস ফেলে।'

১. দীর্ঘ করে শ্বাস নেওয়ার সময় সে জানে, 'আমি দীর্ঘ করে শ্বাস নিচ্ছি'। দীর্ঘ করে শ্বাস ফেলার সময় সে জানে, 'আমি দীর্ঘ করে শ্বাস ফেলছি'।
২. ছোট্ট করে শ্বাস নেওয়ার সময় সে জানে, 'আমি ছোট্ট করে শ্বাস নিচ্ছি'। ছোট্ট করে শ্বাস ফেলার সময় সে জানে, 'আমি ছোট্ট করে শ্বাস ফেলছি'।
৩. 'সম্পূর্ণ শ্বাসপ্রবাহ অনুভব করে করে আমি শ্বাস নেব' এভাবে সে ভাবনা করে। 'সম্পূর্ণ শ্বাসপ্রবাহ অনুভব করে আমি শ্বাস ফেলব' এভাবে সে ভাবনা করে।
৪. 'শ্বাসপ্রবাহ শান্ত করে আমি শ্বাস নেব' এভাবে সে ভাবনা করে। 'শ্বাসপ্রবাহ শান্ত করে আমি শ্বাস ফেলব' এভাবে সে ভাবনা করে।

প্রথম ধাপ

ভাবনা শুরু করার আগে, যুতসই একটা জায়গায় বসুন এবং নাকের মধ্য দিয়ে শ্বাসপ্রশ্বাসের ভেতরে ঢোকা ও বেরিয়ে যাওয়াটা খেয়াল করার চেষ্টা করুন। আপনি এটাকে নাকের ডগার নিচে অথবা নাকের পাটার চারপাশের কোথাও অনুভব করতে পারবেন। শ্বাস নেওয়ার ও ফেলার সময় শ্বাসপ্রবাহকে অনুসরণ করবেন না, কারণ এতে করে আপনার ভাবনা যথাযথ হবে না। শুধু সজাগ মনোযোগ রাখুন শ্বাস যেখানে অথবা যে জায়গায় স্পর্শ করে সেই জায়গাতে, সেটা হয় উপরের ঠোঁটের উপরিভাগে অথবা নাকের ডগার আশেপাশে কোনো জায়গায়। একটামাত্র জায়গায় সজাগ মনোযোগ রাখলে তখন আপনি ভালোভাবে ভাবনা করতে শিখবেন ও সেটাকে সর্বাঙ্গসুন্দর করে

তুলতে পারবেন।

নিমিত্তের স্বভাব-লক্ষণ, সাধারণ-লক্ষণ (*সম্মঞ্ঞ-লকখণ*) অথবা নিমিত্তের রঙের প্রতি মনোযোগ দেবেন না। এখানে, স্বভাব-লক্ষণ হচ্ছে শ্বাসের মধ্যে চারি মহাভূতের (আগুন, পানি, মাটি, বায়ু) অনুভূতি—কাঠিন্য, কর্কশতা, প্রবাহ, তাপ, ধারকত্ব, চাপ ইত্যাদি। সাধারণ-লক্ষণ হচ্ছে শ্বাসের অনিত্য, দুঃখ ও অনিত্যতার বৈশিষ্ট্য। এর মানে হচ্ছে, 'শ্বাস নিচ্ছি, ফেলছি, অনিত্য', অথবা 'শ্বাস নিচ্ছি, ফেলছি, দুঃখ', অথবা 'শ্বাস নিচ্ছি, ফেলছি, অনাত্ম'—এভাবে মনোযোগ দেবেন না। শুধুমাত্র শ্বাস নেওয়া ও ফেলার কাজে মনোযোগ দিন, অন্য কিছুতে মনোযোগ দেবেন না।

আনাপানস্মৃতি ভাবনায় শ্বাসপ্রশ্বাস হচ্ছে ভাবনার বিষয়বস্তু। ভাবনায় উন্নতির জন্য আপনি এটাতেই মনোযোগ দেবেন। আপনি যদি এভাবে শ্বাসপ্রশ্বাসে মনোযোগ দিতে থাকেন, এবং সেই সাথে যদি আপনি পূর্বজন্মেও ভাবনাচর্চা করে থাকেন ও কিছু পারমী সঞ্চয় করে থাকেন, তাহলে খুব সহজেই শ্বাসপ্রশ্বাসের উপরে মনোযোগ স্থাপন করতে পারবেন, শ্বাস নেওয়া ও ফেলার কাজে মনোযোগ রাখতে পারবেন।

তাতে যদি মনোযোগ না আসে, তাহলে বিশুদ্ধিমার্গমতে আপনি শ্বাসপ্রশ্বাস গণনা করতে পারেন। আপনি প্রত্যেক শ্বাসপ্রশ্বাসের শেষে এভাবে গুণবেন : 'শ্বাস নিচ্ছি, ফেলছি—এক', 'শ্বাস নিচ্ছি, ফেলছি—দুই' ইত্যাদি।

কমপক্ষে পাঁচ পর্যন্ত গুণুন, তবে দশের উপরে গুণবেন না। আমরা আপনাকে আট পর্যন্ত গুণতে পরামর্শ দেব, কেননা এটি আপনাকে আর্য-অষ্টাঙ্গিক মার্গের কথা স্মরণ করিয়ে দেবে, যে পথ ধরে আপনি চলার চেষ্টা করছেন। তাই আপনি পাঁচ থেকে দশের মধ্যে যেকোনো সংখ্যা পর্যন্ত গুণুন। আপনি প্রতিজ্ঞা করুন যে এই সময়ের মধ্যে আপনি মনকে অন্য চিন্তায় বা কল্পনায় ভেসে যেতে দেবেন না, অন্য কোথাও যেতে দেবেন না, শুধুমাত্র শ্বাসপ্রশ্বাসের উপরে সজাগ মনোযোগ রাখবেন। যখন এভাবে গুণবেন, আপনি দেখবেন যে এখন আপনি শ্বাসপ্রশ্বাসের উপরে মনোযোগ রাখতে পারছেন, এবং কেবল শ্বাসপ্রশ্বাসকেই জানছেন, অন্য কিছু নয়।

দ্বিতীয় ধাপ

এভাবে মনকে কমপক্ষে আধ ঘণ্টা কেন্দ্রীভূত করে রাখার পরে, আপনি এবার দ্বিতীয় ধাপে যেতে পারেন :

১. দীর্ঘ করে শ্বাস নেওয়ার সময় সে জানে, 'আমি দীর্ঘ করে শ্বাস নিচ্ছি'। দীর্ঘ করে শ্বাস ফেলার সময় সে জানে, 'আমি দীর্ঘ করে শ্বাস ফেলছি'।

২. ছোট্ট করে শ্বাস নেওয়ার সময় সে জানে, 'আমি ছোট্ট করে শ্বাস নিচ্ছি'। ছোট্ট করে শ্বাস ফেলার সময় সে জানে, 'আমি ছোট্ট করে শ্বাস ফেলছি'।

এই ধাপে এসে আপনাকে সজাগ ও সচেতন থাকার চেষ্টা করতে হবে শ্বাসপ্রশ্বাস দীর্ঘ বা ছোট্ট কি না এই বিষয়ে। 'দীর্ঘ' বা 'ছোট্ট' বলতে এখানে কয় ফুট বা কয় ইঞ্চি দীর্ঘ, সেটা বুঝাচ্ছে না, সময়ের পরিমাণটাকে বুঝাচ্ছে। আপনাকে নিজে নিজেই ঠিক করে নিতে হবে, কতটুকু সময়কে আপনি 'দীর্ঘ' বলবেন, আর কতটুকু সময়কে 'ছোট্ট' বলবেন। প্রত্যেকটি শ্বাস নেওয়া ও শ্বাস ফেলার সময় সম্পর্কে সজাগ মনোযোগ বজায় রাখুন। আপনি খেয়াল করবেন যে নিঃশ্বাস কখনো দীর্ঘ হচ্ছে, কখনো বা ছোট্ট হচ্ছে। শুধুমাত্র এই জানার কাজটাই করতে হবে আপনাকে এই ধাপে। মনে মনে বলবেন না যেন 'শ্বাস নিচ্ছি, ফেলছি, দীর্ঘ—শ্বাস নিচ্ছি, ফেলছি, ছোট্ট' এভাবে বলার দরকার নেই এখন। শুধু মনে মনে বলুন, 'শ্বাস নিচ্ছি, ফেলছি', আর সজাগ থাকুন শ্বাসপ্রশ্বাস দীর্ঘ হচ্ছে কি ছোট্ট হচ্ছে সে বিষয়ে। শ্বাস নেওয়ার ও ফেলার সময় তা উপরের ঠোঁট বা নাকের ডগায় কতক্ষণ ধরে স্পর্শ করছে, তা থেকেই আপনি এটা জেনে যাবেন। মাঝে মাঝে হয়তো পুরো সময়টা জুড়ে শ্বাসপ্রশ্বাস দীর্ঘ হবে, অথবা মাঝে মাঝে হয়তো পুরো সময়টা জুড়ে শ্বাসপ্রশ্বাস হবে ছোট্ট ছোট্ট; কিন্তু আপনি স্বেচ্ছায় এটাকে দীর্ঘ বা ছোট্ট করতে যাবেন না।

এই ধাপে নিমিত্ত[১] দেখা দিতে পারে, কিন্তু যদি আপনি ধীর ও শান্তভাবে এক ঘণ্টা ধরে এই ধাপে ভাবনা করতে পারেন, এবং এ সময়ে কোনো নিমিত্ত আবির্ভূত না হয়, তখন আপনার তৃতীয় ধাপে এগোনো উচিত :

৩. 'সম্পূর্ণ শ্বাসপ্রবাহ অনুভব করে আমি শ্বাস নেব' এভাবে সে ভাবনা করে। 'সম্পূর্ণ শ্বাসপ্রবাহ অনুভব করে আমি শ্বাস ফেলব' এভাবে সে ভাবনা করে।

এখানে বুদ্ধ আপনাকে পুরো শ্বাসপ্রবাহের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত খেয়াল

---

[১]. নিমিত্ত : বিভিন্ন ধরনের দৃশ্য, শব্দ বা অনুভূতি যা ধ্যানের সময় মনের পর্দায় ভেসে ওঠে।

রাখতে নির্দেশ দিচ্ছেন। যখন আপনি এটা করতে যাবেন, নিমিত্ত আবির্ভূত হতে পারে। সেরকম হলে আপনি তৎক্ষণাৎ সেদিকে মন দেবেন না, শ্বাসপ্রশ্বাসের সাথে থাকুন।

যদি আপনি এক ঘণ্টা ধরে শ্বাসপ্রশ্বাসের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ধীর ও শান্তভাবে মনোযোগ ধরে রাখতে পারেন, আর কোনো নিমিত্ত আবির্ভূত না হয়, তখন আপনার চতুর্থ ধাপে যাওয়া উচিত :

৪. 'শ্বাসপ্রবাহ শান্ত করে আমি শ্বাস নেব' এভাবে সে ভাবনা করে। 'শ্বাসপ্রবাহ শান্ত করে আমি শ্বাস ফেলব' এভাবে সে ভাবনা করে।

এটা করতে গিয়ে আপনার মনে মনে ঠিক করা উচিত যে শ্বাসপ্রশ্বাস শান্ত করতে হবে, কিন্তু তাই বলে শ্বাসপ্রশ্বাস শান্ত করার জন্য অন্য কিছু করতে যাবেন না যেন। শুধু পুরো শ্বাসপ্রবাহের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মনোযোগ ধরে রাখুন, আর কিছু করার দরকার নেই। যদি আপনি অন্য কিছু করতে যান, তবে আপনার মনোযোগ ভঙ্গ হবে এবং মন অন্যদিকে সরে যাবে। বিশুদ্ধিমার্গ বলে যে, শ্বাসপ্রশ্বাস শান্ত হওয়ার চারটি পূর্বশর্ত আছে : চিন্তা *(আভোগ)*, বার বার স্মৃতি দেওয়া *(সমন্নাহার)*, মনোযোগ *(মনসিকার)*, এবং বিচার *(বীমংস)*। তাই এই ধাপে আপনাকে যা করতে হবে, তা হলো শ্বাসপ্রশ্বাস শান্ত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া এবং এ বিষয়ে ক্রমাগতভাবে সজাগ থাকা। এভাবে আপনি দেখবেন যে শ্বাসপ্রশ্বাস শান্ত থেকে শান্ততর হচ্ছে। এ সময় নিমিত্ত আবির্ভূত হতে পারে।

নিমিত্ত আবির্ভূত হওয়ার ঠিক আগের মুহূর্তে অনেকেই বিভিন্ন অসুবিধার সম্মুখীন হন। বেশির ভাগ লোকের তখন মনে হয় যে শ্বাসপ্রশ্বাস খুব সূক্ষ্ম হয়ে গেছে এবং সেটি স্পষ্ট অনুভূত হচ্ছে না। তারা হয়তো মনে করতে পারে শ্বাসপ্রশ্বাস থেমে গেছে। যদি এমন হয়, তখন আপনি সর্বশেষ যেখানে শ্বাসপ্রশ্বাস অনুভব করেছিলেন, সেখানে মনোযোগ ধরে রাখা উচিত এবং সেখানে ধৈর্যের সাথে অপেক্ষা করা উচিত।

মৃত ব্যক্তি, মাতৃগর্ভের ভ্রূণ, জলে নিমজ্জিত ব্যক্তি, অজ্ঞান ব্যক্তি, চতুর্থ ধ্যানে নিমগ্ন ব্যক্তি, নিরোধ সমাপত্তি ধ্যানে নিমগ্ন ব্যক্তি এবং ব্রহ্মা : এই সাত প্রকার ব্যক্তি শ্বাস নেয় না। চিন্তা করে দেখুন, আপনি এগুলোর কোনোটাই নন, আপনি আসলেই শ্বাস নিচ্ছেন, এটা শুধু খুব সূক্ষ্ম হয়ে গেছে, যার ফলে আপনার দুর্বল মনোযোগের কারণে সেটাকে অনুভব করতে সক্ষম হচ্ছেন না। আপনার মনোযোগ যথেষ্ট শক্তিশালী না হওয়ায় আপনি শ্বাসপ্রশ্বাসকে ধরতে

পারছেন না।

যখন শ্বাসপ্রশ্বাস এ রকম সূক্ষ্ম হয়, তখন আপনার এটাকে বদলানো উচিত নয়, কেননা এমন প্রচেষ্টা আপনাকে উত্তেজিত করবে মাত্র এবং এতে আপনার ধ্যানের কোনো উৎকর্ষ সাধিত হবে না। আপনার শ্বাসপ্রশ্বাস যেমন, সেভাবেই আপনি জানুন, কোনো কিছু করতে যাবেন না। যদি এটি ধরতে না পারেন, তবে অপেক্ষা করুন সর্বশেষ যেখানে শ্বাসপ্রশ্বাস অনুভব করেছিলেন সেখানে। আপনি দেখবেন যে, যখন আপনি আপনার মনোযোগ ও প্রজ্ঞাকে এভাবে কাজে লাগাবেন, শ্বাসপ্রশ্বাস আবার অনুভূত হবে।

শ্বাসপ্রশ্বাসের ধ্যানের নিমিত্ত ব্যক্তিবিশেষে বিভিন্ন হয়। কারো কারো নিমিত্ত হয় কার্পাস তুলার মতো খাঁটি ও সূক্ষ্ম, বায়ুপ্রবাহের মতো প্রবহমান, উজ্জ্বলতায় সেটি হয়তো শুকতারা, চুনি বা রত্ন অথবা মুক্তার মতো। অন্যদের কাছে এটি হয় গাছের গুঁড়ি অথবা সুঁচালো বর্শার মতো। কারো কারো কাছে এটি লম্বা দড়ি বা রশি, কোনো ফুলের মালা, ধোঁয়ার পুঞ্জ, কোনো মাকড়সার জাল, কোনো কুয়াশার দলা, কোনো পদ্মফুল, কোনো চাকা, চন্দ্র বা সূর্য ইত্যাদি।

বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই কার্পাস তুলার মতো খাঁটি সাদা নিমিত্ত হচ্ছে উদগ্রহ-নিমিত্ত (যে ছবি বা চিহ্নটাকে ভিত্তি করে ধ্যানে এগোতে হবে), যা সাধারণত নিরস ও নিরেট। যখন এই নিমিত্ত শুকতারার মতো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, দীপ্তিমান ও পরিষ্কার হয়ে ওঠে, তখন এটি প্রতিভাগ-নিমিত্ত (চিহ্ন বা ছবির উজ্জ্বল প্রতিমূর্তি)। যখন ঘোলাটে কোনো রত্ন পাথরের মতো হয়, তখন এটি উদগ্রহ-নিমিত্ত, কিন্তু যখন উজ্জ্বল ও ঝিকমিক করে দীপ্তি ছড়ায়, তখন এটি প্রতিভাগ-নিমিত্ত। অন্যান্য নিমিত্তগুলোকেও এভাবে বুঝে নিতে হবে।

নিমিত্ত বিভিন্ন জনের কাছে বিভিন্নভাবে হাজির হয়, কারণ এটি সংজ্ঞা দ্বারা উৎপন্ন। নিমিত্ত আবির্ভাবের আগে বিভিন্ন ভাবনাকারীর সংজ্ঞা বিভিন্ন হওয়ার কারণে নিমিত্তও বিভিন্নভাবে ভেসে আসে। যদিও এই ধ্যানে ভাবনার বিষয় কেবল শ্বাসপ্রশ্বাস, তবুও এটি ব্যক্তিবিশেষের উপর নির্ভর করে বিভিন্ন ধরনের নিমিত্ত উপহার দেয়।

একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, যখন আপনি এই ধাপে পৌঁছাবেন, তখন আপনার নিমিত্তকে নিয়ে খেলা করতে যাবেন না। এটাকে হারিয়ে যেতে দেবেন না, ইচ্ছাকৃতভাবে এটির আকৃতি বা চেহারা বদলাতে যাবেন না। যদি আপনি সেরকম করেন, তবে আপনার ধ্যানের শ্রীবৃদ্ধি হবে না, আপনার অগ্রগতি সেখানেই থেমে যাবে। আপনার নিমিত্ত খুব সম্ভব হারিয়ে যাবে। তাই

যখন প্রথম নিমিত্ত আবির্ভূত হবে, তখন আপনি মনটাকে শ্বাসপ্রশ্বাস থেকে নিমিত্তের দিকে যেতে দেবেন না। যদি যেতে দেন, তখন দেখবেন যে নিমিত্ত চলে গেছে।

যখন আপনি দেখবেন যে নিমিত্ত সুদৃঢ় ও সুস্থিত হয়েছে, আপনার মন নিজে থেকেই নিমিত্তে একাগ্র হয়ে আছে, তখন মনটাকে সেখানেই থাকতে দিন। যদি আপনি মনটাকে সেখান থেকে সরিয়ে আনেন, তাহলে খুব সম্ভব আপনি ধ্যানের মনোযোগ হারিয়ে ফেলবেন।

যদি নিমিত্ত আপনার কাছ থেকে অনেক দূরে আবির্ভূত হয়, সেটাকে উপেক্ষা করুন, কেননা এটি সম্ভবত হারিয়ে যাবে। যদি আপনি এটাকে উপেক্ষা করেন, আর শ্বাসপ্রশ্বাস যেখানে স্পর্শ করে, সেখানে মনোযোগ ধরে রাখেন, নিমিত্ত আসবে এবং স্থির হয়ে থাকবে।

শ্বাসপ্রশ্বাস যেখানে স্পর্শ করে, সেখানেই যদি নিমিত্ত আবির্ভূত হয়, সেটা যদি সুস্থির হয়, সেটা যদি এমনভাবে আবির্ভূত হয় যেন এটিই শ্বাসপ্রশ্বাস এবং শ্বাসপ্রশ্বাসটাই নিমিত্ত, তখন শ্বাসপ্রশ্বাসকে ভুলে যান, শুধু নিমিত্তে মনোযোগ ধরে রাখুন। মনটাকে শ্বাসপ্রশ্বাস থেকে নিমিত্তে স্থানান্তরিত করে আপনি এভাবে আরও অগ্রসর হতে সক্ষম হবেন।

এভাবে মনটাকে নিমিত্তে নিয়ে আসার ফলে নিমিত্ত সাদা থেকে আরও সাদা হয়, যখন এটি তুলোর মতো সাদা হয়, তখন এটি উদগ্রহ-নিমিত্ত।

আপনার দৃঢ় সংকল্প করা উচিত যে এই সাদা উদগ্রহ-নিমিত্তে এক, দুই, তিন বা তারও বেশি সময় ধরে আপনি মনটাকে শান্তভাবে মনোযোগ ধরে রাখবেন। যদি উদগ্রহ-নিমিত্তে এক বা দুই ঘণ্টা ধরে মনটাকে ধরে রাখতে সমর্থ হন, তখন নিমিত্তটি আরও উজ্জ্বল, আরও পরিষ্কার, আরও দীপ্তিমান হওয়ার কথা। যদি তেমন হয়, তখন সেটিই প্রতিভাগ-নিমিত্ত (উজ্জ্বল প্রতিমূর্তি)। আপনার মনটাকে প্রতিভাগ-নিমিত্তে এক, দুই বা তিন ঘণ্টাব্যাপী ধরে রাখার সংকল্প করুন এবং সেভাবে ভাবনা অনুশীলন করুন। অনুশীলন করুন, যতক্ষণ না আপনি সফল হন।

এই ধাপে আপনি হয় উপচার ধ্যানের স্তরে পৌঁছে গেছেন (যেটাকে বলা হয় ধ্যানের কাছাকাছি ধাপ), অথবা অর্পণা ধ্যানের স্তরে পৌঁছে গেছেন (যেটাকে বলা হয় গভীর ও পরিপূর্ণ ধ্যান)। উপচার ধ্যান বলা হয় এ কারণে যে, এটা ধ্যানের খুব কাছাকাছি এবং ধ্যানে প্রবেশের আগের ধাপ। গভীর মনোযোগই হচ্ছে ধ্যান।

উভয় ধ্যানের বিষয়বস্তুই হচ্ছে প্রতিভাগ-নিমিত্ত। তাদের মধ্যে পার্থক্য শুধু

একটি জায়গায় আর সেটি হচ্ছে, উপচার ধ্যানে ধ্যানের অঙ্গগুলো পরিপূর্ণভাবে বিকাশ লাভ করে না। এ কারণে ভবাঙ্গ-চিত্ত উৎপন্ন হয় এবং আপনি ভবাঙ্গে (প্রতিসন্ধিচিত্ত) পড়ে যেতে পারেন। ভাবনাকারী তখন বলেন যে, সবকিছু থেমে গেছে, আর মনে করতে পারেন যে এটিই নির্বাণ। আসলে কিন্তু মনটা থামে নি, ভাবনাকারী সুদক্ষ নন বলেই সেটা বুঝতে সক্ষম হচ্ছেন না, কারণ ভবাঙ্গ-চিত্তের গতিপ্রকৃতি খুবই সূক্ষ্ম।

ভবাঙ্গে পড়ে যাওয়াটা এড়াতে এবং আরও এগিয়ে যেতে আপনার প্রয়োজন হবে পঞ্চ-ইন্দ্রিয়; যথা : শ্রদ্ধা, বীর্য, স্মৃতি, সমাধি এবং প্রজ্ঞাকে, যারা আপনার মনটাকে সামনের দিকে ঠেলে দেবে এবং প্রতিভাগ-নিমিত্তে মনটাকে ধরে রাখবে। প্রতিভাগ-নিমিত্তকে জানতে হলে বার বার প্রচেষ্টা চালাতে হয়, স্মৃতিকে সব সময় জাগ্রত রাখতে হয় যেন এটাকে না ভোলে, এবং ভালোমতো বুঝার জন্য তীক্ষ্ণ প্রজ্ঞার দরকার হয়।

কীভাবে আপনি পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের মাঝে সমতা আনয়ন করবেন

পঞ্চ-ইন্দ্রিয় হচ্ছে পাঁচটি শক্তি যা মনকে নিয়ন্ত্রণ করে, এবং শমথ ও বিদর্শনের পথ থেকে মনকে বিচ্যুত হতে দেয় না, যে পথ পৌঁছে গেছে নির্বাণে। যদি এই পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের কোনোটা অতিরিক্ত হয়, তবে তা ভারসাম্যহীন অবস্থার সৃষ্টি করে।

প্রথম ইন্দ্রিয় হচ্ছে শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস। বিশ্বাস রাখতে হবে ত্রিরত্ন, অথবা কর্ম ও কর্মফলের উপরে। বুদ্ধের বুদ্ধত্বে বিশ্বাস রাখাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কেননা এটা না হলে ধ্যানে তার অবনতি ঘটবে। বুদ্ধের শিক্ষাতে বিশ্বাস রাখাটাও গুরুত্বপূর্ণ। বুদ্ধের শিক্ষা হচ্ছে চার মার্গ, চার ফল ও নির্বাণ ইত্যাদি। বুদ্ধের শিক্ষা আমাদের ভাবনায় পথ দেখায়, তাই প্রত্যেকটি ধাপে তার শিক্ষার প্রতি আমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস রাখাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

ধরা যাক ভাবনাকারী ভাবে, 'শুধু শ্বাসপ্রশ্বাসকে দেখে দেখেই কি ধ্যান পাওয়া যাবে? এটা কি সত্যি যে উদগ্রহ-নিমিত্ত হচ্ছে সাদা কার্পাস তুলার মতো, আর প্রতিভাগ-নিমিত্ত হচ্ছে পরিষ্কার বরফ বা কাচের মতো?' যদি এ ধরনের চিন্তা মনে সব সময় ঘুরপাক খায়, তবে তা এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গির জন্ম দেয়, যেমন 'বর্তমান যুগে আর ধ্যান পাওয়া যাবে না।' এতে করে বুদ্ধের শিক্ষা থেকে ভাবনাকারীর আস্থা কমে যাবে, শমথ ভাবনায় পরিপূর্ণতা লাভ করতে গিয়ে হাল ছেড়ে দেওয়া থেকে সে আর নিজেকে থামাতে পারবে না।

তাই শ্বাসপ্রশ্বাস নিয়ে ভাবনাকারী ব্যক্তির প্রবল বিশ্বাস থাকা দরকার। নিঃসন্দেহ হয়েই তার শ্বাসপ্রশ্বাসের ভাবনা করা উচিত। তার চিন্তা করা উচিত : 'ধ্যান লাভ করা সম্ভব, যদি আমি ঠিকমতো সম্যকসম্বুদ্ধের নির্দেশাবলী অনুসরণ করি।'

আবার কোনো ব্যক্তি যদি কোনো কিছুতে অতিরিক্ত মাত্রায় বিশ্বাসপ্রবণ হয়ে পড়ে এবং এক্ষেত্রে সেটা যদি শ্বাসপ্রশ্বাসের প্রতি হয়ে থাকে, তাহলে মাত্রাতিরিক্ত বিশ্বাসের কারণে প্রজ্ঞা (বিচার-বিশ্লেষণ করে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার ক্ষমতা) স্বচ্ছ হয় না। অন্যান্য শক্তিগুলো যথা : বীর্য (প্রচেষ্টা), স্মৃতি ও সমাধি (মনোযোগ) দুর্বল হয়ে পড়ে। বীর্যশক্তি আর প্রতিভাগ-নিমিত্তে উজ্জ্বল রূপ তৈরি করতে পারে না এবং মনটাকে সেখানে ধরে রাখতে পারে না। স্মৃতি প্রতিভাগ-নিমিত্তে জ্ঞানকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে না। সমাধিশক্তি মনকে তখন অন্য বিষয়বস্তুতে যেতে বাধা দিতে পারে না। প্রজ্ঞাশক্তি প্রতিভাগ-নিমিত্তকে বিভাজন করে দেখতে ব্যর্থ হয়। যেহেতু প্রজ্ঞাশক্তি তখন প্রতিভাগ-নিমিত্তকে বুঝতে ব্যর্থ হয় এবং শ্রদ্ধাকে সহায়তা দিতে পারে না, তাই অতিরিক্ত প্রজ্ঞা এক্ষেত্রে আসলে বিশ্বাসটাকেই কমিয়ে দেয়।

যদি বীর্য (প্রচেষ্টা) মাত্রাতিরিক্ত হয়, তখন শ্রদ্ধা কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে না, স্মৃতি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না, সমাধি মনের অমনোযোগিতাকে বাধা দিতে পারে না, প্রজ্ঞা বিশ্লেষণ করে দেখতে পারে না। তাই অতিরিক্ত বীর্য মনকে প্রতিভাগ-নিমিত্তে সুস্থিরভাবে রাখতে পারে না, এবং প্রশান্তি, মনোযোগ ও উপেক্ষা বোধ্যঙ্গগুলো যথেষ্ট শক্তি অর্জন করতে পারে না।

বিজ্ঞ ব্যক্তিরা শ্রদ্ধার সাথে প্রজ্ঞা ও সমাধির সাথে বীর্যের সাম্যতার প্রশংসা করেন। উদাহরণস্বরূপ, যদি শ্রদ্ধা প্রবল ও প্রজ্ঞা দুর্বল হয়, তাহলে কোনো ব্যক্তি কোনো বিষয়বস্তুতে শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস স্থাপন করেন কোনো কিছু না বুঝেই। উদাহরণস্বরূপ, তিনি প্রাচীন বৌদ্ধধর্মের বাইরের বিষয়বস্তু যেমন, রক্ষাকারী দেবতাদের প্রতি শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস স্থাপন করেন।

অন্যদিকে যদি প্রজ্ঞা শক্তিশালী ও শ্রদ্ধা দুর্বল হয়, সেই ব্যক্তি চালাক হয়ে ওঠেন। ধ্যান করা বাদ দিয়ে তারা তাদের সময় কাটান শুধু যুক্তিতর্কের মধ্য দিয়ে। এটা অনেকটা মাত্রাতিরিক্ত ওষুধ সেবনের মতো, যার চিকিৎসা করা খুব কঠিন।

যদি শ্রদ্ধা ও প্রজ্ঞা সমতায় থাকে, তাহলে বিশ্বাসের যোগ্য বিষয়বস্তুতে, যেমন ত্রিরত্ন, কর্ম ও কর্মফলে তার বিশ্বাস থাকবে। সে বিশ্বাস করবে যে

বুদ্ধের নির্দেশ অনুসারে ধ্যান করলে প্রতিভাগ-নিমিত্ত ও ধ্যান লাভ করা সম্ভব।

আবার যদি সমাধি (মনোযোগ) প্রবল, কিন্তু বীর্য বা প্রচেষ্টা দুর্বল হয়, তখন ভাবনাকারী ব্যক্তি অলস হয়ে উঠতে পারে। যদি বীর্য প্রবল, কিন্তু সমাধি দুর্বল হয়, তখন সে চঞ্চল হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু যদি সমাধি ও বীর্যের সমতা থাকে, তাহলে সে অলসও হবে না, চঞ্চলও হবে না এবং ধ্যান লাভ করতে সক্ষম হবে।

কোনো ব্যক্তি শমথ ধ্যান পেতে ইচ্ছুক হলে তার বিশ্বাস প্রবল হলে ভালো হয়। যদি সে ভাবে, 'প্রতিভাগ-নিমিত্তে মনোযোগ দিলে আমি নিশ্চিত ধ্যান লাভ করতে সক্ষম হবো' তখন সেই বিশ্বাসের শক্তিতে বলীয়ান হয়ে, এবং প্রতিভাগ-নিমিত্তে মনোযোগ দিয়ে সে নিশ্চিতই ধ্যান লাভ করবে। কারণ, ধ্যান হচ্ছে মূলত সমাধির তথা মনোযোগের বিষয়।

বিদর্শন ভাবনাকারী ব্যক্তির প্রজ্ঞা প্রবল হওয়া ভালো, কারণ প্রজ্ঞা প্রবল হলে সে বিশ্লেষণপূর্বক অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম এই ত্রিলক্ষণকে বুঝতে এবং দেখতে সমর্থ হবে।

যখন সমাধি ও প্রজ্ঞার মধ্যে ভারসাম্য বজায় থাকে, তখন লৌকিক ধ্যান অর্জন করা যায়। আবার বুদ্ধ যেভাবে শমথ ও বিদর্শন ভাবনা করতে শিখিয়েছেন সেভাবে ধ্যান করলে লোকোত্তর ধ্যান অর্জন করা সম্ভব তখনই, যখন সমাধি ও প্রজ্ঞার মধ্যে সমতা বিরাজ করে। স্মৃতি সব সময়ই দরকারী, কেননা এটি মনকে অতিরিক্ত শ্রদ্ধা, বীর্য বা প্রজ্ঞার বশবর্তী হয়ে চঞ্চল হওয়া থেকে রক্ষা করে এবং অতিরিক্ত সমাধির ফলে অলস হওয়া থেকে রক্ষা করে। এটি শ্রদ্ধার সাথে প্রজ্ঞা, সমাধির সাথে বীর্য এবং সমাধির সাথে প্রজ্ঞার মধ্যে সমতা আনে।

আচার বানাতে যেমন সব সময় লবণ লাগে, রাজার কাজকারবারে সব সময় যেমন মন্ত্রী লাগে, সেভাবেই সব সময় সর্বক্ষেত্রে স্মৃতি দরকারী। তাই প্রাচীন অর্থকথায় বলা হয়েছে যে, ভগবান বুদ্ধ বলেছেন, 'যেকোনো ধ্যানের বিষয়ে স্মৃতি সব সময়ই প্রয়োজন।' কেন? কারণ, এটি হচ্ছে ভাবনাকারী-মনের জন্য আশ্রয় ও রক্ষাকর্তা। স্মৃতি একটি আশ্রয়, কারণ এটি মনকে উচ্চস্তরে নিয়ে যায়, যেখানে মন কখনোই আসে নি আগে। স্মৃতি ব্যতিরেকে মন কোনো বিশেষ ও অসাধারণ স্তর লাভ করতে পারে না। স্মৃতি মনকে রক্ষা করে, ধ্যানের বিষয়বস্তুকে মন থেকে হারিয়ে যেতে দেয় না। তাই যারা এটাকে অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে জানে, তাদের কাছে স্মৃতি যেন ধ্যানের বিষয়বস্তুকে রক্ষাকারী, সেই সাথে ভাবনাকারীর মনের রক্ষাকর্তাও বটে। স্মৃতি ছাড়া

কোনো ব্যক্তি তার মনকে উপরে তুলতে বা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। এ কারণেই বুদ্ধ এটাকে সর্বকাজে প্রয়োজনীয় বলেছেন।

কীভাবে আপনি সপ্ত বোধ্যঙ্গকে সমতায় আনবেন

শ্বাসপ্রশ্বাসে স্মৃতি রেখে কেউ যদি ধ্যান লাভ করতে চায়, তাহলে তার সপ্ত বোধ্যঙ্গের মাঝে সমতা বিধান করা জরুরি। এগুলো হচ্ছে :

১. স্মৃতি : যা প্রতিভাগ-নিমিত্তকে মনে রাখে এবং বার বার এটিকে লক্ষ করে।

২. ধর্মবিচয় (ধর্মগুলোর বিচার) **:** যা প্রতিভাগ-নিমিত্তকে তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে বুঝে নেয়।

৩. বীর্য (প্রচেষ্টা) **:** যা বোধ্যঙ্গগুলোকে একত্র করে এবং প্রতিভাগ-নিমিত্তে তাদের সমানভাবে জড়িয়ে রাখে; বিশেষত এটি নিজেকে ও সেই সাথে ধর্মবিচয়কে আরও প্রবল করে।

৪. প্রীতি : প্রতিভাগ-নিমিত্তকে জানার জন্য খুশিভাব।

৫. প্রশান্তি : মনের ও মনের উপাদানগুলোর শান্তভাব, যাদের বিষয়বস্তুই হচ্ছে প্রতিভাগ-নিমিত্ত।

৬. সমাধি : প্রতিভাগ-নিমিত্তে মনের একাগ্রতা।

৭. উপেক্ষা : মনের সমতা, যা প্রতিভাগ-নিমিত্ত পেয়ে চঞ্চলও নয়, আবার তা থেকে নিজেকে সরিয়েও নেয় না।

ভাবনাকারীকে অবশ্যই এই সপ্ত বোধ্যঙ্গকে পরিপূর্ণ করতে হবে এবং সমতায় আনতে হবে। প্রচেষ্টা যথাযথ না হলে মন ধ্যানের বিষয়বস্তু তথা প্রতিভাগ-নিমিত্ত থেকে দূরে সরে যায়। এক্ষেত্রে প্রশান্তি, সমাধি ও উপেক্ষাকে না বাড়িয়ে বাড়ানো দরকার ধর্মবিচয়, বীর্য ও প্রীতিকে। এতে মন পুনরায় উজ্জীবিত হয়। যখন বীর্য অত্যাধিক হয়, মন তখন চঞ্চল ও লক্ষ্যবস্তু থেকে বিক্ষিপ্ত হয়। তখন কিন্তু ভাবনাকারীর পক্ষে ধর্মবিচয়, বীর্য ও প্রীতিকে বাড়ানো উচিত নয়, বরং তার উল্টোটা করা উচিত, অর্থাৎ এক্ষেত্রে বাড়ানো উচিত প্রশান্তি, সমাধি ও উপেক্ষাকে। এভাবে চঞ্চল ও বিক্ষিপ্ত মন বাধ্য হয় ও শান্ত হয়ে ওঠে।

এভাবেই পঞ্চ-ইন্দ্রিয় ও সপ্ত বোধ্যঙ্গকে সমতায় আনতে হয়।

কীভাবে আপনি ধ্যান লাভ করবেন

পঞ্চ-ইন্দ্রিয়—শ্রদ্ধা, বীর্য, স্মৃতি, সমাধি ও প্রজ্ঞা—যখন যথেষ্ট পরিমাণে পরিপূর্ণতা লাভ করে, সমাধি (মনোযোগ) তখন উপচার ধ্যান থেকে অর্পণা ধ্যানে পৌঁছে যায়। ধ্যানে পৌঁছলে আপনি নির্বিঘ্নে প্রতিভাগ-নিমিত্তকে জানতে পারবেন। আপনি এভাবে থাকতে পারবেন কয়েক ঘণ্টা, এমনকি সারা রাত অথবা সারাটা দিন।

যখন মন এভাবে প্রতিভাগ-নিমিত্তে সব সময় লেগে থাকে এক বা দুই ঘণ্টা ধরে, আপনার তখন জানার চেষ্টা করা উচিত কোথায় মনোদ্বার (ভবাঙ্গচিত্ত) অবস্থান করে। সেটাই মনোদ্বার-রূপ। ভবাঙ্গচিত্ত হচ্ছে উজ্জ্বল ও দীপ্তিমান। অর্থকথায় এটাকে মনোদ্বার বলা হয়েছে। যদি আপনি অনেক অনেকবার চেষ্টা করতে থাকেন, তাহলে একসময় মনোদ্বার ও প্রতিভাগ-নিমিত্তকে চিনতে পারবেন। এরপর আপনার ধ্যানের পাঁচটি অঙ্গকে একটি একটি করে চেনা দরকার। ক্রমাগত অনুশীলনের ফলে আপনি ধ্যানাঙ্গ-গুলোকে একবারেই চিনে ফেলতে পারবেন। ধ্যানের পাঁচটি অঙ্গ হচ্ছে :

১. বিতর্ক (উদ্দেশ্যমূলক চিন্তা) **:** শ্বাসপ্রশ্বাসের প্রতিভাগ-নিমিত্তে মনকে পরিচালনা করা ও সেখানে রাখা।

২. বিচার (নিরবচ্ছিন্ন চিন্তা) **:** শ্বাসপ্রশ্বাসের প্রতিভাগ-নিমিত্তে মনকে ধরে রাখা।

৩. প্রীতি : শ্বাসপ্রশ্বাসের প্রতিভাগ-নিমিত্তকে পছন্দ করা।

৪. সুখ : শ্বাসপ্রশ্বাসের প্রতিভাগ-নিমিত্ত সম্পর্কে সুখী মনোভাব।

৫. একাগ্রতা : শ্বাসপ্রশ্বাসের প্রতিভাগ-নিমিত্তের উপরে মনের একাগ্রতা।

ধ্যানের এই অঙ্গগুলোকেই সমন্বিতভাবে ধ্যান বলা হয়। ধ্যান অনুশীলনের প্রাথমিক পর্যায়ে, আপনার দীর্ঘক্ষণ ধরে ধ্যানে প্রবেশের অনুশীলন করা উচিত। ধ্যানাঙ্গগুলোকে জানার জন্য বেশি সময় ব্যয় করা উচিত নয়।

ধ্যানের উপরে আপনার দক্ষতা (বশীভাব) গড়ে তোলা উচিত। পাঁচ প্রকার দক্ষতা আছে :

১. ধ্যানের অঙ্গগুলোকে চেনার ক্ষমতা[১]।

---

[১]. ধ্যানের অঙ্গগুলোকে চেনা ও পর্যালোচনা করাটা একই মনোদ্বার-বীথিতে ঘটে থাকে। চেনার কাজটা ঘটে মনোদ্বারাবর্তন চিত্তের মাধ্যমে, এক্ষেত্রে যার বিষয়বস্তু হয় ধ্যানের পাঁচটি অঙ্গের যেকোনো একটি অঙ্গ, যেমন বিতর্ক। পর্যালোচনার কাজটা ঘটে চার, পাঁচ, ছয় বা সাতটি পর্যালোচনাকারী অনুরণন (জবন) চিত্তে, যেই চিত্তগুলো মনের

২. যখন খুশি ধ্যানে প্রবেশের দক্ষতা।

৩. যতক্ষণ ইচ্ছা ততক্ষণ ধ্যানে থাকার দক্ষতা।

৪. অমুক সময়ে ধ্যান থেকে উঠব—এরূপ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যথাসময়ে ধ্যান থেকে উঠার দক্ষতা।

৫. ধ্যানের অঙ্গগুলোকে পর্যালোচনা করার দক্ষতা।

অঙ্গুত্তর নিকায়ের পব্বতেয়্যগাভী সূত্রে বুদ্ধ বলেছেন, প্রথম ধ্যানে সুদক্ষ না হয়ে দ্বিতীয় ধ্যানে যাওয়ার চেষ্টা করা উচিত নয়। তিনি ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন যে যদি কেউ প্রথম ধ্যানে সর্বদিক দিয়ে সুদক্ষ না হয়ে উচ্চতর ধ্যানে যাওয়ার চেষ্টা করে, তাহলে সে প্রথম ধ্যান হারাবে, সাথে সাথে উচ্চতর ধ্যানগুলোও লাভ করতে পারবে না। সে সবগুলো ধ্যানই হারিয়ে ফেলবে।

যখন আপনি প্রথম ধ্যানে সুদক্ষ হবেন, সবকিছু আপনার আয়ত্বে আসবে, তখন আপনি দ্বিতীয় ধ্যানে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা শুরু করে দিতে পারেন। আপনাকে প্রথম ধ্যানে ঢুকতে হবে, তা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে এবং প্রথম ধ্যানের দোষ পর্যালোচনা করতে হবে, আর দ্বিতীয় ধ্যানের সুবিধাগুলো ভেবে দেখতে হবে। সেটা করতে হবে এভাবে : প্রথম ধ্যান হচ্ছে পঞ্চ নীবরণের খুব কাছাকাছি, বিতর্ক ও বিচার এই ধ্যানের অঙ্গগুলো স্থূল, তাই দ্বিতীয় ধ্যানের চেয়ে এটা অনেক কম শান্ত, দ্বিতীয় ধ্যানে এই ধ্যানাঙ্গগুলো নেই, তাই সেটি প্রথম ধ্যানের তুলনায় খুব শান্ত। অতএব, এই দুটি ধ্যানের অঙ্গগুলোর প্রতি কোনো কামনা না রেখে, কেবল প্রীতি, সুখ ও একাগ্রতার জন্য আবার প্রতিভাগ-নিমিত্তে মনোযোগ দিতে হবে। এভাবেই আপনি দ্বিতীয় ধ্যান লাভ করতে পারবেন যেখানে থাকে শুধু তিনটি ধ্যানের অঙ্গ : প্রীতি, সুখ ও একাগ্রতা। এরপরে দ্বিতীয় ধ্যানে পাঁচ প্রকারে সুদক্ষ হওয়াটা আয়ত্ব করা উচিত।

যখন দ্বিতীয় ধ্যান আপনার আয়ত্বে আসবে, এবং তৃতীয় ধ্যান পেতে চাইবেন, তখন দ্বিতীয় ধ্যান থেকে বেরিয়ে এসে এর দোষগুলো পর্যালোচনা করতে হবে আর তৃতীয় ধ্যানের সুবিধাগুলো দেখতে হবে। অর্থাৎ, দ্বিতীয় ধ্যান হচ্ছে প্রথম ধ্যানের কাছাকাছি, আর এতে আছে প্রীতি নামক ধ্যান অঙ্গ যা স্থূল। তাই এটি তৃতীয় ধ্যানের চেয়ে কম শান্ত, কেননা তৃতীয় ধ্যানে প্রীতি ধ্যানের অঙ্গটি নেই, তাই এটি আরও শান্ত। এভাবে মনে মনে তৃতীয় ধ্যান

দরজার চেনার চিত্তের পর পরই উৎপন্ন হয়, যাদের বিষয়বস্তুও একই। বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য পঞ্চম দেশনা দেখুন।

লাভের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে এবার আপনার প্রতিভাগ-নিমিত্তে মনোযোগ দেওয়া উচিত। এভাবে আপনি তৃতীয় ধ্যান লাভ করতে পারবেন, যেখানে আছে কেবল সুখ ও একাগ্রতা। তৃতীয় ধ্যান লাভের পরে আপনার এই ধ্যানে পাঁচ প্রকারে সুদক্ষ হওয়াটা আয়ত্ব করা উচিত।

যখন এতে সফল হবেন এবং চতুর্থ ধ্যান পেতে চাইবেন, তখন আপনাকে তৃতীয় ধ্যান থেকে বের হয়ে এসে তৃতীয় ধ্যানের দোষগুলো পর্যালোচনা করতে হবে আর চতুর্থ ধ্যানের সুবিধাগুলো ভেবে দেখতে হবে। অর্থাৎ, এভাবে পর্যালোচনা করতে হবে, তৃতীয় ধ্যানে সুখ নামক ধ্যানাঙ্গ বা ধ্যানের উপাদান আছে, যা স্থূল, তাই এটি চতুর্থ ধ্যানের চেয়ে কম শান্ত। চতুর্থ ধ্যান লাভের ইচ্ছে নিয়ে এখন আপনার আবার প্রতিভাগ-নিমিত্তে মনোযোগ দেওয়া উচিত। এভাবেই আপনি চতুর্থ ধ্যান লাভ করতে পারবেন, যাতে আছে কেবল উপেক্ষা ও একাগ্রতা। এরপর আপনার চতুর্থ ধ্যানে পাঁচ প্রকারে সুদক্ষ হওয়াটা আয়ত্ব করা উচিত।

চতুর্থ ধ্যান লাভের সাথে সাথে শ্বাসপ্রশ্বাস সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। এতে করে আনাপানস্মৃতির চতুর্থ ধাপ সম্পূর্ণ হয় :

৪. 'শ্বাসপ্রবাহ শান্ত করে আমি শ্বাস নেব' এভাবে সে ভাবনা করে। 'শ্বাসপ্রবাহ শান্ত করে আমি শ্বাস ফেলব' এভাবে সে ভাবনা করে।

এই ধাপটা শুরু হয় নিমিত্ত আবির্ভূত হওয়ার ঠিক আগে আগে। চারটি ধ্যানের ভেতর দিয়ে অগ্রসর হওয়ার সময় ধ্যান যতই গভীর হতে থাকে, শ্বাসপ্রশ্বাস ততই শান্ত থেকে আরও শান্ত, সূক্ষ্ম থেকে আরও সূক্ষ্ম হয়ে ওঠে, যতক্ষণ না চতুর্থ ধ্যানে গিয়ে পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়।

যখন ভাবনাকারী শ্বাসপ্রশ্বাসের ধ্যানের মাধ্যমে চতুর্থ ধ্যানে পৌঁছে যান, আর পাঁচ প্রকারে সুদক্ষ হয়ে ওঠেন, মনোযোগের সেই আলো উজ্জ্বল, দেদীপ্যমান হয়ে ওঠে, তখন তিনি ইচ্ছে করলে বিদর্শন ভাবনায় অগ্রসর হতে পারেন। অথবা তিনি শমথ ভাবনায় দক্ষতা লাভের জন্য অগ্রসর হতে পারেন। সেটাই আমার পরবর্তী দেশনার বিষয়বস্তু, কীভাবে দশ কৃৎস্নের মাধ্যমে শমথ ধ্যান করতে হয়।

প্রশ্নোত্তর পর্ব - ১

প্রশ্ন ১.১ : *আনাপানস্মৃতির চারটি ধাপে কেমন করে আমরা বুঝব কখন এক ধাপ থেকে আরেক ধাপে যেতে হবে?*

উত্তর ১.১ : বুদ্ধ আনাপানস্মৃতি শিখিয়েছেন ধাপে ধাপে : দীর্ঘ শ্বাস, ছোট্ট শ্বাস, পুরো শ্বাস, আর সূক্ষ্ম শ্বাস—এগুলো শুধুমাত্র বুঝার সুবিধার জন্য। বাস্তবে ধ্যান করার সময় এই চারটি ধাপই একই সময়ে ঘটতে পারে। যেমন, শ্বাস যখন দীর্ঘ হয়, আমাদের পুরো শ্বাসটাকেই জানার চেষ্টা করা উচিত। যখন শ্বাস ছোট হয়, সংক্ষিপ্ত হয়, তখনো আমাদের পুরো শ্বাসটাকে জানার চেষ্টা করা উচিত। এটা কেবল তখনই করা উচিত যখন আপনার মনোযোগের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, যখন আপনি আধ ঘণ্টা মনোযোগ ধরে রাখতে পারেন তখন। এরপর আপনি যদি পুরো দীর্ঘ শ্বাস ও ছোট্ট শ্বাসের উপরে মনোযোগ ধরে রাখতে পারেন ঘণ্টা খানিক, তাহলে শ্বাসপ্রশ্বাস এমনিতেই সূক্ষ্ম হয়ে যাবে, আর তখন আপনি সেই সূক্ষ্ম শ্বাসে মনোযোগ দিতে পারবেন। যদি শ্বাসপ্রশ্বাস সূক্ষ্ম না হয়, আপনার শুধুমাত্র শ্বাসপ্রশ্বাসে মনোযোগ দেওয়া উচিত। আপনি কখনোই ইচ্ছে করে শ্বাসপ্রশ্বাসকে সূক্ষ্ম করবেন না, অথবা দীর্ঘ বা ছোট্ট করবেন না। এভাবে, চারটি ধাপই একটা ধাপে এসে যায়। চতুর্থ ধাপে শ্বাসপ্রশ্বাস কেবল সূক্ষ্ম হয়ে যায়, পুরোপুরি বন্ধ হয় না। শ্বাসপ্রশ্বাস পুরোপুরি থেমে যায় কেবল চতুর্থ ধ্যানে। এটাই সবচেয়ে সূক্ষ্মতম ধাপ।

প্রশ্ন ১.২ : *ধ্যানে নিমিত্ত থাকার প্রয়োজন আছে কি?*

উত্তর ১.২ : কিছু কিছু ধ্যান আছে যেমন আনাপান, কৃৎস্ন ধ্যান ও অশুভ ধ্যানে একটা নিমিত্ত প্রয়োজন। কিন্তু অন্যান্য ধ্যানের বিষয় যেমন বুদ্ধানুস্মৃতিতে ধ্যান লাভের জন্য নিমিত্তের প্রয়োজন নেই। মৈত্রী-ভাবনায় সীমা ভেঙে ফেলাকে বলা হয় নিমিত্ত।

প্রশ্ন ১.৩ : *কেউ কেউ বলে যে শ্বাসপ্রশ্বাসের ধ্যানের সময়ে তাদের আত্মা দেহের বাইরে চলে যায়। এটা কি সত্যি, নাকি তারা ভুল পথে আছে?*

উত্তর ১.৩ : একাগ্র মন স্বাভাবিকভাবেই নিমিত্ত সৃষ্টি করে। যখন মনোযোগ গভীর, প্রবল ও শক্তিশালী হয়, বিভিন্ন সংজ্ঞার কারণে বিভিন্ন ধরনের নিমিত্ত হাজির হয়। যেমন, যদি আপনি নিমিত্তকে দীর্ঘ চান, এটি দীর্ঘ হবে; যদি আপনি এটাকে ছোট চান, এটি ছোট হবে; যদি আপনি গোল চান, এটি গোল হবে; যদি আপনি লাল চান, এটি লাল হয়ে যাবে। অতএব, শ্বাসপ্রশ্বাসের ধ্যানে নানা ধরনের সংজ্ঞার উৎপত্তি হতে পারে। আপনি নিজেকে দেহের বাইরে দেখতে পান। এটা মনের সৃষ্টি মাত্র, আত্মার কারণে নয়। এটা কোনো সমস্যা নয়। এটাকে পাত্তা না দিয়ে নিজের শ্বাসপ্রশ্বাসের প্রতি মনোযোগী হোন।

একমাত্র যখন আপনি ভেতরের ও বাইরের পরমার্থ নামরূপকে যথাযথভাবে চিনবেন, তখন আপনি আত্মার সমস্যার সমাধান করতে পারবেন : আপনি তখন কোথাও আত্মাকে খুঁজে পাবেন না। তাই আপনাকে দেহমনের বাঁধনকে ভেঙে ভেঙে পরম দেহমনকে দেখতে হবে, উপলব্ধি করতে হবে।

'নানাধাতুযো বিনিভুজিত্বা ঘনবিনিভোগে কতে অনত্তলকখনং যাথাবসরসতো উপট্ঠাতি' : যখন আমরা এই ঘন বাঁধনকে ভেঙে ফেলি, অনাত্মসংজ্ঞার উদয় হয়। দেহ ও মনের নিবিড় বাঁধনের কারণেই আত্মা ধারণার জন্ম হয়।

দেহের নিবিড়তাকে ভাঙতে গিয়ে আপনাকে প্রথমে রূপকলাপকে (ক্ষুদ্র কণা) চিনতে হবে। এর পরে চিনতে হবে বিভিন্ন ধরনের পরমার্থ রূপকে, যেগুলো প্রত্যেকটি রূপকলাপে কমপক্ষে আটটি করে থাকে। এটা করা ব্যতীত আত্মার ধারণা বিলুপ্ত হবে না।

একইভাবে, মনের নিবিড়তাকে ভাঙা ব্যতীত আত্মার ধারণাটা চলে যাবে না। উদাহরণস্বরূপ, যখন মন এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ায়, আপনি হয়তো মনে করতে পারেন, এই ভ্রমণরত মনটাই হচ্ছে আত্মা। আরেকটা উদাহরণ হচ্ছে '*বিসঙ্খারগতং চিত্তং*'। এখানে *বিসঙ্খার* মানে হচ্ছে 'সংস্কারবিহীন', অর্থাৎ নির্বাণ। সংস্কারগুলো হচ্ছে নামরূপ ও তাদের কারণগুলো। নির্বাণের কোনো সংস্কার নেই, কিন্তু নির্বাণকে দেখার কাজে চেতনাজনিত সংস্কারের প্রয়োজন। বুদ্ধের ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে অর্হত্ত্বফলচিত্ত ও তার সাথে উৎপন্ন (সহজাত) চৈতসিকগুলো। যদি এটা প্রথম ধ্যান অর্হত্ত্বফলচিত্ত হয়, তাহলে সেখানে থাকে ৩৭টি চিত্তসংস্কার। যারা এখনো মার্গজ্ঞান, ফলজ্ঞান, ও বিদর্শন জ্ঞান লাভ করেন নি, অথবা যারা এখনো মনের নিবিড়তাকে ভেঙে ফেলেননি, তারা চিত্তকেই তাদের আত্মা বলে মনে করতে পারেন। কিন্তু মনের নিবিড়তাকে ভেঙে ভেঙে দেখলে তারা দেখবেন যে চিত্ত ও তার চৈতসিকগুলো দ্রুতগতিতে উৎপন্ন ও বিলীন হয়ে যাচ্ছে। অনিত্যের ধারণার সাথে আসবে অনাত্মের ধারণা। মেঘিয়সুত্রে বুদ্ধ বলেছেন : '*অনিচ্চসঞ্ঞনো মেঘিয় অনত্তসঞ্ঞা সণ্ঠাতি*'। যাদের অনিত্য দেখার মতো অন্তর্দৃষ্টি খুব তীক্ষ্ণ, তাদের কাছে অনাত্ম দেখার মতো অন্তর্দৃষ্টি পরিষ্কারভাবে উৎপন্ন হয়।

প্রশ্ন ১.৪ : *[আনাপান] নিমিত্ত কোত্থেকে আসে? এটা কী কারণে উৎপন্ন হয়?*

উত্তর ১.৪ : বেশির ভাগ মনের অবস্থাগুলো শ্বাসপ্রশ্বাস নিয়ে মনের

প্রতিক্রিয়ার কারণে উৎপন্ন হয়। সত্যিকারের আনাপান-নিমিত্ত উৎপন্ন হয় শ্বাসপ্রশ্বাস থেকে। তবে প্রত্যেক মনের অবস্থাই নিমিত্ত উৎপন্ন করে না। কেবল গভীরভাবে একাগ্র মনই নিমিত্ত উৎপন্ন করে। অতএব, গভীর ও একাগ্র মনের শ্বাসপ্রশ্বাসে আনাপান-নিমিত্ত আবির্ভূত হয়। যদি নিমিত্তটি নাকের ডগা থেকে দূরে দেখা যায়, তাহলে এটি সত্যিকারের নিমিত্ত নয়। একাগ্রতার কারণে নিমিত্ত উৎপন্ন হতে পারে, কিন্তু সেটা সব সময় সত্যিকারের নিমিত্ত হয় না। যদি এই নিমিত্তের মাধ্যমে ধ্যান উৎপন্ন হয়, তখন আমরা সেটাকে আনাপান-নিমিত্ত বলি। কিন্তু যদি এটি ধ্যান উৎপন্ন না করে, তাহলে সেটা সত্যিকারের আনাপান-নিমিত্ত নয়। যদি আপনি সেই নিমিত্তে মনোযোগ দেন, তাহলে ধ্যান উৎপন্ন হবে না। সাধারণত এতে মনোযোগটা তীব্র ও শক্তিশালী হয় না। যদি আপনি এমন নিমিত্ত নিয়ে ধ্যান করতে থাকেন, সেটা শীঘ্রই হারিয়ে যাবে।

প্রশ্ন ১.৫ : *বিশুদ্ধির সাতটি ধাপ এবং ষোলটি বিদর্শন জ্ঞান কী কী?*

উত্তর ১.৫ : বিশুদ্ধির সাতটি ধাপ হচ্ছে :

১. শীলবিশুদ্ধি,
২. চিত্তবিশুদ্ধি,
৩. দৃষ্টিবিশুদ্ধি,
৪. কঙ্খা-উত্তরণ-বিশুদ্ধি,
৫. মার্গ-অমার্গ জ্ঞানদর্শন-বিশুদ্ধি,
৬. প্রতিপদ-জ্ঞানদর্শন-বিশুদ্ধি, এবং
৭. জ্ঞানদর্শন-বিশুদ্ধি।

ষোলটি বিদর্শন জ্ঞান হচ্ছে :

১. নামরূপ পরিচ্ছেদ জ্ঞান,
২. প্রত্যয়-পরিগ্রহ জ্ঞান,
৩. সংমর্শন জ্ঞান,
৪. উদয়-বিলয় জ্ঞান,
৫. ভঙ্গ-জ্ঞান,
৬. ভয়-জ্ঞান,
৭. আদীনব জ্ঞান,
৮. নির্বেদ জ্ঞান,
৯. মুক্তিকাম্যতা জ্ঞান,

১০. প্রতিসংখ্যা জ্ঞান,
১১. সংস্কারোপেক্ষা জ্ঞান,
১২. অনুলোম জ্ঞান,
১৩. গোত্রভু জ্ঞান,
১৪. মার্গজ্ঞান,
১৫. ফলজ্ঞান, এবং
১৬. প্রত্যবেক্ষণ-জ্ঞান।

এখন আপনি ষোলটি বিদর্শন জ্ঞানের নাম জানেন, ভালো কথা; কিন্তু আপনি কি সেগুলো নিজে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন? না। এজন্যই শুধু তাত্ত্বিক জ্ঞান যথেষ্ট নয়। এগুলোর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করতে হলে আপনাকে অবশ্যই প্রবল প্রচেষ্টা নিয়ে ধ্যানসাধনা চালিয়ে যেতে হবে।

[সম্পাদকের বক্তব্য : এই দেশনার পরে পা-অক সেয়াদ পঞ্চ নীবরণের উপরে নিম্নোক্ত কথাগুলো বলেন।]

এখন আমি আপনাদের সংক্ষেপে পাঁচটি নীবরণ সম্পর্কে ব্যাখ্যা করে দিতে চাই। প্রথম নীবরণ হচ্ছে ইন্দ্রিয়সুখ-কামনা *(কামচ্ছন্দ)*। এটি হচ্ছে ব্যক্তি বা বস্তুর প্রতি আসক্তি। এটি হচ্ছে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু পাওয়ার কামনা। উদাহরণস্বরূপ, আপনি আপনার কুটির অথবা রুমের প্রতি আসক্ত হতে পারেন। ধ্যানের সময়ে আপনি চিন্তা করতে পারেন, 'আহা, আমার কুটিরটা সুন্দর হলে খুব ভালো হতো!' অথবা আপনি ভাবতে পারেন, 'আহা, পুরো রুমটাই যদি আমার হতো, তাহলে ভালো হতো!' ইন্দ্রিয়সুখ-কামনার চিন্তায় ভারাক্রান্ত হয়ে থাকলে আপনি আপনার ধ্যানের বিষয়বস্তুতে ভালোভাবে মনোযোগ দিতে পারবেন না। ইন্দ্রিয়সুখ-কামনার চিন্তাগুলো থামাতে হলে আপনার অবশ্যই তীক্ষ্ণ স্মৃতি এবং প্রচন্ড রকম প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

দ্বিতীয় নীবরণ হচ্ছে ধ্বংসাত্মক চিন্তা *(ব্যাপাদ)*। এটি হচ্ছে ব্যক্তি বা বস্তুর প্রতি ঘৃণা বা অসন্তোষ। উদাহরণস্বরূপ, যদি আপনার পাশে বসা কোনো একজন ধ্যান চলাকালীন তার চীবর দিয়ে খস খস শব্দ করেন, আপনি তাতে ক্ষুদ্ধ হয়ে ভাবতে পারেন, 'আহা, এই লোকটা এত শব্দ করছে কেন?' যদি আপনার মনটা ঘৃণা বা অসন্তোষ দিয়ে জর্জরিত থাকে, তখনো আপনি ধ্যানের বিষয়বস্তুতে মনোযোগ দিতে পারবেন না।

তৃতীয় নীবরণ হচ্ছে আলস্য এবং জড়তা *(থিন-মিদ্ধ)*। যদি মনটা দুর্বল হয়, অথবা ধ্যানের বিষয়বস্তুতে আগ্রহী না হয়, তাহলে আলস্য এবং জড়তা

আসতে পারে। মাঝে মাঝে অবশ্য ক্লান্তি বা বিশ্রামের অভাবেও তন্দ্রা আসতে পারে।

চতুর্থ নীবরণ হচ্ছে চঞ্চলতা এবং অনুতাপ *(উদ্ধচ্চ-কুক্কুচ্চ)*। যদি আপনার মনটা চঞ্চল হয়, তখন সেটা যেন ঢিল ছুঁড়ে মারা একটা ছাইয়ের স্তুপ, যেখানে ছাইগুলো চারদিকে উড়ে উড়ে ছড়িয়ে পড়েছে। একইভাবে, চঞ্চলতা থাকলে মনটাও বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়। ধ্যান করার সময় আপনি কখনোই মনকে বিশ্রাম নিতে দেবেন না এবং মনকে ধ্যানের বিষয়বস্তু হতে অন্য কোথাও চলে যেতে দেবেন না। যদি দেন, তো চঞ্চলতা আসবে। অনুতাপ হচ্ছে অতীতের খারাপ কাজ করা হয়েছে এবং ভালো কাজগুলো করা হয় নি, তার জন্য আফসোস করা। এখানেও আপনাকে তীক্ষ্ণ স্মৃতি রাখতে হবে এবং চঞ্চলতা ও অনুতাপ যাতে না আসে তার জন্য কঠিন প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

পঞ্চম নীবরণ হচ্ছে কোনো কিছুর সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ বা সংশয় *(বিচিকিচ্ছা)*। এটা হচ্ছে :

১. বুদ্ধ সম্পর্কে সন্দেহ,
২. ধর্ম সম্পর্কে সন্দেহ,
৩. সংঘ সম্পর্কে সন্দেহ,
৪. ত্রিশিক্ষা, যথা : শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞা সম্পর্কে সন্দেহ,
৫. অতীত পঞ্চস্কন্ধ সম্পর্কে সন্দেহ,
৬. ভবিষ্যৎ পঞ্চস্কন্ধ সম্পর্কে সন্দেহ,
৭. একই সাথে অতীত ও ভবিষ্যৎ পঞ্চস্কন্ধ সম্পর্কে সন্দেহ, এবং
৮. প্রতীত্যসমুৎপাদ-নীতি সম্পর্কে সন্দেহ।

সমাধি শিক্ষা সম্পর্কে সন্দেহ থাকলে আপনি ভালোমতো ধ্যান করতে পারবেন না। উদাহরণস্বরূপ, আপনি হয়তো ভাবতে পারেন : 'আনাপান-স্মৃতির মাধ্যমে কি ধ্যান লাভ করা সম্ভব? আনাপান-নিমিত্তে মনোযোগ দিয়ে কি ধ্যান পাওয়া যাবে?'

এই পাঁচটি নীবরণ হচ্ছে ধ্যান-সমাধির অন্তরায়। ❑

[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[দেশনা ২]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]

অন্যান্য বিষয় নিয়ে ধ্যান

আমার আগের দেশনাতে আমি ব্যাখ্যা করেছিলাম, কীভাবে শ্বাসপ্রশ্বাসকে ধ্যানের বিষয়বস্তু করে চতুর্থ ধ্যান পর্যন্ত লাভ করা যায়। আমি দেশনা শেষ করেছিলাম এই বলে যে, ভাবনাকারী যদি শ্বাসপ্রশ্বাসের ভাবনার মাধ্যমে চতুর্থ ধ্যান পর্যন্ত পৌঁছে যান এবং পাঁচটি কৌশলে সুদক্ষ হয়ে ওঠেন, ধ্যানের আলো উজ্জ্বল ও দীপ্তিমান হয়, তখন তিনি চাইলে বিদর্শন ভাবনায় চলে যেতে পারেন।

কিন্তু, এই পর্যায়ে ভাবনাকারী ইচ্ছে করলে শমথ ভাবনা আরও পরিপূর্ণরূপে চালিয়ে যেতে পারেন। আজকে আমি বিস্তারিত ব্যাখ্যা করব, কীভাবে অন্যান্য শমথ বিষয়গুলো নিয়ে ভাবনা করতে হয়, যেমন : দেহের বত্রিশটি অংশ, হাড়গোড়, দশ কৃৎস্ন ইত্যাদি।

দেহের বত্রিশটি অংশ

দেহের বত্রিশটি অংশ নিয়ে ভাবনা করতে চাইলে আপনার প্রথমে আনাপান ভাবনায় চতুর্থ ধ্যানে মগ্ন হওয়া উচিত। যখন ধ্যানের আলো উজ্জ্বল ও দীপ্তিমান হয়ে উঠবে, তখন আপনার দেহের বত্রিশটা অংশকে চিহ্নিত করা উচিত, একটা একটা করে। দেহের বত্রিশটি অংশের মধ্যে বিশটি অংশে পৃথিবী-ধাতুর প্রাধান্য, আর বারোটা অংশে পানি-ধাতুর প্রাধান্য। পৃথিবী-ধাতুর বিশটি অংশকে পাঁচটি পাঁচটি করে চার ভাগে ভাগ করা উচিত :

১-৫ : চুল, লোম, নখ, দাঁত, চামড়া।

৬-১০ : মাংস, পেশীতন্তু, হাড়, হাড়ের মজ্জা, কিডনি।

১১-১৫ : হৃদপিন্ড, যকৃত, ঝিল্লি, প্লীহা, ফুসফুস।

১৬-২০ : অন্ত্র, অভ্যন্তরীণ ঝিল্লি, হজম না হওয়া খাদ্য, মল, মস্তিষ্ক।

বারোটি পানি-ধাতুর অংশকে ছয়টি ছয়টি করে দু-ভাগে ভাগ করা উচিত :

১-৬ : পিত্ত, কফ, পুঁজ, রক্ত, ঘাম, মেদ।

৭-১২ : অশ্রু, চর্বি, থুথু, শ্লেষ্মা, হাড়ের জোড়ায় অবস্থিত তরল পদার্থ, প্রস্রাব।

এই অংশগুলোকে উপর্যুক্ত ক্রমানুসারে দেখুন, তবে একবারে একটা করে। পরিষ্কার আয়নায় নিজের চেহারা যেভাবে দেখেন, দেহের প্রত্যেকটি অংশকে ঠিক সেভাবে দেখার চেষ্টা করুন।

এমনটা করার সময় যদি ধ্যানের আলো ম্লান হয়ে আসে, আর দেহের যে অংশটাকে দেখা হচ্ছে, সেটা ঝাপসা হয়, তখন আনাপান ভাবনার চতুর্থ ধ্যানে মগ্ন হওয়া উচিত। যখন আলো আবার উজ্জ্বল ও তীব্র হবে, তখন আবার দেহের অংশগুলো দেখা উচিত। ধ্যানের আলো ম্লান হয়ে এলে এমনই করুন।

চর্চা করতে থাকুন যতক্ষণ না চুল থেকে প্রস্রাব, অথবা প্রস্রাব থেকে চুল পর্যন্ত প্রত্যেক অংশকে পরিষ্কারভাবে এবং তীক্ষ্ণ জ্ঞানে দেখতে না পারেন ততক্ষণ পর্যন্ত। যতক্ষণ না আপনি দক্ষ না হন, ততক্ষণ চর্চা করতে থাকুন।

এরপর, ধ্যানের আলোর সাহায্যে চোখ বন্ধ অবস্থায়, আপনার পাশের জনকে দেখার চেষ্টা করা উচিত। বিশেষত সবচেয়ে ভালো হয় আপনার সামনে থাকা কোনো ব্যক্তিকে দেখলে। সেই ব্যক্তির বত্রিশটি অংশকে দেখুন, তার চুল থেকে প্রস্রাব এবং প্রস্রাব থেকে চুল পর্যন্ত। বত্রিশটি অংশকে ক্রমান্বয়ে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এবং শেষ থেকে প্রথম পর্যন্ত বহুবার দেখুন। আপনি যখন অভ্যন্তরীণ অংশ, অর্থাৎ আপনার দেহের অংশগুলো এবং সেই সাথে বাইরের অংশ বা অন্য ব্যক্তির দেহের অংশগুলো দেখতে সক্ষম হবেন, তা অনেক বার চর্চা করতে থাকুন।

এভাবে দেহের বত্রিশটা অংশকে অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিকভাবে দেখতে সক্ষম হলে আপনার সমাধিবল বাড়বে। তখন একটু একটু করে আপনার দেখার পরিধিকে বাড়ানো উচিত, ক্রমান্বয়ে কাছ থেকে দূরে। দূরের ব্যক্তিদের দেখতে পান না বলে চিন্তা করবেন না। চতুর্থ ধ্যানের সেই উজ্জ্বল আলোয় আপনি সহজেই দূরের ব্যক্তিদের দেখতে পারবেন; খালি চোখে নয়, জ্ঞানের চোখে *(ঞাণচকখু)*। আপনার দেখার পরিধিকে দশদিকে বাড়ানো উচিত : উপরে, নিচে, পূর্বে, পশ্চিমে, উত্তরে, দক্ষিণে, উত্তর-পূর্ব কোণে, দক্ষিণ-পূর্ব কোণে, উত্তর-পশ্চিম কোণে, দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে। এই দশদিকে যাকেই আপনি দেখতে পাবেন, সে মানুষ হোক, প্রাণী হোক, তার বত্রিশটা অংশকে দেখুন, একবার অভ্যন্তরীণ ও একবার বাহ্যিকভাবে, একেকবারে এক একজন

ব্যক্তি বা প্রাণীকে।

যেদিকেই তাকান না কেন আর যখনই তাকান না কেন, যখন আপনি আর নারী, পুরুষ, অথবা গরু, মোষ, অথবা অন্য কোনো জানোয়ার না দেখে শুধু বত্রিশটা অংশের সমষ্টিকে দেখবেন, কেবল তখনই আপনাকে দেহের বত্রিশটি অংশের ভাবনায় সফল, দক্ষ এবং অভিজ্ঞ হিসেবে বলা যাবে।

নির্বাণের তিন প্রবেশপথ

এখানে আমি নির্বাণের তিনটি প্রবেশপথ সম্পর্কে একটু ব্যাখ্যা করতে চাই। দীর্ঘনিকায়ের *মহাসতিপটঠান সুত্রে* বুদ্ধ বলেন যে, চারি সতিপটঠান ভাবনা হচ্ছে নির্বাণের একমাত্র পথ। অন্যদিকে অর্থকথায় ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে নির্বাণের তিনটি প্রবেশপথ রয়েছে এবং সেগুলোকে দরজা নামে অভিহিত করা হয়েছে। সেগুলো হচ্ছে বর্ণকৃৎস্ন *(বণ্ণকসিণ)*, বিশ্রীভাব *(পটিকূল-মনসিকার)* এবং শূন্যতা *(সুঞ্ঞতা)* বা চারি ধাতু ভাবনা।

তবে এগুলোকে কেবল শমথ ভাবনা হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়, বিদর্শন নয়।

কাজেই, যখন কোনো ব্যক্তি দেহের বত্রিশটি অংশকে অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক উভয়ভাবে দেখতে সুদক্ষ হয়ে ওঠে, তখন সে এই তিনটি প্রবেশপথের যে কোনো একটিকে বেছে নিতে পরে। প্রথমে আমি ব্যাখ্যা করব, কীভাবে দেহের বত্রিশটি অংশের বিশ্রীভাব নিয়ে ভাবনা করতে হয়।

কঙ্কাল

দেহের বিশ্রীভাবের ভাবনা করার জন্য আপনি পুরো বত্রিশটি অংশকেই আপনার ধ্যানের বিষয়বস্তু হিসেবে নিতে পারেন, অথবা কেবল একটিকেও বেছে নিতে পারেন। কঙ্কাল বা হাড়গোড়গুলো, যা দেহের বত্রিশটি অংশের একটি, সেটা নিয়ে কীভাবে ধ্যান করতে হয় আমি তা এখানে ব্যাখ্যা করব।

এই ভাবনা করার জন্য আপনার আবার চতুর্থ আনাপান ধ্যানে প্রবেশ করা উচিত। যখন আলো উজ্জ্বল ও দীপ্তিমান হবে, এটাকে আপনার নিজের দেহের বত্রিশটি অংশকে দেখতে ব্যবহার করুন, এর পরে কাছের কোনো ব্যক্তিকে দেখুন। এভাবে অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিকভাবে দেখুন একবার বা দুবার। এরপরে অভ্যন্তরীণ কঙ্কালের পুরোটাকে প্রজ্ঞার চোখে দেখুন। যখন পুরো কঙ্কালটা পরিষ্কার হয়ে উঠবে, তখন কঙ্কালের বিশ্রীভাবকে বিষয়বস্তু হিসেবে নিয়ে নিন,

আর বার বার মনে মনে বলুন : বিশ্রী, বিশ্রী *(পটিকূল, পটিকূল)*, অথবা বিশ্রী কঙ্কাল, বিশ্রী কঙ্কাল *(অটিঠকপটিকূল, অটিঠকপটিকূল)*, অথবা কঙ্কাল, কঙ্কাল *(অটিঠক, অটিঠক)*।

আপনার যে ভাষায় খুশি মনে মনে বলুন। মনটাকে স্থিরভাবে কঙ্কালের বিশ্রীভাবের উপর ধরে রাখার চেষ্টা করা উচিত এক বা দুই ঘণ্টা পর্যন্ত। এর রং, আকার, অবস্থান ও আশেপাশের বিষয়বস্তুর সাথে কঙ্কালের বিচ্ছিন্নতা বা সীমা লক্ষ করুন সতর্কতার সাথে।

শ্বাসপ্রশ্বাসের চতুর্থ ধ্যানের মনোযোগের শক্তিশালী ভিত্তির কারণে আপনি দেখবেন যে এই ভাবনাও গভীর এবং সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে। আপনি বিশ্রীভাবের উপলব্ধি এবং জ্ঞানকে উৎপন্ন করতে পারবেন, ধরে রাখতে পারবেন এবং সুদৃঢ় করতে পারবেন।

কঙ্কালের বিশ্রীভাবের উপরে আপনার মনোযোগ প্রতিষ্ঠিত হলে 'কঙ্কালের' সংজ্ঞাকে বাদ দেওয়া উচিত এবং শুধু বিশ্রীভাবের উপরে স্মৃতি রাখা উচিত।

বিশুদ্ধিমার্গমতে, রং, আকার, অবস্থান ও সীমা দেখা মানে হচ্ছে উদগ্রহ-নিমিত্ত দেখা। সেই অংশের বিশ্রীভাবকে দেখা হচ্ছে প্রতিভাগ-নিমিত্ত দেখা।

ধ্যানের পাঁচটি অঙ্গ

কঙ্কালের বিশ্রীভাবের প্রতিভাগ-নিমিত্তে মনোযোগ স্থাপন করে আপনি প্রথম ধ্যান লাভ করতে পারেন। তখন ধ্যানের পাঁচটি অঙ্গ বিদ্যমান থাকবে। এগুলো হচ্ছে :

১. **বিতর্ক** *(বিতক্ক)* : মনকে কঙ্কালের বিশ্রীভাবের উপর পরিচালনা করা ও সেখানে রাখা।

২. **বিচার** *(বিচার)* : কঙ্কালের বিশ্রীভাবের উপরে মনকে ধরে রাখা।

৩. **প্রীতি** *(পীতি)* : কঙ্কালের বিশ্রীভাবকে পছন্দ করা।

৪. **সুখ** *(সুখ)* : কঙ্কালের বিশ্রীভাব সম্পর্কে সুখী মনোভাব।

৫. **একাগ্রতা** *(একগ্গতা)* : কঙ্কালের বিশ্রীভাবের উপরে মনের একাগ্রতা।

একই পদ্ধতিতে দেহের অন্য যেকোনো অংশের বিশ্রীভাবের উপর ভাবনা করেও আপনি প্রথম ধ্যান লাভ করতে পারেন।

একটা প্রশ্ন আসে, কঙ্কালের বিশ্রীভাবকে বিষয়বস্তু হিসেবে নিয়ে কীভাবে প্রীতি ও সুখ আসা সম্ভব? এর উত্তর হচ্ছে যে, যদিও আপনি কঙ্কালের বিশ্রীভাবের উপরে মনোযোগ দিচ্ছেন, তবুও আপনি এই ভাবনা করে যাচ্ছেন,

কারণ আপনি এর উপকারিতা উপলব্ধি করেছেন, এবং বুঝতে পেরেছেন যে এটা আপনাকে অবশেষে বুড়ো হওয়া, রোগ ও মৃত্যু থেকে মুক্তি পেতে সাহায্য করবে। প্রীতি ও সুখ আসে আরও একটা কারণে, কারণ আপনি তখন পাঁচটি নীবরণ, যেগুলো আপনার মনকে তপ্ত ও ক্লান্ত করে রাখে, সেগুলোকে সরিয়ে দিয়েছেন।

এটা অনেকটা সেই টোকাইয়ের মতো, যে বড়সড় আবর্জনার স্তূপ দেখে আনন্দিত হয় এই ভেবে, 'আমি এটা থেকে অনেক টাকা কামাব।' অথবা খুব অসুস্থ কোনো ব্যক্তির মতো, যে বমি করতে পেরে সুখী ও আনন্দিত হয়, অথবা কোনো ডায়রিয়া-আক্রান্ত ব্যক্তি, যে মলত্যাগ করতে পেরে আনন্দিত হয়।

অভিধর্ম-অর্থকথা ব্যাখ্যা করে যে, যে ব্যক্তি কঙ্কালের বিশ্রীভাবের উপরে প্রথম ধ্যান পেয়েছে, তার প্রথম ধ্যানে পাঁচ প্রকারে সুদক্ষ হওয়াটা আয়ত্ব করা উচিত। এর পরে সবচেয়ে কাছে যে ব্যক্তি, বিশেষ করে সামনে বসা কোনো ব্যক্তির কঙ্কালকে তার ধ্যানের আলোর সাহায্যে ভাবনার বিষয়বস্তু করা উচিত। তার এটিকে বিশ্রী ধারণায় মনোযোগ দেওয়া উচিত এবং এই বিশ্রী সংজ্ঞাটা নিয়ে ভাবনা করা উচিত যতক্ষণ না ধ্যানের অঙ্গগুলো স্পষ্ট হয়। যদিও ধ্যানের অঙ্গগুলো স্পষ্ট হয়, কিন্তু অর্থকথামতে, এটি উপচার সমাধিও নয়, অর্পণা সমাধিও নয়, কেননা বিষয়বস্তু এখানে জীবন্ত। যদি আপনি বাহ্যিক কঙ্কালে এমনভাবে মনোযোগ দেন যেন এটি মৃত, তাহলে অভিধর্মের টীকা-মূলটীকা অনুসারে, আপনি উপচার ধ্যান লাভ করতে পারবেন।

যখন ধ্যানের অঙ্গগুলো সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে, আপনার আবার অভ্যন্তরীণ কঙ্কালের উপর বিশ্রীভাব নিয়ে মনোযোগ দেওয়া উচিত। এভাবে পরস্পর বদলাবদল করা উচিত, একবার অভ্যন্তরীণ, একবার বাহ্যিক এভাবে পালাক্রমে বার বার। যখন আপনি কঙ্কালের বিশ্রীভাবের উপরে এভাবে ধ্যান করেন এবং এটা গভীর ও পূর্ণাঙ্গ বিকশিত হয়, তখন আপনার দেখার পরিধি দশদিকে বাড়ানো উচিত। একবারে এক দিককে ধ্যানের আলোয় দেখুন। সেই আলো সেই দিকে যতদূর যায় ততদূর পর্যন্ত একইভাবে ধ্যানচর্চা করুন। আপনার তীক্ষ্ণ অন্তর্ভেদী জ্ঞানকে কাছে-দূরে সবদিকে একবার বাহ্যিকভাবে, একবার অভ্যন্তরীণভাবে, এভাবে বার বার প্রয়োগ করা উচিত। চর্চা করতে থাকুন যতক্ষণ না দশদিকের যেখানেই আপনি তাকান, কেবল কঙ্কাল দেখতে পান। এতে সফল হলে আপনি তখন সাদা কৃৎস্ন-ভাবনার জন্য প্রস্তুত।

দশবিধ কৃৎস্ন

বর্ণ কৃৎস্ন

কৃৎস্ন-ভাবনায় চারটি রং ব্যবহার করা হয় : নীল, হলুদ, লাল এবং সাদা। নীলকে কালো বা বাদামী হিসেবেও ধরা যায়। দেহের বিভিন্ন অংশের রংকে ভাবনার বিষয়বস্তু করে নিয়ে এই চার ধরনের কৃৎস্ন ভাবনায় চতুর্থ ধ্যান পর্যন্ত লাভ করা যায়।

অভিধর্মের অর্থকথামতে, চুল, লোম, এবং চোখের মানিককে নীল, বাদামী বা কালো কৃৎস্ন হিসেবে চতুর্থ ধ্যান পর্যন্ত ব্যবহার করা যায়। মেদ এবং প্রস্রাবকে হলুদ কৃৎস্নের কাজে ব্যবহার করা যায়। রক্ত ও মাংসকে লাল কৃৎস্নের জন্য ব্যবহার করা যায়। আর সাদা অংশগুলো, যেমন—হাড়, দাঁত এবং নখগুলো সাদা-কৃৎস্নের জন্য ব্যবহার করা যায়।

সাদা কৃৎস্ন

সূত্রে বলা হয়েছে, চারটি বর্ণ কৃৎস্নের মধ্যে সাদা কৃৎস্ন শ্রেষ্ঠ। কারণ, এটা মনকে পরিষ্কার ও উজ্জ্বল করে তোলে। এ কারণে, প্রথমে আমি এই সাদা কৃৎস্ন-ভাবনা কীভাবে করতে হয় তা ব্যাখ্যা করব।

সাদা কৃৎস্ন-ভাবনা করতে গেলে প্রথমে চতুর্থ আনাপান ভাবনায় মগ্ন হওয়া উচিত। যখন ধ্যানের আলো উজ্জ্বল ও দীপ্তিমান হবে, তখন সেই আলোকে আপনার অভ্যন্তরীণ শরীরের বত্রিশটি অংশকে দেখতে ব্যবহার করা উচিত। এরপরে বাহ্যিকভাবে নিকটস্থ কোনো ব্যক্তির দেহের বত্রিশটি অংশকে দেখা উচিত। এরপরে সেই ব্যক্তির শুধু কঙ্কালের অংশটা দেখুন। যদি সেটাকে বিশ্রীভাবে দেখতে চান, দেখতে পারেন; কিন্তু দেখতে না চাইলে শুধু বাহ্যিক কঙ্কালটাই দেখুন।

এরপরে কঙ্কালের সবচেয়ে সাদা অংশটা, অথবা যদি পুরো কঙ্কালটাই সাদা হয়, তাহলে পুরোটাই, অথবা খুলির পিছনের অংশটাতে 'সাদা, সাদা' বলে মনোযোগ দিন। বিকল্প হিসেবে আপনি যদি চান, এবং যদি আপনার মনোযোগ খুব তীক্ষ্ণ হয়, তাহলে আপনি যদি আপনার অভ্যন্তরীণ কঙ্কালকে বিশ্রীভাবে দেখেন, এবং প্রথম ধ্যানে পৌঁছে যান, তখন সেই কঙ্কালটাকে সাদা হিসেবে ধরে নিন এবং সেটাকেই ভাবনার প্রাথমিক বিষয়বস্তু হিসেবে ব্যবহার করুন।

এ ছাড়াও আপনি প্রথমে বাহ্যিক কঙ্কালের বিশ্রীভাবটা খেয়াল করে সেই বিশ্রী সংজ্ঞাকে স্থির ও দৃঢ় করতে পারেন, এভাবে আপনি কঙ্কালের সাদা রংটাকে আরও পরিষ্কার করে তুলতে পারেন। এরপরে আপনি সংজ্ঞাটাকে বদলে ফেলে 'সাদা, সাদা' বলে ভাবনা করতে পারেন এবং এভাবে সাদা কৃৎস্ন-ভাবনা করতে পারেন।

বাহ্যিক কঙ্কালের সাদা কোনো কিছুকে এভাবে বিষয়বস্তু করে আপনার মনকে শান্ত ও একাগ্র করে সেই সাদা বিষয়বস্তুর উপরে রাখা উচিত এক বা দু ঘণ্টা যাবৎ।

শ্বাসপ্রশ্বাসের চতুর্থ ধ্যানের শক্তিশালী ভিত্তির কারণে আপনি দেখবেন যে আপনার মন শান্ত ও একাগ্র হয়ে সাদা বিষয়বস্তুতে থাকছে। যখন আপনি এক বা দু-ঘণ্টা যাবৎ অভিন্ন মনোযোগ ধরে রাখতে পারবেন, তখন দেখবেন যে কঙ্কাল অদৃশ্য হয়ে গেছে, শুধু একটি সাদা বৃত্ত আছে।

যখন সাদা বৃত্তটি শিমুল তুলোর মতো সাদা হবে, সেটাই উদগ্রহ-নিমিত্ত। যখন এটি শুকতারার মতো উজ্জ্বল ও স্পষ্ট হবে, সেটি প্রতিভাগ-নিমিত্ত। কঙ্কাল-নিমিত্ত, যা থেকে উদগ্রহ-নিমিত্ত উৎপন্ন হয়, সেটি হচ্ছে পরিকর্ম-নিমিত্ত।

মনে মনে 'সাদা, সাদা' বলে ভাবনা চালিয়ে যান যতক্ষণ না এটি প্রতিভাগ-নিমিত্ত হয়। প্রতিভাগ-নিমিত্তে মনোযোগ দিন যতক্ষণ না আপনি প্রথম ধ্যানে পৌঁছে যান। তবে আপনি দেখবেন যে এই মনোযোগ খুব একটা স্থিতিশীল হয় না আর বেশিক্ষণ থাকে না। মনোযোগকে স্থিতিশীল ও দীর্ঘস্থায়ী করার জন্য নিমিত্তকে বাড়াতে হবে আপনার।

এটা করার জন্য প্রতিভাগ-নিমিত্তে এক বা দু ঘণ্টা যাবৎ মনোযোগ দেওয়া উচিত। এরপর আপনি সাদা বৃত্তটাকে এক, দুই, তিন বা চার ইঞ্চি বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিন, যতটা আপনি বাড়াতে পারবেন বলে মনে করেন, ততটা আর কি। সফল হন কিনা দেখুন। কিন্তু প্রথমে সীমা নির্ধারণ না করে নিমিত্ত বাড়ানোর চেষ্টা করবেন না যেন। নিমিত্ত বাড়ানোর আগে অবশ্যই এক, দুই, তিন বা চার ইঞ্চি করে একটা সীমা স্থির করবেন। সাদা বৃত্তটা বাড়ানোর সময়ে হয়তো এটি অস্থিতিশীল হয়ে উঠতে পারে। তখন আপনি আবার 'সাদা, সাদা' বলে মনোযোগ দেবেন স্থিতিশীল করার জন্য। আপনার মনোযোগ বাড়তে থাকলে নিমিত্ত এমনিতেই স্থিতিশীল ও শান্ত হয়ে পড়বে।

যখন প্রথম বর্ধিত নিমিত্ত স্থিতিশীল হয়ে আসবে, তখন আবার কয়েক ইঞ্চি বাড়ানো উচিত আপনার, অর্থাৎ আবার কয়েক ইঞ্চি বাড়ানোর সংকল্প

করুন। এভাবে আপনি ধাপে ধাপে নিমিত্তকে বাড়াতে পারবেন, যতক্ষণ না এটি এক গজ হয়, এরপর দু গজ করে, এভাবে পরপর বাড়াতে থাকুন। এভাবে বাড়াতে থাকুন যতক্ষণ না আপনার দশদিকে এটি ছড়িয়ে পড়ে সীমাহীনভাবে, যেদিকে তাকান না কেন, আপনি শুধু দেখবেন সাদা আর সাদা। যতক্ষণ পর্যন্ত এক বিন্দু রূপের অস্তিত্ব দেখা যাবে, বাহ্যিক বা অভ্যন্তরীণ, ততক্ষণ পর্যন্ত বাড়াতে থাকুন। যদি আপনি অতীত জন্মে সাদা কৃৎস্ন-ভাবনা করে থাকেন, এই বুদ্ধশাসন বা অতীত কোনো বুদ্ধের শাসনামলে, অর্থাৎ আপনার যদি সাদা কৃৎস্ন পারমী থাকে, তাহলে আপনার প্রতিভাগ-নিমিত্তকে বাড়াতে হবে না, কারণ সেখানে মনোযোগ দিলে সেটি আপনাআপনি দশদিকে ছড়িয়ে পড়বে। উভয়ক্ষেত্রেই এখন আপনি শান্তভাবে সাদা কৃৎস্নের উপরে একাগ্র মনে মনোযোগ ধরে রাখুন, আর যখন এটি স্থিতিশীল হয়ে আসবে, তখন আপনার মনকে সেই সাদা কৃৎস্নের একটা জায়গায় রেখে দিন, অনেকটা কোনো টুপি যেমন করে একটা হুকের আগায় লেগে থাকে, সেভাবে। আপনার মনকে সেখানে রাখুন এবং 'সাদা, সাদা' বলতে থাকুন।

যখন আপনার মনটা স্থির ও শান্ত হবে, সাদা কৃৎস্নও শান্ত ও স্থির হয়ে আসবে এবং অত্যন্ত সাদা, উজ্জ্বল ও পরিষ্কার হয়ে উঠবে। এটাও প্রতিভাগ-নিমিত্ত, যেটা আগের সাদা কৃৎস্নের প্রতিভাগ-নিমিত্তকে বাড়ানোর ফলে উৎপন্ন হয়েছে।

আপনাকে অবশ্যই ভাবনা চালিয়ে যেতে হবে, যতক্ষণ না সেই সাদা কৃৎস্নের প্রতিভাগ-নিমিত্তে এক বা দুই ঘণ্টা যাবৎ মনোযোগ ধরে রাখতে পারেন ততক্ষণ। অতঃপর ধ্যানের অঙ্গগুলো আপনার মনে খুব স্পষ্ট, পরিষ্কার ও শক্তিশালী হয়ে ধরা দেবে। তখন আপনি প্রথম ধ্যানে পৌঁছে যাবেন। পাঁচটি ধ্যানের অঙ্গ হচ্ছে :

১. বিতর্ক *(বিতক্ক)* : মনকে সাদা কৃৎস্নের উপর পরিচালনা করা ও সেখানে রাখা।

২. বিচার *(বিচার)* : সাদা কৃৎস্নের উপরে মনকে ধরে রাখা।

৩. প্রীতি *(পীতি)* : সাদা কৃৎস্নকে পছন্দ করা।

৪. সুখ *(সুখ)* : সাদা কৃৎস্ন সম্পর্কে সুখী মনোভাব।

৫. একাগ্রতা *(একগ্গতা)* : সাদা কৃৎস্নের উপরে মনের একাগ্রতা।

ধ্যানের অঙ্গগুলোকে একত্রে ধ্যান বলা হয়। শ্বাসপ্রশ্বাসের ভাবনায় যেভাবে বলা হয়েছে, সেভাবে প্রথম সাদা কৃৎস্ন-ধ্যানে পাঁচটি দক্ষতা অর্জনের জন্য

চর্চা করুন; আর দ্বিতীয়, তৃতীয়, এবং চতুর্থ ধ্যান লাভ করুন।

চারটি ধ্যানকে রূপাবচর-ধ্যানও বলা হয়, কারণ এগুলো আপনার রূপভূমিতে জন্মগ্রহণের কারণ হতে পারে। কিন্তু এখানে আমরা রূপভূমিতে জন্মগ্রহণের জন্য ধ্যান করাকে উৎসাহিত করি না, সেগুলোকে বিদর্শন ভাবনার ভিত্তি হিসেবে ব্যবহার করার জন্যই এই ধ্যান করতে উৎসাহিত করি।

যদি আপনি বাহ্যিক কঙ্কালের সাদাকে ভিত্তি করে সাদা কৃৎস্ন-ভাবনায় চতুর্থ ধ্যান পর্যন্ত পেয়ে থাকেন, তাহলে বাহ্যিক চুলকে নিয়ে বাদামী, নীল বা কালো কৃৎস্নও ভাবনা করতে পারবেন। হলদে কৃৎস্ন-ভাবনা করতে পারবেন বাহ্যিক মেদ বা প্রস্রাব নিয়ে, আর লাল কৃৎস্ন-ভাবনা করতে পারবেন বাহ্যিক রক্ত, ইত্যাদি নিয়ে। আপনি নিজের শরীরের সেই অংশগুলো নিয়েও ভাবনা করতে পারবেন।

যখন আপনি এতে সফল হবেন, তখন ফুলের রং বা অন্যান্য বাহ্যিক জিনিসের রং নিয়েও ভাবনা করতে পারবেন। সকল নীল ও বাদামী রঙের ফুলগুলো আপনাকে নীল কৃৎস্ন-ভাবনা করতে স্বাগত জানাচ্ছে। সকল হলদে রঙের ফুলগুলো আপনাকে হলদে কৃৎস্ন-ভাবনা করার আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। সকল লাল লাল ফুলগুলো আপনাকে ডেকে বলছে লাল কৃৎস্ন-ভাবনা করতে। সমস্ত সাদা সাদা ফুলগুলো ডেকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে সাদা কৃৎস্ন-ভাবনা করার জন্য। এভাবে, একজন দক্ষ ভাবনাকারী যা দেখেন তা থেকেই কৃৎস্ন-ভাবনা করতে পারেন, সেটা হোক জীবিত বা মৃত, বাহ্যিক বা অভ্যন্তরীণ।

পালি গ্রন্থাবলী অনুসারে, বুদ্ধ দশটি কৃৎস্ন শিক্ষা দিয়েছেন। সেগুলো হচ্ছে চারটি বর্ণ কৃৎস্ন, আর সেই সাথে আরও ছয়টি : পৃথিবী, পানি, আগুন, বাতাস, আকাশ, এবং আলোর কৃৎস্ন।

এখন আমি একটু ব্যাখ্যা করব, কী করে বাকি ছয়টি কৃৎস্ন-ভাবনা করতে হয়।

পৃথিবী কৃৎস্ন

পৃথিবী কৃৎস্ন-ভাবনা করতে হলে আপনাকে প্রথমে এক টুকরো সমতল ভূমি খুঁজে নিতে হবে যার রং হবে সকালের আকাশের মতো রক্তিম বাদামী। এতে কোনো কাঠি, পাথর, পাতা ইত্যাদি থাকতে পারবে না। এরপর একটি লাঠি বা কোনো কিছু দিয়ে সেই ভূমির উপর মোটামুটি এক ফুট ব্যাসের একটা বৃত্ত আঁকুন। এই বৃত্তটাই আপনার ধ্যানের বিষয়বস্তু, একটি পৃথিবী কৃৎস্ন।

আপনার এতে মনোযোগ দেওয়া উচিত ‘পৃথিবী, পৃথিবী’ বলে। চোখ খোলা রেখে কিছুক্ষণ সেটাতে মনোযোগ দিন। এরপরে চোখ বন্ধ করে এটিকে কল্পনা করুন। যদি এটাকে এভাবে কল্পনা করতে ব্যর্থ হন, তবে আনাপান ভাবনার চতুর্থ ধ্যান অথবা সাদা কৃৎস্নের চতুর্থ ধ্যানে প্রবেশ করা উচিত। এরপরে ধ্যানের আলোয় পৃথিবী কৃৎস্নকে দেখুন। যখন আপনি খোলা চোখে দেখতে পাওয়ার মতো করে ধ্যানের আলোয় সেটাকে দেখবেন, তখন আপনি সেখান থেকে অন্য কোথাও গিয়ে ভাবনা চর্চা করতে পারেন।

পৃথিবী কৃৎস্নের রঙের প্রতি মনোযোগ দেওয়া উচিত নয়। পৃথিবী ধাতুর কাঠিন্য, কর্কশতা প্রভৃতির প্রতিও মনোযোগ দেওয়া উচিত নয়। কেবল পৃথিবী ধারণায় মনোযোগ দিন। এই উদগ্রহ-নিমিত্তে মনোযোগ দিতে থাকুন যতক্ষণ না এটি বিশুদ্ধ ও পরিষ্কার হয়ে ওঠে। সেটিই প্রতিভাগ-নিমিত্ত।

এই প্রতিভাগ-নিমিত্তকে একবারে একটু একটু করে দশদিকে বাড়ানো উচিত, এবং চতুর্থ ধ্যান পর্যন্ত যাওয়া উচিত।

পানি কৃৎস্ন

পানি কৃৎস্ন-ভাবনা করতে গেলে আপনার ব্যবহার করা উচিত একটি পানির পাত্র, গামলা, অথবা বিশুদ্ধ, পরিষ্কার পানির কূপ। পানি ধারণার উপরে মনোযোগ দিন ‘পানি, পানি’ বলে এবং পৃথিবী কৃৎস্নের মতো করে নিমিত্ত উৎপন্ন করুন।

আগুন কৃৎস্ন

আগুন কৃৎস্ন-ভাবনার জন্য আপনার ব্যবহার করা উচিত কোনো আগুন, মোমবাতি অথবা আগের দেখা কোনো আগুনের শিখা, যা আপনি স্মরণ করতে পারেন। যদি কল্পনার চোখে দেখতে ব্যর্থ হন, তাহলে একটা পর্দা টাঙিয়ে সেখানে এক ফুট মাপের একটা ছিদ্র বানাতে পারেন। এবার পর্দাটা কাঠ অথবা ঘাসের আগুনের সামনে বসিয়ে দিন, যাতে ছিদ্র দিয়ে আপনি কেবল আগুনের শিখাগুলো দেখতে পান।

ধোঁয়া, এবং জ্বলন্ত কাঠ বা ঘাসে মন দেওয়ার দরকার নেই, আপনি আগুনের ধারণায় মন দিন ‘আগুন, আগুন’ বলে এবং উপর্যুক্ত নিয়মে নিমিত্ত উৎপন্ন করুন।

বাতাস কৃৎস্ন

বাতাস কৃৎস্ন-ভাবনা করতে হয় স্পর্শের অনুভূতি, অথবা দেখার মাধ্যমে। জানালা বা দরজার মধ্য দিয়ে বাতাস এসে আপনার শরীর স্পর্শ করছে, সেই স্পর্শে আপনার মনোযোগ দেওয়া উচিত। অথবা গাছের পাতা বা ডালপালা বাতাসে নড়াচড়া করলে তাতে বাতাসের ধারণায় মনোযোগ দেওয়া উচিত 'বাতাস, বাতাস' বলে। আপনি অন্য কোনো কৃৎস্ন-ভাবনায় চতুর্থ ধ্যানে প্রবেশ করে ধ্যানের আলোর মাধ্যমে বাহ্যিক নড়াচড়াগুলো দেখে বাতাসের নিমিত্তকে গ্রহণ করতে পারেন। উদগ্রহ-নিমিত্ত হচ্ছে ভাতের পাত্র থেকে উঠে আসছে এমন গরম বাষ্পের মতো। তবে প্রতিভাগ-নিমিত্ত গতিহীন। নিমিত্তকে বাড়ান আগের নিয়মেই।

আলো কৃৎস্ন

আলো কৃৎস্ন-ভাবনা করতে গিয়ে রুমে প্রবেশ করছে এমন আলোর রশ্মির প্রতি মনোযোগ দেওয়া উচিত। উদাহরণস্বরূপ, দেওয়ালের কোনো ফাটলের মধ্য দিয়ে আলোকরশ্মি মেঝেতে পড়ছে, অথবা গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে আলোকরশ্মি মাটিতে পড়ছে এমন কিছুকে। আপনি গাছের ডালপালার ফাঁক দিয়েও উপরে আকাশের আলোকে দেখতে পারেন। যদি সেগুলো কল্পনা করতে ব্যর্থ হন, তাহলে একটা মোমবাতি বা প্রদীপ একটা মাটির পাত্রের মধ্যে রেখে দিয়ে পাত্রটিকে এমনভাবে রাখুন যেন পাত্রের খোলামুখ দিয়ে আলো এসে পড়ে দেয়ালের উপর। দেয়ালের উপরে সেই আলোর বৃত্তের উপর মনোযোগ দিন আলোর ধারণায় 'আলো, আলো' বলে। আর এভাবে নিমিত্ত উৎপন্ন করুন।

আকাশ কৃৎস্ন

আকাশ কৃৎস্ন-ভাবনায় আপনার আকাশ দেখা উচিত দরজা, জানালা বা চাবির ছিদ্রের মধ্য দিয়ে। তা কল্পনা করতে না পারলে একটা পাতলা বোর্ড বা পর্দা নিয়ে সেখানে আট ইঞ্চি থেকে এক ফুটের একটা ছিদ্র করুন। এবার বোর্ডটা উঁচু করে ধরুন যেন ছিদ্র দিয়ে শুধু আকাশ দেখা যায়, গাছপালা বা অন্য কোনো বস্তু নয়। সেই বৃত্তের মধ্যেকার আকাশটাকে আকাশ ধারণায় 'আকাশ, আকাশ' বলে মনোযোগ দিন আর নিমিত্ত উৎপন্ন করুন আগের পদ্ধতিতে।

চার অরূপ ধ্যান

দশ কৃৎস্নের প্রত্যেকটি ভাবনাতে চারটি ধ্যান লাভ করলে এবার আপনি চারটি অরূপ-ধ্যান লাভের জন্য অগ্রসর হতে পারেন, যেগুলোকে অন্য কথায় চারটি অরূপ অবস্থাও বলা হয়। এগুলো হলো :

১. অসীম আকাশ ভূমি *(আকাশ-অনন্ত-আয়তন)*।

২. অসীম চেতনাভূমি *(বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন)*।

৩. শূন্যতা ভূমি *(আকিঞ্চনায়তন)*।

৪. সংজ্ঞা-অসংজ্ঞাহীন ভূমি *(নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন)*।

আপনি এগুলোকে যেকোনো কৃৎস্নের মাধ্যমে ভাবনা করতে পারেন, কেবল আকাশ কৃৎস্ন বাদে।

অসীম আকাশ ভূমি (আকাশ-অনন্ত-আয়তন)

চারটি অরূপ ধ্যান ভাবনা করতে হলে আপনার প্রথমে রূপের অসুবিধাগুলো ভাবা উচিত। আপনার বাবা-মার শুক্রাণু ও ডিম্বাণু মিলে আপনার যে মানবদেহ উৎপন্ন হয়েছে সেটাকে বলা হয় উৎপন্ন-দেহ *(করজকায)*। যেহেতু আপনার একটা উৎপন্ন-দেহ আছে, এতে করে আপনি ছুরি, বর্শা বা গুলি বা অন্য যেকোনো মারণাস্ত্র দিয়ে আক্রমণের শিকার হতে পারেন, এবং আপনাকে গুলি করা যাবে, প্রহার করা যাবে, নির্যাতন করা যাবে। এই উৎপন্ন-দেহ অনেক রোগের শিকার হয় যেমন, চোখের রোগ, কানের রোগ, হৃদরোগ ইত্যাদি। অতএব আপনার প্রজ্ঞাচোখে বিবেচনা করা উচিত যে, যেহেতু আপনার একটা রূপনির্মিত উৎপন্ন-দেহ আছে, আপনি সেজন্য বিভিন্ন ধরনের দুঃখকষ্টের সম্মুখীন হচ্ছেন, আর যদি আপনি রূপ থেকে মুক্ত হতে পারেন, দুঃখকষ্ট থেকেও মুক্তি মিলবে।

যদিও চতুর্থ রূপ-ধ্যান স্থূল দৈহিক রূপকে অতিক্রম করে যায়, তবুও এটি তখনো রূপকে ভিত্তি করে থাকে। তাই আপনাকে কৃৎস্নের রূপকে অতিক্রম করতে হবে। এটা ভেবে নিয়ে, কৃৎস্ন রূপের প্রতি কোনো কামনা না রেখে নয়টি কৃৎস্নের যেকোনো কৃৎস্ন-ভাবনার চতুর্থ ধ্যানে প্রবেশ করা উচিত। উদাহরণস্বরূপ, আমি এখানে পৃথিবী কৃৎস্ন নিয়ে বলব। পৃথিবী কৃৎস্ন-ভাবনার চতুর্থ ধ্যানে প্রবেশ করুন। এরপর এ থেকে বেরিয়ে আসুন এবং এর অসুবিধাগুলো ভেবে দেখুন : এটির ভিত্তি রূপ-আশ্রিত, যা আপনি আর কামনা করেন না; এতে তৃতীয় ধ্যানের প্রীতি আছে কাছাকাছি একটা অস্বস্তিকর শত্রু

হিসেবে; আর এটি চারটি অরূপ ধ্যান থেকে স্থূল।

অন্যান্য ধ্যানগুলোতে আপনি যেভাবে চতুর্থ ধ্যানের মনের সংস্কারগুলোর অসুবিধাগুলো চিন্তা করতেন, এখানে সেভাবে চিন্তা করার প্রয়োজন নেই, কারণ এগুলো অরূপ ধ্যানেও একই।

চতুর্থ রূপ-ধ্যানের প্রতি কোনো কামনা না রেখে এখন এর চেয়ে আরও শান্ত প্রকৃতির অরূপ ধ্যানগুলোর কথাও আপনার ভাবা উচিত।

এবার আপনার নিমিত্তকে বাড়ান। পৃথিবী কৃৎস্নকে এমনভাবে বাড়ান যাতে করে এটি সীমাহীন হয়। অথবা যত খুশি তত বাড়িয়ে কৃৎস্নের রূপকে আকাশ দিয়ে বদলে দিন, আর সেটি যতটুকু জায়গা দখল করে আছে সেটাতে মনোযোগ দিন আকাশ ধারণায় 'আকাশ, আকাশ' অথবা 'অসীম আকাশ, অসীম আকাশ' বলে। যা থাকবে তা হলো অসীম আকাশ, যে জায়গাটা আগে কৃৎস্ন দ্বারা দখল হয়ে জুড়ে ছিল।

এভাবে করতে না পারলে পৃথিবী কৃৎস্ন-নিমিত্তের কোনো একটা অংশের জায়গাটাতে আকাশ ধারণায় মনোযোগ দেওয়া উচিত এবং সেটাকে অসীম মহাবিশ্ব পর্যন্ত বাড়ানো উচিত। এর ফলে পুরো পৃথিবী-কৃৎস্ন-নিমিত্তটি অসীম আকাশ দ্বারা পূর্ণ হবে।

এই অসীম আকাশের নিমিত্তে মনোযোগ দিতে থাকুন যতক্ষণ না ধ্যান লাভ করেন। এরপরে পাঁচটি দক্ষতার চর্চা করুন। এটা হচ্ছে প্রথম অরূপ ধ্যান, যাকে বলা হয় আকাশ-অনন্ত-আয়তন।

অসীম চেতনাভূমি (বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন)

দ্বিতীয় অরূপ ধ্যানকে বলা হয় বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন বা অসীম চেতনাভূমি। এর বিষয়বস্তু হচ্ছে আকাশ-অনন্ত-আয়তন ধ্যানচিত্ত, যার বিষয়বস্তু ছিল অসীম আকাশ।

অসীম চেতনাভূমির ভাবনা করতে গিয়ে আপনার ভাবা উচিত অসীম আকাশের অসুবিধাগুলোর কথা : এর কাছাকাছি আছে চতুর্থ সূক্ষ্ম-রূপ ধ্যান, যা শান্তির প্রতি একটা হুমকি বটে। আর এটি অসীম চেতনাভূমির মতো শান্তও নয়।

অসীম আকাশের প্রতি কোনো কামনা রেখে আপনার আরও ভাবা উচিত অসীম চেতনাভূমির আরও শান্ত প্রকৃতির কথা। এরপরে বার বার মনোযোগ দিন সেই আকাশ-অনন্ত-আয়তন ধ্যানচিত্তে, যার বিষয়বস্তু ছিল অসীম

আকাশ, আর বলুন 'অসীম চেতনা, অসীম চেতনা' অথবা শুধু 'চেতনা, চেতনা'।

অসীম চেতনার নিমিত্তে মনোযোগ দিতে থাকুন যতক্ষণ না ধ্যানে পৌঁছে যান, এরপরে পাঁচটি দক্ষতা আয়ত্ব করুন। এটাই হচ্ছে দ্বিতীয় অরূপ ধ্যান, যাকে বলা হয় বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন বা অসীম চেতনাভূমি।

শূন্যভূমি (আকিঞ্চনায়তন)

তৃতীয় অরূপ ধ্যানকে বলা হয় শূন্যভূমি। এর বিষয়বস্তু হচ্ছে চেতনার শূন্যতা, যে চেতনার বিষয়বস্তু ছিল অসীম আকাশ। শূন্যভূমির ভাবনা করতে গিয়ে অসীম-চেতনাভূমির অসুবিধাগুলো ভেবে নেওয়া উচিত আপনার : এর খুব কাছাকাছি আছে অসীম আকাশ ভূমি যাকে শত্রুই বলা যায়, কেননা এটি শূন্যভূমির মতো এত শান্ত নয়।

অসীম চেতনাভূমির প্রতি কোনো কামনা না রেখে আপনার এখন শূন্যভূমির আরও অধিক শান্ত প্রকৃতির কথা ভাবা উচিত।

এরপর সেই চিত্তের শূন্যতার প্রতি মনোযোগ দিন, যে চিত্তের বিষয়বস্তু ছিল অসীম আকাশ। দুটো ধ্যানচিত্ত রয়েছে : প্রথমটা হচ্ছে অসীম আকাশ ভূমির ধ্যানচিত্ত (আকাশ-অনন্ত-আয়তন ধ্যানচিত্ত), আরেকটা হচ্ছে অসীম চেতনাভূমির ধ্যানচিত্ত (বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন ধ্যানচিত্ত)। দুটি চিত্ত এক চিত্তক্ষণে উৎপন্ন হতে পারে না। যখন অসীম আকাশ ভূমির চিত্ত বর্তমান, তখন অন্য চিত্তটি অনুপস্থিত থাকে এবং এর বিপরীতক্রমেও হয়। অতএব আপনি অবশ্যই অসীম আকাশ ভূমির চিত্তের অনুপস্থিতিকে বিষয়বস্তু হিসেবে ধরে নিয়ে মনে মনে বলতে থাকুন 'শূন্য, শূন্য' অথবা 'অনুপস্থিত, অনুপস্থিত'।

সেই নিমিত্তে মনোযোগ দিতে থাকুন ধ্যানে না পৌঁছানো পর্যন্ত। এরপর পাঁচটি দক্ষতা আয়ত্ব করে নিন। এটিই তৃতীয় অরূপ ধ্যান, যাকে বলা হয় শূন্যভূমি।

সংজ্ঞা-অসংজ্ঞাহীন ভূমি (নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন)

চতুর্থ অরূপ ধ্যানকে বলা হয় সংজ্ঞা-অসংজ্ঞাহীন ভূমি। এর বিষয়বস্তু হচ্ছে শূন্যভূমির চিত্ত। এটিকে সংজ্ঞা-অসংজ্ঞাহীন ভূমি বলা হয়, কারণ এই পর্যায়ে সংজ্ঞা হয় চরম সূক্ষ্ম পর্যায়ের।

সংজ্ঞা-অসংজ্ঞাহীন ভূমির ভাবনা করতে গিয়ে আপনাকে শূন্যভূমির অসুবিধাগুলো ভেবে নিতে হবে : শূন্যভূমি হচ্ছে অসীম চেতনাভূমির খুব কাছাকাছি বলে শান্ততার জন্য হুমকি বা শত্রু। আর এটি সংজ্ঞা-অসংজ্ঞাহীন ভূমির চেয়ে কম শান্ত। তার চেয়েও বড় কথা, সংজ্ঞা নিজেই একটি রোগ, বিষফোঁড়া, এবং ময়লার মতো।

তাই শূন্যভূমির প্রতি কোনো কামনা না রেখে আপনার এখন সংজ্ঞা-অসংজ্ঞাহীন ভূমির আরও শান্ত প্রকৃতির কথা ভাবা উচিত। এরপর শূন্যভূমির চিত্তের উপর বার বার মনোযোগ দিন এই বলে 'শান্ত, শান্ত'।

'শান্ত, শান্ত' বলে নিমিত্তে মনোযোগ দিতে থাকুন যতক্ষণ না ধ্যানে পৌঁছে যান, এর পরে পাঁচটি দক্ষতা আয়ত্ব করুন। এটিই চতুর্থ অরূপ ধ্যান, যাকে বলা হয় সংজ্ঞা-অসংজ্ঞাহীন ভূমি।

আজকে আমি ব্যাখ্যা করেছি কীভাবে দশ কৃৎস্ন-ভাবনা করতে হয়, কীভাবে চারটি রূপ ধ্যান এবং চারটি অরূপ ধ্যানের মাধ্যমে অষ্ট সমাপত্তি লাভ করতে হয়। পরবর্তী দেশনায় আমি ব্যাখ্যা করব কীভাবে মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষার চারটি ব্রহ্মবিহার ভাবনা করতে হয়।

প্রশ্নোত্তর পর্ব - ২

প্রশ্ন ২.১ : *নতুন শিক্ষার্থীরা কীভাবে মনোযোগ ও প্রজ্ঞার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখবে? কীভাবে তারা শ্বাসপ্রশ্বাসের ধ্যানে (আনাপানস্মৃতি) প্রজ্ঞার চর্চা করবে?*

উত্তর ২.১ : আমরা প্রথম দেশনাতেই পঞ্চ-ইন্দ্রিয় নিয়ে আলোচনা করেছি। তবে আমি এখানে সংক্ষেপে বলতে পারি। নবীনদের জন্য মনোযোগ ও প্রজ্ঞার ভারসাম্য বজায় রাখাটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। কারণ, তারা এখনো নতুন, তাদের পঞ্চ-ইন্দ্রিয় এখনো গড়ে ওঠে নি। ধ্যানের শুরুতে সাধারণত মনে বেশ অস্থিরতা বিরাজ করে। তাই পঞ্চ-ইন্দ্রিয় ততটা সবল ও শক্তিশালী হয় না। এগুলো যখন সবল ও শক্তিশালী হয়ে উঠবে, তখনই কেবল তাদের মাঝে ভারসাম্য আনার প্রয়োজন দেখা দেবে। তবে শুরুর ধাপেই যদি নবীনরা ভারসাম্য রাখতে পারে, তো সেটা অবশ্যই ভালো।

উদাহরণস্বরূপ, আপনারা আনাপানস্মৃতি চর্চা করছেন; আনাপানস্মৃতি হচ্ছে শ্বাসপ্রশ্বাসের প্রতি সচেতন থাকা। শ্বাসপ্রশ্বাসকে জানাটা হচ্ছে প্রজ্ঞা *(পঞ্ঞা)*। শ্বাসপ্রশ্বাসের বিষয়ে সচেতন থাকাটা হচ্ছে স্মৃতি *(সতি)*। শ্বাসপ্রশ্বাসের উপর মনের একাগ্রতা হচ্ছে মনোযোগ *(সমাধি)*। শ্বাসপ্রশ্বাসকে

পরিষ্কারভাবে জানার প্রচেষ্টা হচ্ছে প্রচেষ্টা *(বীরিয)*। শ্বাসপ্রশ্বাসের ভাবনার মাধ্যমে ধ্যান লাভ করা যায়, এই বিশ্বাস থাকাটা হচ্ছে শ্রদ্ধা।

নবীনদের অবশ্যই সবল ও শক্তিশালী পঞ্চ-ইন্দ্রিয় গড়ে তোলার চেষ্টা করতে হবে। শ্বাসপ্রশ্বাসের ভাবনায় তাদের বিশ্বাসটা অবশ্যই সুদৃঢ় হতে হবে। তাদের শ্বাসপ্রশ্বাসকে জানার প্রচেষ্টা অবশ্যই শক্তিশালী হতে হবে। শ্বাসপ্রশ্বাসের প্রতি তাদের স্মৃতি অবশ্যই তীক্ষ্ণ হতে হবে। শ্বাসপ্রশ্বাসের প্রতি তাদের মনোযোগ অবশ্যই তীব্র হতে হবে। তাদের অবশ্যই পরিষ্কারভাবে শ্বাসপ্রশ্বাসকে দেখতে হবে। তাদের অবশ্যই তাদের পঞ্চ-ইন্দ্রিয়কে সবল ও শক্তিশালী করে গড়ে তুলতে হবে, আর সেইসাথে তাদের মাঝে ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা করতে হবে। যদি যেকোনো একটা ইন্দ্রিয় অতিরিক্ত হয়, তাহলে অন্যগুলো তাদের কাজ ঠিকমতো করতে পারবে না।

উদাহরণস্বরূপ, যদি শ্রদ্ধা অত্যধিক প্রবল ও শক্তিশালী হয়, এটি আবেগ তৈরি করে। তার মানে হচ্ছে যে শ্বাসপ্রশ্বাসের উপরে মানসিক সংস্কারগুলোকে ধরে রাখার কাজটা, প্রচেষ্টা সেটি পুরোপুরি করতে পারে না; স্মৃতি শ্বাসপ্রশ্বাসে পুরোপুরি আসে না; সমাধিশক্তিও গভীরভাবে শ্বাসপ্রশ্বাসে মনোযোগ দিতে পারে না; আর প্রজ্ঞা শ্বাসপ্রশ্বাসকে পরিষ্কারভাবে জানতে পারে না।

উদাহরণস্বরূপ, যখন বীর্য তথা প্রচেষ্টা অত্যাধিক হয়, এটি মনকে অশান্ত করে তোলে। এতে করে অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলোও আবার দুর্বল হয়ে পড়ে, তাদের কাজগুলো যথাযথভাবে করতে পারে না। যখন স্মৃতি দুর্বল হয়, আপনি কিছুই করতে পারবেন না, কারণ আপনি তো শ্বাসপ্রশ্বাসেই মনোযোগ দিতে পারছেন না, শ্বাসপ্রশ্বাসটাকে দেখার মতো প্রচেষ্টা বলতে গেলে নেই হয়ে যাবে, আর শ্রদ্ধাটাও উঠে যেতে পারে।

আপনারা এখন শমথ ভাবনা চর্চা করছেন। শমথ ভাবনায় প্রবল ও শক্তিশালী মনোযোগ থাকা ভালো, কিন্তু অতিরিক্ত মনোযোগ অলসতার জন্ম দেয়। অলসতার সাথে সাথে অন্যান্য শক্তিগুলোও খুব দুর্বল হয়ে পড়ে, আর তাদের কাজগুলো ঠিকমতো করতে পারে না।

এই পর্যায়ে প্রজ্ঞা হয় ভোঁতা বা নিকৃষ্ট। এটি কেবল স্বাভাবিক শ্বাসপ্রশ্বাসকেই জানে। তাই যারা শমথ ভাবনা নতুন নতুন চর্চা করছেন, তাদের জন্য শ্বাসপ্রশ্বাসকে পরিষ্কার জানাটাই যথেষ্ট। যখন উদগ্রহ অথবা প্রতিভাগ-নিমিত্ত আসবে, প্রজ্ঞা তখন সেই উদগ্রহ বা প্রতিভাগ-নিমিত্তকে জানতে থাকবে। এর পাশাপাশি অন্যান্য যে সাধারণ জ্ঞান, সেগুলো কোনো কাজের নয়, যেমনটি আপনারা সব সময় আলোচনা করতে পারেন বা

সমালোচনা করতে পারেন। যদি কোনো ভাবনাকারী শ্বাসপ্রশ্বাসের ধ্যানকে খুব বেশি সমালোচনা করে, আমরা বলতে পারি তার প্রজ্ঞা অতিরিক্ত হওয়ার কারণে অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলো দুর্বল, ফলে সেগুলো তাদের কাজ ঠিকমতো করতে পারছে না।

তাই, যদিও এটি এখনো তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়, তার পরেও পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের মাঝে সমতা রাখা একজন নবীন শিক্ষার্থীর জন্য ভালো। কীভাবে ভারসাম্য বজায় রাখতে হয়? আমাদের অবশ্যই প্রবল ও শক্তিশালী স্মৃতি এবং প্রচেষ্টা নিয়ে শ্বাসপ্রশ্বাসকে জানার জন্য চর্চা করতে হবে, দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে শ্বাসপ্রশ্বাসে তীক্ষ্ণ মনোযোগ দিতে হবে।

প্রশ্ন ২.২ : *চতুর্থ ধ্যান লাভের পরে আমরা সোজা পঞ্চস্কন্ধ, তাদের অনিত্য, দুঃখ ও অনিত্য লক্ষণ দেখতে এবং নির্বাণ লাভ করতে যাই না কেন? নির্বাণ লাভের আগে দেহের বত্রিশটি অংশ, কঙ্কাল, সাদা কৃৎস্ন, চার ধাতু, নাম, রূপ, প্রতীত্যসমুৎপাদ-নীতি, বিদর্শন, এত সব লাগে কেন?*

উত্তর ২.২ : পঞ্চস্কন্ধ কী? পঞ্চস্কন্ধ ও নামরূপের মধ্যে পার্থক্য কী? আপনারা কি উত্তরটা জানেন?

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আগে আমি একটু নামরূপ এবং পঞ্চস্কন্ধকে ব্যাখ্যা করতে চাই। বুদ্ধের অভিধর্ম অনুসারে, চারটি পরম বাস্তবতা *(পরমত্থ)* আছে : চিত্ত, চৈতসিক, রূপ ও নির্বাণ।

নির্বাণ লাভ করতে হলে, অর্থাৎ চতুর্থ পরম বাস্তবতাকে দেখতে হলে আমাদের অবশ্যই বাদবাকি তিনটার মধ্যেকার অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম স্বভাবটা দেখতে হবে। ৮৯ প্রকার চিত্ত আছে, ৫২টি চৈতসিক আছে, ২৮ প্রকার রূপ আছে।

৮৯ প্রকার চিত্তকে বলা হয় বিজ্ঞানস্কন্ধ। ৫২টি চৈতসিকের মধ্যে বেদনা হচ্ছে বেদনাস্কন্ধ। সংজ্ঞা হচ্ছে সংজ্ঞাস্কন্ধ। আর বাদ বাকি ৫০টি চৈতসিক হচ্ছে সংস্কারস্কন্ধ। মাঝে মাঝে চিত্ত ও চৈতসিকগুলোকে একত্রে নাম বলা হয়। মাঝে মাঝে তাদের চারটি স্কন্ধরূপে দেখা হয়, যথা : বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ, সংস্কারস্কন্ধ এবং চিত্তস্কন্ধ, যেগুলো একসাথে নামস্কন্ধ নামে পরিচিত। রূপস্কন্ধ হচ্ছে ২৮ ধরনের রূপ। চিত্ত, চৈতসিক ও রূপকে একত্রে বলা হয় নামরূপ। তাদের মাঝেমধ্যে বলা হয় পঞ্চস্কন্ধ, যথা : রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান। তাদের কারণও কিন্তু এই নামরূপ।

বুদ্ধ পঞ্চস্কন্ধ পদ্ধতির মাধ্যমে বিদর্শন চর্চার শিক্ষা দিয়েছেন তিন শ্রেণির লোককে : যাদের তীক্ষ্ণ প্রজ্ঞা আছে, যাদের নামের বিদর্শন জ্ঞান পরিষ্কার নয়

এবং যারা সংক্ষিপ্ত উপায়ে বিদর্শন চর্চা করতে চান তাদের।

এখন আমি দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর দিতে যাব। থেরবাদী মতে, দু ধরনের ধ্যানের বিষয় *(কম্মটঠান)* আছে : *পারিহারিয কম্মটঠান* এবং *সব্বত্থক-কম্মটঠান*। *পারিহারিয় কম্মটঠান* হচ্ছে কোনো এক শ্রেণির ব্যক্তিদের জন্য নির্দিষ্ট ও উপযোগী ধ্যানের বিষয়। তারা সেই বিষয়কে ভিত্তি করে শমথ-বিদর্শন ভাবনা করেন। অন্যদিকে *সব্বত্থক-কম্মটঠান* হচ্ছে সেই সকল ধ্যানের বিষয় যা সকল শ্রেণির ভাবনাকারীরা করতে পারেন। এগুলো হচ্ছে চারটি আরক্ষা ভাবনা; যথা : মৈত্রী-ভাবনা, বুদ্ধানুস্মৃতি, মরণানুস্মৃতি এবং অশুভ-ভাবনা।

অতএব, যেকোনো ভাবনাকারী শ্বাসপ্রশ্বাসের ভাবনাকে তার *পারিহারিয কম্মটঠান* হিসেবে নিতে পারেন। কিন্তু, বিদর্শন চর্চার আগে তাকে অবশ্যই চারটি রক্ষাকারী ভাবনাও করতে হবে। এটা হচ্ছে প্রাচীন পদ্ধতি।

মৈত্রী-ভাবনায় ধ্যান লাভ করার জন্য ভাবনাকারী যদি আগেই সাদা কৃৎস্ন-ভাবনায় চতুর্থ ধ্যান পর্যন্ত যেতে পারেন, তবে ভালো হয়। এর একটা উদাহরণ হচ্ছে করণীয় মৈত্রী সুত্র। এটি হচ্ছে পাঁচশত ভিক্ষুকে নিয়ে, যারা জঙ্গলে গিয়েছিল ভাবনা করতে। তারা দশ কৃৎস্ন-ভাবনা এবং অষ্ট সমাপত্তি লাভ করেছিল, চারটি আরক্ষা ভাবনায় দক্ষ হয়ে উঠেছিল এবং বিদর্শন ধ্যান করেছিল উদয়-ব্যয়জ্ঞান পর্যন্ত। যখন জঙ্গলের স্থানীয় দেবতারা অতিষ্ঠ হয়ে তাদের ভয় দেখাল, তখন তারা বুদ্ধের কাছে ফিরে গেল। বুদ্ধ তাদের ভাবনার বিষয় এবং রক্ষাকারী মন্ত্র হিসেবে করণীয় মৈত্রী সুত্র শিখিয়ে দিলেন। মৈত্রী-ভাবনা করার ১১টি পদ্ধতি আছে, আর এটি হচ্ছে তাদের জন্য যারা মৈত্রী-ভাবনায় ধ্যান লাভ করেছে, এবং বিভিন্ন প্রকারের লোকজনের মধ্যে ভেদাভেদের সীমাটা ভেঙে ফেলেছে। এগারটি পন্থার চর্চা করা হয় মনে মনে এই চিন্তা করে '*সুখিনো ব খেমিনো হোন্তু, সব্বসত্তা ভবন্তু সুখিততত্তা* : সকল প্রাণী সুখী ও নিরাপদ হোক' ইত্যাদি। আর এটাকে অবশ্যই চর্চা করতে হবে তৃতীয় ধ্যান পর্যন্ত। সেই পাঁচশত ভিক্ষুর জন্য এটা খুব সহজ ছিল, কারণ তারা কৃৎস্ন-ভাবনায় সুদক্ষ ছিল।

মৈত্রী-ভাবনা করার জন্য কৃৎস্ন-ভাবনা একটি খুব ভালো ভিত্তি। কীভাবে? অঙ্গুত্তর নিকায়ে বুদ্ধ শিখিয়েছেন যে, চারটি বর্ণ কৃৎস্নের মধ্যে সাদা কৃৎস্নটা শ্রেষ্ঠ। সাদা কৃৎস্ন ভাবনাকারীর মনকে পরিষ্কার ও উজ্জ্বল করে তোলে। স্বচ্ছ ও প্রশান্ত মন হচ্ছে সবচেয়ে উৎকৃষ্ট ও শক্তিশালী। যদি কোনো ভাবনাকারী স্বচ্ছ, কলুষতাহীন মন নিয়ে মৈত্রী-ভাবনা চর্চা করে, সে সাধারণত এক

বসাতেই মৈত্রী-ধ্যান লাভ করে। তাই যদি কেউ চতুর্থ সাদা কৃৎস্ন ধ্যানে প্রবেশ করে, সেখান থেকে বেরিয়ে এসে মৈত্রী-ভাবনা করে, সফল হওয়া তখন খুব সহজ হয়।

সাদা কৃৎস্নের চতুর্থ ধ্যান লাভ করতে হলে ভাবনাকারীর প্রথমে কঙ্কাল ভাবনা চর্চা করা উচিত অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিকভাবে, কারণ এটা সাদা কৃৎস্ন-ভাবনার কাজটাকে খুব সহজ করে দেয়। অতএব, চতুর্থ আনাপান ধ্যানের পরে আমরা সাধারণত ভাবনাকারীদের দেহের বত্রিশটি অংশের ভাবনা শেখাই, কঙ্কাল ভাবনা এবং সাদা কৃৎস্ন-ভাবনা শেখাই। আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি, বেশির ভাগ ভাবনাকারী বলে যে, চতুর্থ আনাপান ধ্যান থেকে চতুর্থ সাদা কৃৎস্ন-ধ্যান উত্তম, কারণ এটি মনকে আরও পরিষ্কার, আরও উজ্জ্বল এবং আরও শান্ত করে তোলে, যা অন্যান্য ভাবনার বিষয়কে চর্চা করতেও দারুণ সাহায্য করে। তাই আমরা সাধারণত মৈত্রী-ভাবনার আগে সাদা কৃৎস্ন-ভাবনা শিখিয়ে থাকি।

এখানে আমি নবীনদের আরও একটা সাধারণ সমস্যা তুলে ধরতে চাই। আপনারা হয়তো মৈত্রী-ভাবনা চর্চা করেছেন আগে। আপনারা কি মৈত্রী ধ্যান লাভ করেছেন? বাস্তবে, যদি কোনো ভাবনাকারী তার একই লিঙ্গের কারোর প্রতি মৈত্রীর বার্তা পাঠাতে চায়, তার প্রথমে সেই ব্যক্তির হাসিমাখা মুখকে ভাবনার বিষয় করা উচিত, আর তারপরে তার প্রতি মৈত্রীর চিন্তা করা উচিত এভাবে : 'এই ভালো লোকটি মানসিক দুঃখ হতে মুক্ত হোক' ইত্যাদি। নবীন শিক্ষার্থীর মন থেকে সেই ভালো লোকটির হাসিমাখা মুখ শীঘ্রই হারিয়ে যায়। সে আর মৈত্রী-ভাবনা চালিয়ে যেতে পারে না। কারণ, তার ভাবনার বিষয়টি তো হারিয়ে গেছে। আর তাই সে মৈত্রী-ধ্যানও পায় না, কোনো কিছুই পায় না। যদি সে চতুর্থ সাদা কৃৎস্ন-ধ্যান ব্যবহার করে, তখন ব্যাপারটা ভিন্ন। সে ধ্যান থেকে বেরিয়ে এসে যখন সেই হাসিমাখা মুখের উপর মৈত্রী-ভাবনা করে, তখন সেই হাসিমাখা মুখ কিন্তু মিলিয়ে যায় না। কারণ, আগের ধ্যানের মনোযোগের শক্তি এখনো রয়ে গেছে তার। সে সেই ছবিটাতে গভীরভাবে মনোযোগ দিতে পারে, আর সেই এক বসাতেই তৃতীয় ধ্যান পর্যন্ত লাভ করতে পারে। যদি সে ক্রমান্বয়ে চর্চা করতে করতে বিভিন্ন ধরনের লোকের মধ্যেকার সীমাটা ভাঙতে সক্ষম হয়, তাহলে সে এমনকি করণীয় মৈত্রী সুত্রে বর্ণিত এগারটি পদ্ধতির চর্চা করতে পারে। আর সেই সাথে *পটিসম্ভিদামগ্গ* নামক পালি গ্রন্থে বর্ণিত পাঁচশত আটাশ প্রকারে মৈত্রী ছড়িয়ে দেওয়াটাও চর্চা করতে পারে। এ কারণেই আমরা মৈত্রী-ভাবনার আগে সাদা কৃৎস্ন-ভাবনাটা

শেখাই।

আপনারা হয়তো বুদ্ধগুণ-ভাবনা *(বুদ্ধানুস্মৃতি)* করেছেন। আপনারা কি উপচার ধ্যান লাভ করতে পেরেছেন? মৈত্রী-ভাবনায় সফল ব্যক্তিরা বুদ্ধগুণের ভাবনায় এক বসাতেই উপচার ধ্যান লাভ করতে পারে। কারণ, তাদের আগের ধ্যানের মনোযোগ তাদের সাহায্য করে। বিরূপতা-ভাবনাও *(অসুভ)* খুব সহজ হয়ে যায়। যদি ভাবনাকারী বিরূপতা-ভাবনায় প্রথম ধ্যান পর্যন্ত চর্চা করেন, আর তার পরে মৃত্যু-ভাবনা *(মরণানুস্মৃতি)* করেন, তাহলে তিনি এক বসাতেই সাফল্য পেতে সক্ষম হবেন।

এ কারণেই আমরা চারটি আরক্ষা ভাবনার আগে কৃৎস্ন-ভাবনা শেখাই। তবে, যদি কোনো ভাবনাকারী সরাসরি বিদর্শনে যেতে চায়, চারটি আরক্ষা ভাবনা বাদ দিয়ে, সে তা করতে পারে। তাতে কোনো সমস্যা নেই।

প্রশ্ন ২.৩ : *নামরূপকে দেখার পরে কেন প্রত্যেককে প্রতীত্যসমুৎপাদ-নীতির প্রথম এবং পঞ্চম পদ্ধতির চর্চা করতে হয়?*

উত্তর ২.৩ : থেরবাদী মতে, বিশুদ্ধির সাতটি ধাপ আছে। আমি এখানে প্রথম পাঁচটি ব্যাখ্যা করব। এগুলো হচ্ছে :

১. **শীলবিশুদ্ধি**।

২. **চিত্তবিশুদ্ধি**। এটি হচ্ছে উপচার ধ্যান এবং অষ্ট সমাপত্তি লাভ করা।

৩. **দৃষ্টিবিশুদ্ধি**। এটি হচ্ছে নামরূপ পরিচ্ছেদ জ্ঞান।

৪. **কঙ্খা-উত্তরণ-বিশুদ্ধি বা সন্দেহ থেকে বিশুদ্ধি**। এটি হচ্ছে প্রত্যয়-পরিগ্রহ-জ্ঞান। অন্য কথায়, প্রতীত্যসমুৎপাদ-নীতিকে দেখা।

৫. **মার্গ-অমার্গ-জ্ঞানদর্শন-বিশুদ্ধি**। এটি হচ্ছে সংমর্শন জ্ঞান এবং উদয়-বিলয় জ্ঞান, যা থেকে বিদর্শনের শুরু।

তো, বিদর্শনের শুরুর আগে চারটি বিশুদ্ধি আছে। কেন? বিদর্শন হচ্ছে অন্তর্দৃষ্টি। নামরূপের অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম স্বভাব এবং তাদের কারণগুলো বুঝার, উপলব্ধি করার মতো অন্তর্দৃষ্টি। নামরূপকে জানার আগে আমরা কীভাবে বুঝব যে তারা অনিত্য, দুঃখময় এবং অনাত্ম? কীভাবে আমরা বিদর্শনের চর্চা করব? কাজেই, কেবল পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নামরূপ এবং তাদের কারণগুলো উপলব্ধির পরে আমরা বিদর্শন ভাবনা করতে পারব।

নামরূপ এবং তাদের কারণগুলোকে বলা হয় সৃষ্টি বা সংস্কার। এগুলো উৎপন্ন হয়েই বিলীন হয়ে যায়; এজন্যই তারা অনিত্য। তারা সর্বদা উৎপত্তি ও বিলয়ের অধীন; এজন্যই তারা দুঃখময়। তাদের আত্ম বা নিজ *(অত্ত)* বলতে কিছু নেই, স্থিতিশীল এবং ধ্বংস হয় না এমন কোনো কিছু নেই, এ কারণেই

তারা অনাত্ম।

এভাবে অনিত্য, দুঃখময় ও অনাত্মকে বুঝাটা হচ্ছে সত্যিকারের বিদর্শন। তাই বিদর্শনের আগে আমরা ভাবনাকারীদের শেখাই নাম, রূপ এবং প্রতীত্যসমুৎপাদ-নীতি। অর্থকথায় এভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, '*অনিচ্চন্তি পঞ্চক্খন্ধা*'। তার মানে হচ্ছে 'পঞ্চস্কন্ধ অনিত্য'। অন্য কথায়, এই পঞ্চস্কন্ধ হচ্ছে নামরূপ এবং তাদের কারণগুলো। অতএব, সত্যিকারের বিদর্শন নির্ভর করে পঞ্চস্কন্ধ, আর তাদের কারণ এবং ফলের উপরে।

বুদ্ধ তাঁর শ্রোতাদের স্বভাব অনুসারে প্রতীত্যসমুৎপাদ-নীতি বুঝার জন্য চারটি পদ্ধতি শিখিয়েছেন। *পটিসম্ভিদামগ্গ* গ্রন্থে আরেকটা পদ্ধতি আছে। সব মিলিয়ে পাঁচটি পদ্ধতি রয়েছে। প্রথম পদ্ধতি হচ্ছে প্রতীত্যসমুৎপাদের নীতিকে প্রথম থেকে একাদিক্রমে বুঝা : '*অবিজ্জাপচ্চয়া সঙ্খারা, সঙ্খারপচ্চয়াবিঞ্ঞাণং, বিঞ্ঞাণপচ্চয়া নামরূপং...* ইত্যাদি'। এই প্রথম পদ্ধতিটা থেরবাদী বৌদ্ধধর্মে খুব জনপ্রিয়, কিন্তু যাদের অভিধর্ম জ্ঞান নেই, তাদের কাছে এটার চর্চা করা খুব কঠিন হতে পারে। তবে ভালো অভিধর্ম জ্ঞান আছে, এমন ভাবনাকারীরাও এতে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন।

পঞ্চম পদ্ধতিটি সারিপুত্র ভন্তের শেখানো। এটি পালি গ্রন্থ *পটিসম্ভিদামগ্গে* লিখে রাখা হয়েছে, যা নবীনদের জন্য সহজ। এতে প্রথমে বুঝতে হয় যে অতীতের পাঁচটি কারণ বর্তমানের পাঁচটি ফলকে উৎপন্ন করেছে, আর বর্তমানের পাঁচটি কারণ ভবিষ্যতের পাঁচটি ফলকে উৎপন্ন করবে। এটিই পঞ্চম পদ্ধতির মূলনীতি। যদি আপনি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে এটিকে জানতে চান, তাহলে আপনার এই ধাপ পর্যন্ত চর্চা করা উচিত।

পঞ্চম পদ্ধতিটি যথাযথভাবে চর্চা করার পরে প্রথম পদ্ধতিটি চর্চা করতে বেশি সমস্যা হবে না। এ কারণেই আমরা প্রথম পদ্ধতির আগে পঞ্চম পদ্ধতি শেখাই। যারা সময় দিতে পারে, এবং আরও অনেক দূর চর্চা করতে চায়, তাদের আমরা পাঁচটি পদ্ধতিই শেখাই। কিন্তু বুদ্ধ যদিও তার শ্রোতাদের চরিত্র অনুসারে প্রতীত্যসমুৎপাদের নীতি শিখিয়েছেন চারটি পদ্ধতিতে, সেখানে একটা পদ্ধতিই নির্বাণ লাভের জন্য যথেষ্ট। যেহেতু প্রথম পদ্ধতিটি থেরবাদী বৌদ্ধধর্মে জনপ্রিয়, তাই আমরা পঞ্চম এবং প্রথম, উভয় পদ্ধতিই শেখাই।

একদিন আনন্দ ভন্তে চারটি পদ্ধতির সবগুলো দিয়ে প্রতীত্যসমুৎপাদ-নীতি চর্চা করে সন্ধ্যায় বুদ্ধের কাছে হাজির হয়ে বললেন, 'ভন্তে, যদিও প্রতীত্যসমুৎপাদ-নীতি খুব গভীর, আমার কাছে এটি সোজা।' বুদ্ধ উত্তর দিলেন : '*এতস্স চানন্দ, ধম্মস্স অননুবোধা, অপ্পটিবেধা এবময়ং পজাতন্তাকুলকজাতা, কুলাগণ্ঠিকজাতা, মুঞ্জপব্বজভূতা অপায়ং দুগ্গতিং বিনিপতং সংসারং নাতিবত্ততি।*'

তার মানে হচ্ছে যে, প্রতীত্যসমুৎপাদ-নীতি ব্যতীত, *অনুবোধ-ঞাণ* এবং *পটিবেধ-ঞাণ* দিয়ে, কোনো ব্যক্তি সংসারচক্র থেকে বেরোতে পারে না, চারটি অপায় থেকে পালাতে পারে না।

অনুবোধ-ঞাণ হচ্ছে নামরূপ বিশ্লেষণের জ্ঞান *(নামরূপ-পরিচ্ছেদ-ঞাণ)* এবং কারণ ও শর্তাবলী উপলব্ধির জ্ঞান *(পচ্চয়-পরিগ্গহ-ঞাণ)*। *পটিবেধ-ঞাণ* হচ্ছে সকল বিদর্শন জ্ঞান *(বিপস্সনা-ঞাণ)*। কাজেই, প্রতীত্যসমুৎপাদ-নীতি বাদ দিয়ে কেবল *অনুবোধ-ঞাণ* এবং *পটিবেধ-ঞাণ* দিয়ে একজন নির্বাণ লাভ করতে পারে না। এর সাথে সাথে অর্থকথা এটাও বলে যে, প্রতীত্যসমুৎপাদ-নীতি না জানলে কেউই জন্মচক্র থেকে পালাতে পারে না, স্বপ্নেও নয়। ❑

[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[দেশনা ৩]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]

ব্রহ্মবিহার ভাবনা ও আরক্ষা ভাবনা

আজকে আমি ব্যাখ্যা করতে যাব কীভাবে চারটি ব্রহ্মবিহার ভাবনা এবং চারটি আরক্ষা ভাবনা করতে হয়। চারটি ব্রহ্মবিহার ভাবনা হচ্ছে : মৈত্রী, করুণা, মুদিতা (খুশিভাব) ও উপেক্ষা-ভাবনা।

মৈত্রী-ভাবনা

অপ্রমেয় মৈত্রী-ভাবনা করার জন্য আপনার প্রথমে জানা উচিত যে এটি বিপরীত লিঙ্গের কারো প্রতি করা উচিত নয় *(লিঙ্গবিসভাগ)*, অথবা কোনো মৃত ব্যক্তির প্রতি করা উচিত নয় *(কালকতপুগ্গল)*।

মৈত্রী-ভাবনার বিষয়বস্তু হিসেবে কোনো বিপরীত লিঙ্গের ব্যক্তিকে নেওয়া উচিত নয়। কারণ, এতে খুব সম্ভব তার প্রতি আপনার যৌন কামনাই জেগে উঠবে। তবে ধ্যান লাভের পরে দলগতভাবে বিপরীত লিঙ্গের ব্যক্তিদের প্রতি মৈত্রী দেওয়া যায়, উদাহরণস্বরূপ, 'সকল মেয়েরা সুখী হোক।'

মৃত ব্যক্তির প্রতি মৈত্রী দেওয়া কখনোই উচিত নয়, কেননা মৃত ব্যক্তিকে ভাবনার বিষয়বস্তু করে আপনি কখনোই মৈত্রী-ধ্যান লাভ করতে পারবেন না।

যে-সমস্ত ব্যক্তিদের প্রতি আপনার মৈত্রী প্রসারিত করা উচিত, তারা হচ্ছে :

১. আপনি নিজে *(অত্ত)*,

২. কোনো এক ব্যক্তি, যাকে আপনি পছন্দ করেন এবং সম্মান করেন *(পিয়)*,

৩. কোনো এক ব্যক্তি, যার প্রতি আপনি নিস্পৃহ *(মজ্ঝত্ত)*,

৪. কোনো এক শত্রু *(বেরী)*।

যদিও শুরুতে আপনার মৈত্রী চিন্তা করা উচিত কেবল নিজের প্রতি, আর যাকে আপনি পছন্দ করেন ও সম্মান করেন তার প্রতি। তার মানে হচ্ছে,

ভাবনার শুরুতে আপনার নিম্নোক্ত ব্যক্তিদের প্রতি মৈত্রীচিন্তা করা উচিত নয় : যে ব্যক্তিকে আপনি পছন্দ করেন না *(অপ্পিয়পুগ্গল)*, যে ব্যক্তি আপনার খুব প্রিয় *(অতিপ্পিয়সহায়ক)*, যে ব্যক্তির প্রতি আপনি নিস্পৃহ *(মজ্ঝত্তপুগ্গল)*, এবং যে ব্যক্তিকে আপনি ঘৃণা করেন *(বেরীপুগ্গল)*।

যে ব্যক্তিকে আপনি পছন্দ করেন না, সে হচ্ছে এমন একজন ব্যক্তি, যে আপনার অথবা আপনি যাদের পছন্দ করেন তাদের উপকার হয়, এমন কোনো কাজ করে না। যে ব্যক্তিকে আপনি ঘৃণা করেন, সে হচ্ছে এমন একজন ব্যক্তি, যে আপনার অথবা আপনি যাদের পছন্দ করেন তাদের ক্ষতি হয় এমন কাজ করে। শুরুতে তাদের প্রতি মৈত্রী চিন্তা করাটা খুব কঠিন, কারণ ক্রোধ উৎপন্ন হতে পারে। যে ব্যক্তির প্রতি আপনি নিস্পৃহ, শুরুর দিকে তার প্রতি মৈত্রী চিন্তা করাটাও কঠিন হয়। আপনার খুব প্রিয় কোনো ব্যক্তিকে নিয়ে মৈত্রী-ভাবনা করলে, আপনি তার সাথে খুব বেশি জড়িয়ে যেতে পারেন, তার জন্য উদ্বেগ ও কষ্ট পেতে পারেন, এমনকি তার একটা কিছু হয়েছে শুনলে কান্নাও আসতে পারে আপনার। তাই ভাবনার শুরুর দিকে এই চারজনের প্রতি মনোযোগ দেওয়া উচিত নয়। পরে, একবার যদি মৈত্রী-ধ্যান লাভ করেন, তখন আপনি তাদের প্রতি মৈত্রীচিন্তা করতে পারবেন।

নিজেকে ভাবনার বিষয়বস্তু করে শত বছর ধরে মৈত্রী-ভাবনা করলেও আপনি ধ্যান লাভ করতে পারবেন না। এমনকি উপচার ধ্যানও নয়। তাহলে নিজেকে দিয়ে মৈত্রী-ভাবনা শুরু করতে যাওয়া কেন? এর কারণ হচ্ছে যখন আপনি নিজের প্রতি মৈত্রীচিন্তা করবেন, আপনি অন্যদের সাথে সাথে নিজেকেও চিনতে পারবেন। আপনি দেখবেন যে আপনি যেমন সুখী হতে চান, কষ্ট পেতে চান না, অনেক বছর বাঁচতে চান, এবং মরতে চান না, ঠিক তেমনি অন্যান্যরাও সবাই সুখী হতে চায়, কষ্ট পেতে চায় না, অনেক বছর বাঁচতে চায় এবং মরতে চায় না।

এভাবে আপনি এমন একটি মন গড়ে তুলতে সক্ষম হবেন, যে মন অন্যান্য প্রাণীদের সুখ এবং সমৃদ্ধি কামনা করে। বুদ্ধের ভাষায় :

‘সব্বা দিসা অনুপরিগম্ম চেতসা,
নেবজ্ঝগা পিয়তরমত্তনা ক্বচি।
এবং পিয়ো পুথু অত্তা পরেসং,
তস্মা ন হিংসে পরমত্তকামো।’ (সংযুত্তনিকায়ো ১.৭৫)

‘মন দিয়ে সর্বদিকে খুঁজেও সে কাউকে পায় না যাকে সে নিজের চেয়েও বেশি ভালোবাসে। ঠিক একইভাবে, চারদিকের সকল প্রাণীরাও অন্যদের চেয়ে

নিজেদেরই বেশি ভালোবাসে। অতএব, যে নিজের কল্যাণ চায়, তার অন্যদের ক্ষতি করা উচিত নয়।'

তাই, এই অভিন্নতা বুঝতে গিয়ে এবং আপনার মনকে কোমল ও দয়ালু করতে গিয়ে আপনাকে প্রথমে নিজের প্রতি মৈত্রীচিন্তা করতে হবে নিচের কথাগুলোর মতো :

১. আমি যেন বিপদ থেকে মুক্ত থাকি *(অহং অবেরো হোমি)*,

২. আমি যেন মানসিক কষ্ট থেকে মুক্ত থাকি *(অব্যাপজ্জো হোমি)*,

৩. আমি যেন দৈহিক কষ্ট থেকে মুক্ত থাকি *(অনীঘো হোমি)*,

৪. আমি যেন সুস্থ ও সুখী হই *(সুখী অত্তানং পরিহরামি)*।

যদি কারোর মন কোমল, দয়ালু, সমব্যথী হয় এবং অন্যদের প্রতি তার সহমর্মিতা থাকে, তাহলে আরেকজনের প্রতি মৈত্রীচিন্তা গড়ে তোলাটা তার জন্য কোনো কঠিন ব্যাপার হবে না। তাই আপনার নিজের প্রতি মৈত্রীভাবটা আগে প্রবল ও শক্তিশালী করে গড়ে তোলাটা গুরুত্বপূর্ণ। যখন আপনার মন কোমল, দয়ালু, সমব্যথী হবে এবং অন্যদের প্রতি সহমর্মিতাবোধ গড়ে উঠবে, তখন আপনি অন্যদের প্রতি মৈত্রীচিন্তা করা শুরু করতে পারেন।

আপনার পছন্দের এবং সম্মানিত ব্যক্তির প্রতি মৈত্রীভাব

যদি আপনি শ্বাসপ্রশ্বাসের ভাবনায় অথবা সাদা কৃৎস্ন-ভাবনায় চতুর্থ ধ্যান অর্জন করে থাকেন, তাহলে আবার তাতে মনোনিবেশ করা উচিত আপনার যতক্ষণ না উজ্জ্বল, দীপ্তিমান আলো আবির্ভূত হয়। বিশেষ করে সাদা কৃৎস্নের চতুর্থ ধ্যানের আলোয় মৈত্রী-ভাবনা করা সত্যিই খুব সহজ। কারণ, চতুর্থ ধ্যানের গভীর মনোযোগের ফলে মনটা এমনিতেই লোভ, ক্রোধ, মোহ ও অন্যান্য কলুষতাগুলো থেকে মুক্ত থাকে। চতুর্থ ধ্যান থেকে বেরিয়ে এসে মনটা থাকে নমনীয়, কাজের যোগ্য, বিশুদ্ধ, উজ্জ্বল ও দীপ্তিমান। আর এ কারণেই, খুব অল্প সময়ের মধ্যে আপনি শক্তিশালী ও নিখুঁত মৈত্রীভাব গঠন করতে সমর্থ হবেন।

তাই, শক্তিশালী ও উজ্জ্বল আলোর সাহায্যে আপনি মনটাকে নিজের লিঙ্গের কোনো ব্যক্তির প্রতি ধাবিত করুন যাকে আপনি পছন্দ ও সম্মান করেন : হতে পারে সে আপনার গুরু বা শিক্ষক অথবা আপনার সাথের কোনো ভাবনাকারী। আপনি দেখবেন যে আলো ছড়িয়ে আছে আপনার চারদিক জুড়ে, সর্বদিকে। আপনি যাকেই পছন্দ করবেন, সেই ব্যক্তিকে সেই আলোয় দেখতে পাবেন। আপনি তার বসা বা দাঁড়ানো অবস্থার একটা প্রতিমূর্তি নিন।

যেটাকে আপনি সবচেয়ে পছন্দ করেন, তার যে ভঙ্গিটা আপনাকে সবচেয়ে সুখী করে তোলে, সেই ভঙ্গির প্রতিকৃতি বেছে নিন। যখন আপনি তাকে সবচেয়ে সুখী অবস্থায় দেখেছেন তখনকার কথা মনে করে দেখুন, আর সেই সুখী মুহূর্তের প্রতিকৃতি বেছে নিন। সেই প্রতিকৃতিকে আপনার সামনে এক গজ দূরে আনুন। যখন আপনি এই প্রতিকৃতিকে আপনার সামনে পরিষ্কারভাবে দেখতে পাবেন, তখন নিচের কথাগুলোর মাধ্যমে মৈত্রীচিন্তা গড়ে তুলুন :

এই ভালো ব্যক্তিটি বিপদ থেকে মুক্ত থাকুক।
(অয়ং সপ্পুরিসো অবেরো হোতু)।
এই ভালো ব্যক্তিটি মানসিক কষ্ট থেকে মুক্ত থাকুক।
(অয়ং সপ্পুরিসো অব্যাপজ্জো হোতু)।
এই ভালো ব্যক্তিটি দৈহিক কষ্ট থেকে মুক্ত থাকুক।
(অয়ং সপ্পুরিসো অনীঘো হোতু)।
এই ভালো ব্যক্তিটি সুস্থ ও সুখী থাকুক।
(অয়ং সপ্পুরিসো সুখী অত্তানং পরিহরন্তু)।

সেই ব্যক্তির প্রতি এই কথাগুলোর মাধ্যমে মৈত্রীভাব ছড়িয়ে দিন তিন বা চারবার। এরপর এই কথাগুলোর মধ্য থেকে আপনার খুব পছন্দের কোনো একটি কথাকে বেছে নিন। উদাহরণস্বরূপ, এই কথাটা ধরা যাক, 'এই ভালো ব্যক্তিটি বিপদ থেকে মুক্ত থাকুক'। এবার সেই ব্যক্তির নতুন একটি প্রতিমূর্তি আনুন। এই উদাহরণের ক্ষেত্রে সেটি হবে বিপদ থেকে মুক্ত আছে এমন কোনো প্রতিমূর্তি। এবার সেই প্রতিমূর্তিকে লক্ষ করে সেই মৈত্রীভাবটাকে ছড়িয়ে দিন আপনার বেছে নেওয়া কথাটি দিয়ে। যেমন এই উদাহরণের ক্ষেত্রে সেটা হবে, 'এই ভালো ব্যক্তিটি বিপদ থেকে মুক্ত থাকুক, এই ভালো ব্যক্তিটি বিপদ থেকে মুক্ত থাকুক'। বার বার এভাবে মৈত্রীভাব ছড়িয়ে দিন যতক্ষণ না মন শান্ত ও বিষয়বস্তুতে সুস্থিত না হয়, যতক্ষণ না আপনি ধ্যানের অঙ্গগুলোকে বুঝতে না পারেন, ততক্ষণ পর্যন্ত। এরপর, চর্চা চালিয়ে যেতে থাকুন যতক্ষণ না দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ধ্যানে পৌঁছাতে পারেন।

উপর্যুক্ত চারটি কথার জন্য আপনার পছন্দমতো একটি করে প্রতিকৃতি থাকা উচিত। অর্থাৎ যখন ভাবছেন, 'এই ভালো ব্যক্তিটি বিপদ থেকে মুক্ত থাকুক' তখন আপনার সেই ব্যক্তির বিপদ থেকে মুক্ত একটি প্রতিকৃতি মনের মধ্যে আনা উচিত। যখন ভাবছেন 'এই ভালো ব্যক্তিটি মানসিক কষ্ট থেকে মুক্ত থাকুক' তখন সেই ব্যক্তির মানসিক কষ্ট থেকে মুক্ত কোনো প্রতিকৃতি

আপনার মনের মধ্যে আনা উচিত। এভাবে অন্যান্য কথাগুলোও ধরে নিতে হবে। এভাবে আপনার তিনটি ধ্যান অর্জন করা উচিত। আর প্রত্যেকটি ধ্যানের ক্ষেত্রে পাঁচটি দক্ষতা *(বসীভাব)* আয়ত্ব করতে ভুলবেন না যেন।

যখন আপনার পছন্দের এবং সম্মানিত ব্যক্তিকে নিয়ে সফল হবেন, তখন একই লিঙ্গের আরেকজন ব্যক্তিকে নিন যাকেও আপনি পছন্দ করেন এবং সম্মান করেন। এভাবে এই শ্রেণির দশজন ব্যক্তিকে বেছে নিন, আর মৈত্রীভাব গড়ে তুলুন তাদের প্রতি একজন একজন করে, একইভাবে তৃতীয় ধ্যান পর্যন্ত।

এরপর আপনার সমজাতীয় লিঙ্গের দশজন ব্যক্তিকে নিন, যাদের প্রতি আপনি নিস্পৃহ, আর তাদের প্রতি একইভাবে তৃতীয় ধ্যান পর্যন্ত মৈত্রীভাব গড়ে তুলুন।

এখন আপনি মৈত্রী-ভাবনায় সুদক্ষ হয়ে উঠেছেন, আর আপনার সমজাতীয় লিঙ্গের দশজন ব্যক্তির প্রতি মৈত্রীভাব ছড়িয়ে দিতে পারেন যাদের আপনি ঘৃণা করেন। আপনি যদি বোধিসত্ত্বের মতো কোনো মহৎপ্রাণ লোক হন, যেমন বোধিসত্ত্ব যখন মহাকপি নামের এক বানর রাজা ছিলেন, সেই সময় তাকে ক্ষতি করলেও তিনি সেই ব্যক্তিকে ঘৃণা করতেন না, এবং আপনি যদি সত্যি সত্যিই কাউকে ঘৃণাও করেন না, অবজ্ঞাও করেন না, তাহলে এই শ্রেণিতে ফেলার জন্য কাউকে খোঁজার দরকার নেই। যাদের ঘৃণা বা অবজ্ঞা করার মতো লোক আছে, কেবল তারাই এই শ্রেণির লোকজনের প্রতি মৈত্রীভাব গড়ে তুলবেন।

এভাবে মৈত্রীভাবের চর্চা করে, প্রত্যেক শ্রেণির লোকজনের ক্ষেত্রে তৃতীয় ধ্যান পর্যন্ত ভাবনা করে, এক শ্রেণি থেকে আরেক শ্রেণিতে অগ্রসর হয়ে, সবচেয়ে সহজ থেকে সবচেয়ে কঠিন শ্রেণিতে যাওয়ার মাধ্যমে আপনার মনকে ক্রমান্বয়ে আরও কোমল, দয়ালু এবং নমনীয় করুন, যতক্ষণ না আপনি ইচ্ছেমতো ধ্যান লাভ করতে পারেন এই চার শ্রেণির যে কোনো শ্রেণির লোকজনকে দিয়ে, যাদের আপনি সম্মান করেন, যারা আপনার প্রিয়, যাদের প্রতি আপনি নিস্পৃহ, আর যাদের আপনি ঘৃণা করেন।

ভেদাভেদের সীমা ভেঙে ফেলা *(সীমাসম্ভেদ)*

এভাবে মৈত্রী-ভাবনা চর্চা করতে করতে আপনি দেখবেন যে আপনি যাদের পছন্দ ও সম্মান করেন, আর যারা আপনার খুব প্রিয়, এই উভয় শ্রেণির লোকদের প্রতি আপনার মৈত্রীভাব সমান হয়ে গেছে, এখন আপনি তাদের

একই শ্রেণিতে ফেলতে পারেন। তখন আপনার কাছে থাকবে কেবল চার শ্রেণির লোক :

১. আপনি নিজে,
২. যাদের আপনি পছন্দ করেন,
৩. যাদের প্রতি আপনি নিস্পৃহ,
৪. যাদের আপনি ঘৃণা করেন।

এই চার শ্রেণির লোকদের প্রতি আপনার মৈত্রীভাবের চর্চা করে যেতে হবে, যতক্ষণ না সমতা না আসে এবং কোনো বিভেদ বা বৈষম্যহীন হয়। যদিও নিজেকে ভাবনার বিষয়বস্তু করে আপনি মৈত্রীধ্যান পাবেন না, তবুও এই চার শ্রেণির মধ্যেকার সীমা ভেঙে ফেলার জন্য আপনার নিজেকেও এতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

এটা করতে গিয়ে আপনাকে প্রথমে শ্বাসপ্রশ্বাস বা সাদা কৃৎস্নের চতুর্থ ধ্যানে প্রবেশ করতে হবে। শক্তিশালী ও উজ্জ্বল আলোয় এবার আপনি এক মিনিট বা নিদেনপক্ষে কয়েক সেকেন্ড হলেও নিজের প্রতি মৈত্রী দিন। এর পরে যাকে আপনি পছন্দ করেন, যার প্রতি আপনি নিস্পৃহ আর যাকে আপনি ঘৃণা করেন, এভাবে এক এক করে প্রত্যেককে নিয়ে মৈত্রী-ভাবনা করুন তৃতীয় ধ্যান পর্যন্ত। এবার আবার নিজেকে মৈত্রী দিন অল্প সময়ের জন্য, কিন্তু অন্য তিন শ্রেণির জন্য এবার অবশ্যই ভিন্ন ব্যক্তিদের নিতে হবে। প্রত্যেককে উপর্যুক্ত চারটি কথার প্রত্যেকটি কথা দিয়ে, যেমন : 'এই ভালো ব্যক্তিটি বিপদ থেকে মুক্ত থাকুক' ইত্যাদি দিয়ে একেবারে তৃতীয় ধ্যান পর্যন্ত মৈত্রী দিতে ভুলবেন না যেন।

এভাবে প্রত্যেকবারে আপনার এই তিন শ্রেণির লোকদের বদলে নেওয়া উচিত : যাকে আপনি পছন্দ করেন, যার প্রতি আপনি নিস্পৃহ, আর যাকে আপনি ঘৃণা করেন। এভাবে বার বার করুন। ভিন্ন ভিন্ন চারজনের দল নিয়ে অনেকবার চর্চা করুন যাতে করে আপনার মন বাধাহীনভাবে মৈত্রীতে প্লাবিত হয়, বিশেষ কোনো পার্থক্য ছাড়াই। যখন আপনি বাছবিচার না করেই যে কারো প্রতি মৈত্রী-ধ্যান উৎপন্ন করতে পারবেন, তখনই আপনি সেই ভেদাভেদের 'সীমা ভাঙতে' *(সীমাসম্ভেদ)* সক্ষম হবেন।

বিভিন্ন শ্রেণির মাঝে সীমাটা ভেঙে ফেলে এখন আপনি মৈত্রী-ভাবনাকে আরও অনেক দূর প্রসারিত করতে সক্ষম হবেন সেই পদ্ধতি দ্বারা, যে পদ্ধতিটি সারিপুত্র ভন্তে শিখিয়েছেন, আর *পটিসম্ভিদামগ্গে* যেটিকে লিখে রাখা হয়েছে।

বাইশটি শ্রেণি

পটিসম্ভিদামগ্গের পদ্ধতিতে বাইশটি শ্রেণিতে মৈত্রী বিস্তৃত করার কথা আছে : পাঁচটি অনির্দিষ্ট শ্রেণি *(অনোধিসো-ফরণা)*, সাতটি নির্দিষ্ট শ্রেণি *(ওধিসো-ফরণা)*, এবং দশটি দিকনির্দেশক শ্রেণি *(দিসা-ফরণা)*।

পাঁচটি অনির্দিষ্ট শ্রেণি হচ্ছে :

১. সকল জীব *(সব্বে সত্তা)*
২. সকল প্রাণী *(সব্বে পাণা)*
৩. সকল সৃষ্টি *(সব্বে ভূতা)*
৪. সকল লোকজন *(সব্বে পুগ্গলা)*
৫. সকল ব্যক্তি *(সব্বে অত্তভাবপরিয়াপন্না)*

সাতটি নির্দিষ্ট শ্রেণি হচ্ছে :

১. সকল নারী *(সব্বে ইত্থিয়ো)*
২. সকল পুরুষ *(সব্বে পুরিসা)*
৩. সকল আর্য *(সব্বে অরিয়া)*
৪. সকল অনার্য *(সব্বে অনরিয়া)*
৫. সকল দেবতা *(সব্বে দেবা)*
৬. সকল মানুষ *(সব্বে মনুস্সা)*
৭. সকল ইতর প্রাণী *(সব্বে বিনিপাতিকা)*

দশটি দিকনির্দেশক শ্রেণি হচ্ছে :

১. পূর্ব দিকে *(পুরত্থিমায় দিসায়)*
২. পশ্চিম দিকে *(পচ্ছিমায় দিসায়)*
৩. উত্তর দিকে *(উত্তরায় দিসায়)*
৪. দক্ষিণ দিকে *(দকিখণায় দিসায়)*
৫. দক্ষিণ-পূর্ব দিকে *(পূরত্থিমায় অনুদিসায়)*
৬. উত্তর-পশ্চিম দিকে *(পচ্ছিমায় অনুদিসায়)*
৭. উত্তর-পূর্ব দিকে *(উত্তরায় অনুদিসায়)*
৮. দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে *(দকিখণায় অনুদিসায়)*
৯. নিচে *(হেট্ঠিমায় দিসায়)*
১০. উপরে *(উপরিমায় দিসায়)*

অনির্দিষ্ট এবং নির্দিষ্ট শ্রেণি

এই পদ্ধতিতে মৈত্রী-ভাবনা করতে হলে আগের মতোই সাদা কৃৎস্নের চতুর্থ ধ্যানে প্রবেশ করা উচিত। এরপর মৈত্রী বিস্তার করা উচিত নিজের প্রতি, যাকে আপনি সম্মান করেন বা প্রিয় ব্যক্তি, যার প্রতি আপনি নিস্পৃহ, এবং যাকে আপনি ঘৃণা করেন, যতক্ষণ না আপনার আর অন্যদের মধ্যে কোনো সীমানা থাকে। এরপর সেই উজ্জ্বল ও দীপ্তিমান আলোতে আপনার চারপাশে যতদূর সম্ভব, আপনার বিল্ডিং বা বিহারের আশেপাশে যত জীব আছে সবাইকে দেখুন। তাদের পরিষ্কারভাবে দেখতে পেলে এবার বাছবিচারহীনভাবে পাঁচটি অনির্দিষ্ট শ্রেণি এবং বেছে বেছে সাতটি শ্রেণিতে, মোট বারো প্রকারে মৈত্রীভাব বিস্তৃত করুন। প্রত্যেক শ্রেণিতে মৈত্রীভাব ছড়িয়ে দেওয়া উচিত নিম্নোক্ত চারভাবে :

১. তারা বিপদ থেকে মুক্ত থাকুক,
২. তারা মানসিক কষ্ট থেকে মুক্ত থাকুক,
৩. তারা দৈহিক কষ্ট থেকে মুক্ত থাকুক,
৪. তারা সুস্থ ও সুখী হোক।

'তারা' বলতে এখানে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে একেক শ্রেণিকে বুঝাচ্ছে, সকল জীব, সকল দেবতা ইত্যাদি।

এভাবে আপনি মৈত্রী বিস্তৃত করবেন সর্বমোট আটচল্লিশ প্রকারে [৭+৫ = ১২ × ৪ = ৪৮]।

প্রত্যেকবার মৈত্রীভাব বিস্তারের সময় প্রত্যেক শ্রেণির জীবগুলো মনোযোগ ও ধ্যানের আলোয় পরিষ্কার দৃশ্যমান হওয়া উচিত। উদাহরণস্বরূপ, যখন আপনি সকল নারীর প্রতি মৈত্রীভাব বিস্তৃত করবেন, তখন বাস্তবিকই ধ্যানের আলোয় আপনার নির্দিষ্ট এলাকার মধ্যেকার সমস্ত নারীকে পরিস্কার দেখা উচিত। আপনার সেই নির্দিষ্ট এলাকার মধ্যেকার সকল পুরুষ, দেবতা, ইতর প্রাণী, ইত্যাদি সবাইকে আসলেই দেখতে পাওয়া উচিত। প্রত্যেকবার বিস্তারের সময়ে আপনাকে অবশ্যই তৃতীয় ধ্যান পর্যন্ত পৌঁছাতে হবে, পরবর্তী বিস্তারে যাওয়ার আগে। এভাবে আপনার চর্চা করা উচিত যতক্ষণ না আটচল্লিশ প্রকারের সবগুলোতেই আপনি সুদক্ষ হন।

সুদক্ষ হলে এবার আপনার নির্দিষ্ট এলাকার গণ্ডি আরও প্রসারিত করা উচিত যাতে ক্রমান্বয়ে অন্তর্ভুক্ত হয় আপনার পুরো বিহার, পুরো গ্রাম, পুরো শহর, পুরো প্রদেশ, পুরো দেশ, পুরো বিশ্ব, পুরো সৌরজগৎ, পুরো ছায়াপথ,

এবং পুরো অসীম মহাবিশ্ব। প্রত্যেকটি সম্প্রসারিত এলাকায় আটচল্লিশটি উপায়ে আপনার মৈত্রী-ভাবনার চর্চা করা উচিত তৃতীয় ধ্যান পর্যন্ত।

মৈত্রীর এমন সম্পূর্ণ বিস্তারে দক্ষ হয়ে উঠলে এবার আপনি দশটি দিকনির্দেশক শ্রেণিতে অগ্রসর হতে পারেন।

দশ দিকনির্দেশক শ্রেণি

দশ দিকনির্দেশক শ্রেণিতে মৈত্রী-ভাবনা করা হচ্ছে দশ দিকের প্রত্যেকটি দিকে উপর্যুক্ত আটচল্লিশটি উপায়ে মৈত্রীভাব গড়ে তোলা। এভাবে (১০×৪৮ =৪৮০) চারশ আশিটি উপায়ে মৈত্রীভাবনা করতে হয়। এগুলোর সাথে পূর্বোক্ত আটচল্লিশটি বিস্তারের উপায় যোগ করলে মৈত্রীভাবনার বিস্তারের উপায় দাঁড়ায় (৪৮০+৪৮ = ৫২৮) পাঁচশত আটাশটি।

দিকনির্দেশক শ্রেণির মৈত্রীভাবনা করার জন্য পুরো মহাবিশ্বে আপনার পূর্বদিকের সকল জীবগুলোকে দেখতে পাওয়া উচিত, আর তাদের প্রতি আটচল্লিশ প্রকারে মৈত্রীভাব বিস্তার করা উচিত। এর পরে ঠিক একইভাবে পশ্চিম ও অন্যান্য সকল দিকে করা উচিত।

এভাবে পাঁচশত আটাশ প্রকারে মৈত্রীভাব বিস্তারে সুদক্ষ হয়ে উঠলে আপনি মৈত্রী-ভাবনার এগারটি সুফল পাওয়ার অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারবেন, যা বুদ্ধ অঙ্গুত্তরনিকায়ে বলেছেন।

'ভিক্ষুগণ, যখন মৈত্রী দ্বারা পরিপূর্ণ এমন মুক্তমনের চর্চা করা হয়, গড়ে তোলা হয়, বার বার অনুশীলন করা হয়, এটিকে মাধ্যম হিসেবে নেওয়া হয়, ভিত্তি হিসেবে নেওয়া হয়, সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়, সুসংহত করা হয়, যথাযথভাবে আয়ত্ব করা হয়, তখন এগারটি সুফলের আশা করা যায়। সেই এগারটি সুফল কী কী? সে স্বস্তিতে ঘুমায়; স্বস্তিতে জাগে; দুঃস্বপ্ন দেখে না; মানুষদের প্রিয় হয়; অমানুষদেরও প্রিয় হয়; দেবতারা তাকে রক্ষা করে; আগুন, বিষ এবং অস্ত্র তাকে ক্ষতি করতে পারে না; তার মন সহজে একাগ্র হয়; তার গায়ের রং উজ্জ্বল হয়; মৃত্যুর সময়েও তার স্মৃতি লুপ্ত হয় না; যদি সে উচ্চতর জ্ঞান লাভ না করে, তবে মৃত্যুর পরে সে ব্রহ্মলোকে জন্ম নেয়।'

করুণা ভাবনা

উপর্যুক্ত নিয়মে একবার মৈত্রী-ভাবনা করতে পারলে এরপরে অপ্রমেয় করুণার ভাবনা করা খুব একটা কঠিন হবে না। করুণা-ভাবনা করার জন্য আপনার

প্রথমে সমজাতীয় লিঙ্গের জীবিত এক ব্যক্তিকে বেছে নেওয়া উচিত যে খুব কষ্টে আছে। তার কষ্টের কথা ভেবে ভেবে তার জন্য আপনার করুণা জাগানো উচিত।

এরপর আপনি সাদা কৃৎস্নের চতুর্থ ধ্যানে প্রবেশ করুন, সেই ধ্যানের উজ্জ্বল ও দীপ্তিমান আলো ব্যবহার করে সেই ব্যক্তিকে দেখুন এবং মৈত্রী ধ্যান করুন। সেখান থেকে বেরিয়ে এসে সেই দুর্দশাগ্রস্ত ব্যক্তির প্রতি করুণা গড়ে তুলুন এই চিন্তা করে, 'এই ব্যক্তিটি কষ্ট থেকে মুক্তি পাক' *(অয়ং সপ্পুরিসো দুকখা মুচ্চতু)*। এমন অনেকবার করুন, বার বার করুন, যতক্ষণ না প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ধ্যান লাভ করেন, এবং প্রত্যেক ধ্যানে পাঁচ প্রকার দক্ষতা অর্জন করে নিন। এরপর আপনার করুণার চর্চা করা উচিত হবে মৈত্রী-ভাবনায় যেমনটি করেছেন ঠিক সেভাবে, অর্থাৎ আপনার পছন্দের ব্যক্তির প্রতি, যার প্রতি আপনি নিস্পৃহ, আর যাকে আপনি ঘৃণা করেন; প্রত্যেককে একেবারে তৃতীয় ধ্যান পর্যন্ত, যতক্ষণ না আপনি তাদের মাঝে ভেদাভেদের সীমাটা ভেঙে ফেলতে পারেন।

যারা আপাতদৃষ্টিতে কোনো কষ্টে নেই বলে মনে হয়, তাদের প্রতি করুণাভাব গড়ে তুলতে গিয়ে আপনার চিন্তা করা উচিত যে, সকল অনার্যরা এই জন্মচক্রে ঘোরার সময় যে-সকল খারাপ কাজ করেছে, সেগুলোর ফল ভোগ করতে বাধ্য, আর তাই একসময় না একসময় চারি অপায়ে তাদের জন্মগ্রহণ করতে হবেই। অধিকন্তু, প্রত্যেকটি জীব করুণার পাত্র, কেননা তারা তো আর বৃদ্ধ হওয়া, অসুস্থতা এবং মৃত্যুর কষ্ট থেকে মুক্ত নয়।

এভাবে চিন্তা করে মৈত্রী-ভাবনার মতো এখানেও আপনাকে করুণা বিস্তার করতে হবে নিজের প্রতি, যাকে আপনি সম্মান করেন অথবা প্রিয়, যার প্রতি আপনি নিস্পৃহ, এবং যাকে আপনি ঘৃণা করেন, সবাইকে একে একে তৃতীয় ধ্যান পর্যন্ত, যতক্ষণ না আপনার ও অন্যদের মাঝে সীমাটা ভেঙে ফেলতে পারেন।

এরপর আপনার করুণা-ভাবনা করা উচিত মৈত্রী-ভাবনায় দেখানো নিয়মে, একশ বত্রিশটি উপায়ে, যেগুলো হচ্ছে : পাঁচটি অনির্দিষ্ট শ্রেণি, সাতটি নির্দিষ্ট শ্রেণি, এবং একশত বিশটি দিকনির্দেশক শ্রেণি [৫+৭+ (১০×১২=) ১২০ = ১৩২]।

মুদিতা-ভাবনা

অপ্রমেয় মুদিতা বা খুশির ভাবনা করতে হলে প্রথমে সমজাতীয় লিঙ্গের এক ব্যক্তিকে আপনার বেছে নেওয়া উচিত যে সুখী, যাকে দেখলেই আপনি সুখী হন এবং যাকে আপনি খুব পছন্দ করেন ও বন্ধুভাবাপন্ন।

এরপর সাদা কৃৎস্নের চতুর্থ ধ্যানে প্রবেশ করুন। যখন আলো উজ্জ্বল ও পরিষ্কার হবে, সেই আলো দিয়ে উক্ত ব্যক্তিকে দেখুন এবং মৈত্রী-ধ্যানে প্রবেশ করুন। এ থেকে বেরিয়ে আসুন, এবং করুণা ধ্যানে প্রবেশ করুন। এ থেকে বেরিয়ে এসে সেই সুখী ব্যক্তিটির প্রতি খুশির ভাবনা করুন এই চিন্তা করে : 'এই ভালো লোকটি তার সমৃদ্ধি থেকে বিচ্ছিন্ন না হোক', *(অয়ং সপ্পুরিসো য়থালদ্ধ সম্পত্তিতো মা বিগচ্ছতু।)* একেবারে তৃতীয় ধ্যান পর্যন্ত।

এরপর খুশির ভাব গড়ে তুলুন যাকে আপনি সম্মান করেন বা যে আপনার প্রিয়, যার প্রতি আপনি নিস্পৃহ এবং যাকে আপনি ঘৃণা করেন তাদের নিয়ে। আবার নিজের প্রতি খুশির ভাব বিস্তার করুন, এরপর আপনি সম্মান করেন বা প্রিয় এমন ব্যক্তি, আপনি নিস্পৃহ থাকেন এমন ব্যক্তি এবং ঘৃণা করেন এমন ব্যক্তির প্রতি খুশির ভাব বিস্তার করুন তৃতীয় ধ্যান পর্যন্ত, যতক্ষণ না আপনার ও তাদের মাঝে সীমা ভাঙতে পারেন। অবশেষে এই অসীম মহাবিশ্বের সকল জীবের প্রতি খুশির ভাব বিস্তার করুন একশত বত্রিশটি উপায়ে।

উপেক্ষা-ভাবনা

অপ্রমেয় উপেক্ষা-ভাবনা করতে গিয়ে আপনার প্রথমে সাদা কৃৎস্নের চতুর্থ ধ্যানে প্রবেশ করা উচিত। এরপর সমলিঙ্গের কোনো ব্যক্তি, যার প্রতি আপনি নিস্পৃহ, তাকে নিয়ে মৈত্রী, করুণা, এবং মুদিতা-ভাবনা করা উচিত তৃতীয় ধ্যান পর্যন্ত। এরপর তৃতীয় ধ্যান থেকে বেরিয়ে এসে সেই তিনটি অপ্রমেয়-ভাবনার অসুবিধাগুলো বিবেচনা করা উচিত : প্রথমটা হচ্ছে স্নেহ-ভালোবাসার খুব কাছাকাছি, দ্বিতীয়টা পছন্দ এবং অপছন্দের কাছাকাছি, আর তৃতীয়টা উল্লাস ও আনন্দের কাছাকাছি। এরপর ভাবুন, উপেক্ষার চতুর্থ ধ্যান অনেক শান্ত। এরপর যে ব্যক্তির প্রতি আপনি নিস্পৃহ তার প্রতি উপেক্ষা-ভাব গড়ে তোলা উচিত এই চিন্তা করে : 'এই ভালো লোকটি তার নিজ কর্মের উত্তরাধিকারী।' *(অয়ং সপ্পুরিসো কম্মস্সকো)*

মৈত্রী, করুণা ও মুদিতার তৃতীয় ধ্যানের সাহায্যে এখন উপেক্ষার চতুর্থ ধ্যান পেতে খুব বেশিক্ষণ লাগার কথা নয়। এরপর উপেক্ষা-ভাবনা করুন

আপনার সম্মানিত অথবা প্রিয় কোনো ব্যক্তিকে নিয়ে, যে ব্যক্তির প্রতি আপনি নিস্পৃহ, আর যাকে আপনি ঘৃণা করেন। এরপর আবার নিজেকে নিয়ে উপেক্ষা-ভাবনা করুন, আবার কোনো ব্যক্তি যাকে আপনি সম্মান করেন অথবা যে আপনার পছন্দের, যার প্রতি আপনি নিস্পৃহ এবং যাকে আপনি ঘৃণা করেন, একেবারে তৃতীয় ধ্যান পর্যন্ত, যতক্ষণ না আপনার নিজের মধ্যে সীমাটা ভেঙে ফেলতে পারেন। অবশেষে এই অসীম মহাবিশ্বের সকল জীবগণের প্রতি উপেক্ষা ভাব গড়ে তুলুন একশ বত্রিশটি উপায়ে। এতে করে চারটি অপ্রমেয় ভাবনা সম্পূর্ণ হলো।

চারিটি আরক্ষা ভাবনা

মৈত্রী, বুদ্ধগুণ, বিরূপতা বা অশুভ এবং মৃত্যু—এই চারটি বিষয়ের ভাবনাকে বলা হয় চারিটি আরক্ষা ভাবনা। এর কারণ হচ্ছে, এগুলো একজন ভাবনাকারীকে বিভিন্ন বিপদ থেকে রক্ষা করে। এ কারণেই, বিদর্শন ভাবনায় যাওয়ার আগে এগুলো শেখা খুব কাজের। আমি ইতিমধ্যেই বলেছি কীভাবে মৈত্রী-ভাবনা করতে হয়, তাই এখন আমি বলব কীভাবে বাকি তিনটি আরক্ষা ভাবনা করতে হয়। শুরু করছি বুদ্ধগুণ-ভাবনা দিয়ে।

এই ভাবনার বিষয়বস্তু গড়ে তোলা যায় বুদ্ধের নয়টি গুণগুলো নিয়ে করা একটি কথার মাধ্যমে, যা সুত্তে প্রায়ই দেখা যায় :

'ইতিপি সো ভগবা অরহং সম্মাসম্বুদ্ধো বিজ্জাচরণ-সম্পন্নো সুগতো লোকবিদূ অনুত্তরো পুরিসদম্মসারথিসত্থা দেবমনুস্সানং বুদ্ধো ভগবাতি।'

এটাকে এভাবে ব্যাখ্যা করা যায় : তিনি ধন্য, যিনি সকল কলুষতাকে ধ্বংস করেছেন এবং একজন প্রশংসাযোগ্য ব্যক্তি *(অরহং)*, যিনি নিজে নিজেই পরম জ্ঞান লাভ করেছেন *(সম্মাসম্বুদ্ধো)*, যিনি জ্ঞানে এবং নৈতিক আচরণে নিখুঁত *(বিজ্জাচরণসম্পন্নো)*, যিনি উপকারী এবং সত্য, এমন কথাই বলেন *(সুগতো)*, যিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে জানেন *(লোকবিদূ)*, যেসব ব্যক্তি পোষ মানার যোগ্য, তাদের পোষ মানানোতে তিনি অতুলনীয় *(অনুত্তরো পুরিসদম্মসারথি)*, দেবতা ও মানবদের শিক্ষক *(সত্থা দেবমনুস্সানং)*, তিনি একজন আলোকিত ব্যক্তি *(বুদ্ধো)*, তিনি তার আগের সৎকর্মগুলোর ফলের সবচেয়ে সৌভাগ্যবান অধিকারী *(ভগবা)*।

আমি এখানে ব্যাখ্যা করব, ভাবনা করতে গিয়ে কীভাবে বুদ্ধের প্রথম গুণটা '*অরহং*' ব্যবহার করতে হয়। *বিশুদ্ধিমার্গ*মতে, পালি '*অরহং*' শব্দের পাঁচটি সংজ্ঞা আছে :

যেহেতু তিনি সম্পূর্ণভাবে, নিঃশেষে, সকল কলুষতা ও অভ্যাসগত ঝোঁকগুলোকে দূরীভূত করেছেন, আর যে-কারণে সেগুলো থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে ফেলতে সক্ষম হয়েছেন, তাই বুদ্ধ একজন প্রশংসিত ব্যক্তি : *অরহং*।

যেহেতু তিনি সকল কলুষতাকে অর্হত্ত্বমার্গের তরবারি দিয়ে কেটে ছিন্ন করে ফেলেছেন, তাই বুদ্ধ একজন প্রশংসিত ব্যক্তি : *অরহং*।

যেহেতু তিনি প্রতীত্যসমুৎপাদ-নীতির চক্রের অজ্ঞানতা ও তৃষ্ণা থেকে শুরু করে সকল শলাকাগুলো ভেঙে ফেলেছেন, ধ্বংস করেছেন, তাই বুদ্ধ একজন প্রশংসিত ব্যক্তি : *অরহং*।

যেহেতু তিনি সংযম, ধ্যান ও প্রজ্ঞায় অতুলনীয়, তাই ব্রহ্মারা, দেবতারা এবং লোকেরা সবাই বুদ্ধকে সর্বোচ্চ শ্রদ্ধা করেন। তাই বুদ্ধ একজন প্রশংসিত ব্যক্তি : *অরহং*।

যেহেতু তিনি নির্জনে বা কেউ না দেখলেও কোনো পাপ কাজ করেন না দৈহিকভাবে, কথায় বা মনে মনে, তাই বুদ্ধ একজন প্রশংসিত ব্যক্তি : *অরহং*।

এই ভাবনা করার জন্য আপনার এই পাঁচটি সংজ্ঞাকে এমনভাবে মুখস্থ করা উচিত যেন গড়গড় করে আবৃত্তি করতে পারেন।

এরপর সাদা কৃৎস্নের অথবা শ্বাসপ্রশ্বাসের চতুর্থ ধ্যানে প্রবেশ করুন। যখন আলো উজ্জ্বল ও পরিষ্কার হয়ে উঠবে, তখন এই আলোয় একটা বুদ্ধের মূর্তিকে কল্পনা করুন যেটাকে আপনি মনে করতে পারেন, পছন্দ করেন এবং সম্মান করেন। যখন এটি পরিষ্কার হবে, এটিকে সত্যিকারের বুদ্ধ হিসেবে দেখুন এবং এতে এমন ধারণা করেই মনোযোগ দিন।

যদি আপনি অতীতে কোনো বুদ্ধের সাথে দেখা পাওয়ার মতো সৌভাগ্যবান হন, তাহলে তার প্রতিমূর্তি আবির্ভূত হতে পারে। যদি এমন হয়, তাহলে আপনার শুধু বুদ্ধের প্রতিমূর্তিটা নয়, তার গুণগুলোর প্রতিও মনোযোগ দেওয়া উচিত। যদি আসল বুদ্ধের প্রতিমূর্তি না আসে, তাহলে আপনার কল্পনা করা সেই মূর্তিটাকেই আসল বুদ্ধ বলে দেখুন এবং তার গুণগুলো ভাবুন। আপনি *অরহং*-এর যে সংজ্ঞাটাকে পছন্দ হয় সেটিকে বেছে নিন, তার অর্থকে ভাবনার বিষয়বস্তু করে বার বার ভাবুন : '*অরহং, অরহং*'।

যখন আপনার মনোযোগ বাড়বে এবং শক্তিশালী হয়ে উঠবে, বুদ্ধের মূর্তিটা উধাও হয়ে যাবে। আপনি শুধু সেই বেছে নেওয়া গুণটাতে মনোযোগ ধরে রাখুন। সেই গুণটাতে মনোযোগ দিতে থাকুন যতক্ষণ না ধ্যানের অঙ্গগুলো আবির্ভূত হয়, যদিও এই বিষয়টা নিয়ে ভাবনা করে আপনি কেবল

উপচার-ধ্যান *(উপচার-ঝান)* পেতে পারেন। আপনি অন্যান্য গুণগুলো নিয়েও ভাবনা করতে পারেন এবং পাঁচটি দক্ষতা অর্জন করতে পারেন।

বিরূপতা ভাবনা (অসুভ)

মৃতদেহের প্রতি বিরূপতা ভাবনা করতে গিয়ে আপনার সাদা কৃৎস্ন অথবা শ্বাসপ্রশ্বাসের ভাবনায় চতুর্থ ধ্যানে প্রবেশ করা উচিত। যখন আলো উজ্জ্বল ও স্পষ্ট হবে, এটিকে দিয়ে নিজের লিঙ্গের কোনো ব্যক্তির সবচেয়ে বীভৎস কোনো মৃতদেহকে কল্পনা করুন, যেটি আপনি আগে দেখেছেন। আলোটাকে ব্যবহার করে আগে বাস্তবে যেভাবে দেখেছেন, এখনো ঠিক সেভাবে দেখুন। যখন এটি পরিষ্কার হবে, এটিকে যথাসম্ভব বিশ্রী ও ঘৃণ্য করে তুলুন। এতে মনোযোগ দিয়ে মনে মনে বলুন : 'বিশ্রী, বিশ্রী' *(পটিকূল, পটিকূল)*।

মৃতদেহটির বীভৎসতার বিষয়টিতে মনোযোগ দিতে থাকুন যতক্ষণ না উদগ্রহ-নিমিত্ত (প্রাথমিক ছবি) প্রতিভাগ-নিমিত্তে পরিণত না হয় (ছবিটির প্রতিচ্ছবি)।

উদগ্রহ-নিমিত্ত হচ্ছে মৃতদেহটির ছবি, আপনি অতীতে এটিকে যেমনটা দেখেছেন, ঘৃণ্য, ভয়ংকর ও আতঙ্কজনক রূপে। কিন্তু প্রতিভাগ-নিমিত্ত দেখতে বড় বড় হাত-পাওয়ালা একটি মানুষের মতো যে ভরপেট খেয়ে শুয়ে আছে।

এই নিমিত্তে মনোযোগ দিতে থাকুন যতক্ষণ না প্রথম ধ্যান লাভ করেন। এবার পাঁচটি দক্ষতা আয়ত্ব করুন।

মৃত্যু-ভাবনা (মরণানুস্মৃতি)

মহাসতিপট্ঠান সুত্ত এবং *বিসুদ্ধিমগ্গ অট্ঠকথা* মতে, আপনি স্মরণ করতে পারেন এমন আগে দেখা মৃতদেহ নিয়েও মৃত্যু-ভাবনা করা যায়। অতএব, আপনাকে প্রথমে মৃতদেহের বিরূপতা ভাবনার প্রথম ধ্যানে প্রবেশ করে, সেই বাহ্যিক মৃতদেহকে বিষয়বস্তু করে ভাবুন : 'আমার এই দেহও মরণের স্বভাবসম্পন্ন। প্রকৃতপক্ষে এটিও ঠিক এই মৃতদেহের মতো হয়ে যাবে। এটি এমন হওয়াটা এড়াতে পারবে না।' নিজের মরণশীলতার প্রতি মনোযোগ ও স্মৃতি রেখে আপনি দেখবেন যে এক ধরনের সংবেগ উৎপন্ন হচ্ছে। এমন জ্ঞানে খুব সম্ভবত আপনি নিজের দেহকেও একটি বিরূপ মৃতদেহ হিসেবে দেখবেন। নিজের দেহের সেই ছবিটা প্রাণহীন উপলব্ধি করে আপনার এবার নিচের চিন্তাগুলো করা উচিত :

১. আমার মরণ নিশ্চিত, জীবন অনিত্য *(মরণং মে ধুবং, জীবিতং মে অধুবং)*,

২. আমি নিশ্চিত মারা যাব *(মরণং মে ভবিস্সতি)*,

৩. আমার জীবন মৃত্যুর মধ্য দিয়ে শেষ হবে *(মরণপরিয়োসানং মে জীবিতং)*,

৪. মরণ, মরণ *(মরণং, মরণং)*।

যেকোনো একটা কথাকে বেছে নিন এবং যেকোনো ভাষাতে মনে মনে বলুন। নিজের মৃতদেহের মধ্যে প্রাণের অনুপস্থিতির ছবিটার উপর মনোযোগ দিতে থাকুন যতক্ষণ না ধ্যানের অঙ্গগুলো উৎপন্ন হয়, যদিও এই ভাবনার বিষয়বস্তু দ্বারা আপনি কেবল উপচার ধ্যান লাভ করতে পারবেন।

সারমর্ম

মৈত্রী, বুদ্ধগুণানুস্মরণ, বিরূপতা এবং মৃত্যু—এই চারটি বিষয়ের ভাবনাকে বলা হয় চারি আরক্ষা ভাবনা। কারণ, এগুলো ভাবনাকারীকে বিভিন্ন ধরনের বিপদ থেকে নিরাপদ রাখে।

অঙ্গুত্তর নিকায়ের মেঘিয়সুত্তে বলা হয়েছে :

'যৌন কামনার পরিত্যাগের জন্য বিরূপতা তথা অশুভ ভাবনা করা উচিত; ক্রোধ পরিত্যাগের জন্য মৈত্রী-ভাবনা করা উচিত; অবান্তর চিন্তাগুলোকে ঝেড়ে ফেলার জন্য শ্বাসপ্রশ্বাসের ভাবনা (আনাপানস্মৃতি ভাবনা) করা উচিত।'

এই সুত্ত মতে, যৌনবাসনা দূর করার জন্য শ্রেষ্ঠ অস্ত্র হচ্ছে বিরূপতা ভাবনা। যদি আপনি একটি মৃতদেহ ভাবনার বিষয় হিসেবে নেন, এটিকে বীভৎসরূপে দেখেন, এটিকে বলা হয় 'প্রাণহীন দেহের বিরূপতা' *(অবিঞ্ঞাণক-অসুভ)*। জীবিত দেহের বত্রিশটি অংশকে বিরূপ হিসেবে দেখা, যেমনটা বলা হয়েছে অঙ্গুত্তর নিকায়ের গিরিমানন্দ সুত্তে, এটাকে বলা হয় 'জীবিত দেহের বিরূপতা' *(সবিঞ্ঞাণক-অসুভ)*। এই উভয় রূপের বিরূপতা-ভাবনা তথা অশুভ-ভাবনা হচ্ছে যৌন আকাঙ্ক্ষা দূর করার অস্ত্র।

ক্রোধ দূর করার শ্রেষ্ঠ অস্ত্র হচ্ছে মৈত্রী-ভাবনা গড়ে তোলা। আর অবান্তর চিন্তা-ভাবনাগুলো দূর করার সবচেয়ে কার্যকরী অস্ত্র হচ্ছে শ্বাসপ্রশ্বাসের ভাবনা তথা আনাপানস্মৃতি ভাবনা।

তা ছাড়াও, যখন ধ্যান এবং শ্রদ্ধা (বিশ্বাস) দুর্বল হয়ে পড়ে, মনটা নিরস হয়, তখন ফর্মে (স্বরূপে) ফেরার শ্রেষ্ঠ অস্ত্র হচ্ছে বুদ্ধগুণ-ভাবনা (বুদ্ধানুস্মৃতি

ভাবনা)। যখন জরুরি ভাবটা (উদ্যমী ভাবটা) দুর্বল হয়ে পড়ে, আর ধ্যান করতে করতে আপনি বিরক্ত, তখন হুঁশ ফিরিয়ে আনার সবচেয়ে ভালো অস্ত্র হচ্ছে মৃত্যু-ভাবনা। আজ আমি ব্যাখ্যা করেছি কীভাবে চারি ব্রহ্মবিহার ভাবনা এবং চারি আরক্ষা ভাবনা করতে হয়। পরের দেশনায় আমি ব্যাখ্যা করব, কীভাবে বিদর্শন ভাবনা করতে হয়, যা শুরু করব চার ধাতু-ভাবনা দিয়ে এবং বিভিন্ন প্রকার রূপের বিশ্লেষণের মাধ্যমে।

এই দেশনাটা শেষ করার আগে আমি শমথ এবং বিদর্শন ভাবনার মধ্যেকার সম্পর্কটাকে একটু ব্যাখ্যা করতে চাই।

সংযুক্ত নিকায়ের খন্ধ-বর্গের সমাধি সুত্তে বুদ্ধ বলেছেন, 'ভিক্ষুগণ, তোমাদের ভাবনা করা উচিত। ভিক্ষুগণ, যে ভিক্ষু একাগ্রচিত্ত, সে ধর্মগুলোকে যেটা যেমন তাকে ঠিক সেভাবেই জানে। সে কী জানে? রূপের উৎপত্তি এবং বিলীন হয়ে যাওয়াকে সে জানে; বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কারগুলোর উৎপত্তি ও তাদের বিলীন হয়ে যাওয়াকে জানে; বিজ্ঞানের উৎপত্তি ও তার বিলীন হয়ে যাওয়াকে জানে।'

অতএব, যে ভিক্ষু একাগ্রচিত্ত, সে পঞ্চস্কন্ধ ও তাদের কারণগুলোকে জানে, তাদের উৎপত্তি ও বিলীন হয়ে যাওয়াকে জানে। সে পরিষ্কারভাবে দেখে যে কারণগুলোর উৎপত্তির কারণেই পঞ্চস্কন্ধের আবির্ভাব হয়, আর তাদের কারণগুলোর সম্পূর্ণ থেমে যাওয়ার কারণে পঞ্চস্কন্ধের আবির্ভাবও থেমে যায়।

প্রথম দুদিন এবং আজকে আমি যে শমথের আলোচনা করলাম তা শক্তিশালী ধ্যান উৎপন্ন করে। ধ্যানের সেই আলোই আপনাকে বিদর্শনের জন্য পরমার্থ নামরূপকে দেখাবে। এমন গভীর, প্রবল ও শক্তিশালী মনোযোগের কারণে আপনি নাম ও রূপের অনিত্য, দুঃখময় ও অনাত্ম স্বভাবকে এবং তাদের কারণগুলোকে পরিষ্কারভাবে দেখতে পাবেন। এমন পরিষ্কারভাবে দেখতে পারাটা একটি দারুণ সুবিধা, যা আসে শমথ থেকে।

শমথ আপনাকে বিশ্রামের একটি জায়গা করে দেয়। বিদর্শনে অনেক কিছু বুঝতে হয়, আর এতে ক্লান্তি চলে আসতে পারে। তখন আপনি সেই শমথ ধ্যানগুলোর যেকোনো একটাতে অনেকক্ষণ ধরে থাকতে পারেন। এতে আপনার মন বিশ্রাম পায় আর সতেজ হয়ে ওঠে, এরপর আপনি আবার বিদর্শনে ফিরে যেতে পারেন। যখনই ক্লান্তি আসবে আপনি আবার বিশ্রামের জন্য শমথ ধ্যানে প্রবেশ করতে পারেন।

আমি যখন পরবর্তী দেশনাগুলোতে বিদর্শন ব্যাখ্যা করব, তখন আপনার শমথের এই সুবিধাগুলো স্মরণ করা উচিত।

প্রশ্নোত্তর পর্ব - ৩

প্রশ্ন ৩.১ : *শ্বাসপ্রশ্বাসের ভাবনায় পরিকর্ম-নিমিত্ত, উদগ্রহ-নিমিত্ত এবং প্রতিভাগ-নিমিত্ত আছে। এখানে পরিকর্ম-নিমিত্ত কী? পরিকর্ম-নিমিত্ত কি সব সময় ধুসর? পরিকর্ম-নিমিত্ত ও উদগ্রহ-নিমিত্তের মধ্যে পার্থক্য কী?*

উত্তর ৩.১ : শ্বাসপ্রশ্বাসের ভাবনায় তিন ধরনের নিমিত্ত, তিন ধরনের ধ্যান এবং তিন ধরনের ভাবনা হয়। তিন ধরনের নিমিত্ত হচ্ছে : পরিকর্ম-নিমিত্ত, উদগ্রহ-নিমিত্ত এবং প্রতিভাগ-নিমিত্ত। তিন ধরনের ধ্যান হচ্ছে প্রস্তুতি ধ্যান (পরিকর্ম-সমাধি) যাকে মাঝে মাঝে বলা হয় ক্ষণিক ধ্যান (খণিক-সমাধি), উপচার ধ্যান (উপচার-সমাধি), এবং অর্পণা ধ্যান (অর্পণা-সমাধি)। তিন ধরনের ভাবনা হচ্ছে পরিকর্ম ভাবনা, উপচার ভাবনা এবং অর্পণা ভাবনা।

পরিকর্ম ধ্যানের বিষয়বস্তু পরিকর্ম-নিমিত্ত হতে পারে, উদগ্রহ-নিমিত্ত হতে পারে, আবার মাঝেমধ্যে প্রতিভাগ-নিমিত্তও হতে পারে। পরিকর্ম ভাবনা আর পরিকর্ম ধ্যান একই।

সত্যিকারের উপচার ধ্যান এবং সত্যিকারের উপচার ভাবনা হচ্ছে অর্পণা ধ্যানের খুব কাছাকাছি, এ কারণেই এটাকে বলা হয় 'উপচার বা সন্নিকটে'। কিন্তু অর্পণা-ধ্যানের আগে মাঝে মাঝে প্রতিভাগ-নিমিত্তকে ভিত্তি করে যে গভীর ও শক্তিশালী ধ্যান হয়, সেটাকে রূপকীয় অর্থে 'উপচার ধ্যান' বা 'উপচার ভাবনা' বলা হয়। যখন পরিকর্ম ধ্যান বা ক্ষণিকের ধ্যান পুরোপুরি গড়ে ওঠে, এটি তখন উপচার ধ্যানের দিকে ধাবিত করে। আবার যখন উপচার ধ্যান পুরোপুরি গড়ে ওঠে, এটি অর্পণা ধ্যানের দিকে ধাবিত করে।

আমরা ইতিমধ্যেই আগের দেশনাগুলোতে নিমিত্তের বিষয়ে আলোচনা করেছি। তিন ধরনের নিমিত্ত আছে : পরিকর্ম-নিমিত্ত, উদগ্রহ-নিমিত্ত এবং প্রতিভাগ-নিমিত্ত।

(১) **পরিকর্ম-নিমিত্ত :** স্বাভাবিক শ্বাসপ্রশ্বাস একটি নিমিত্ত। শ্বাসপ্রশ্বাসের স্পর্শবিন্দুও একটি নিমিত্ত। এখানে নিমিত্ত হচ্ছে ভাবনার বিষয়বস্তু। অর্থকথা উল্লেখ করে যে, নাকের ডগা-নিমিত্ত (নাসিকা-নিমিত্ত) এবং উপরের ঠোঁট নিমিত্ত (মুখ-নিমিত্ত) হচ্ছে নবীনদের জন্য পরিকর্ম-নিমিত্ত। যখন মনোযোগ একটু শক্তিশালী হয়, নাকের আশেপাশে সাধারণত একটি ধুসর ধোঁয়ার মতো দেখা যায়। এই ধুসর ধোঁয়াটাকেও পরিকর্ম-নিমিত্ত বলা হয়। ধ্যানটাকে বলা হয় পরিকর্ম ধ্যান, আর ভাবনাটাকেও বলা হয় পরিকর্ম ভাবনা। এই ধাপ পর্যন্ত সকল ভাবনা এবং সকল ধ্যান হচ্ছে পরিকর্ম ধ্যান। এই ধাপে নিমিত্ত কেবল ধুসর ধোঁয়া নয়, অন্যান্য রঙেরও হতে পারে।

(২) **উদ্গ্রহ-নিমিত্ত :** যখন আগের মনোযোগ সবল ও শক্তিশালী হয়, ধুসর ধোঁয়া সাধারণত সাদায় পরিণত হয়, সাদা তুলোর মতো। কিন্তু এটি যেকোনো রঙের হতে পারে, যা সাধারণত উপলব্ধির ভিন্নতার উপর নির্ভর করে। যখন উপলব্ধি বদলে যায়, নিমিত্তের রং এবং আকারও বদলাতে পারে। যদি রং এবং আকার খুব বেশি বদলায়, তাহলে মনোযোগ নিচে নামতে থাকে। কারণ, ভাবনাকারীর উপলব্ধি বদলাচ্ছে। যখনই এটি বদলাচ্ছে, তার বিষয়বস্তুও বদলে যাচ্ছে আর সে ভিন্ন একটি বিষয়বস্তু পাচ্ছে ধ্যানের জন্য। তাই নিমিত্তের রং এবং আকারকে ভাবনাকারীর অগ্রাহ্য করা উচিত। তার শুধু আনাপান-নিমিত্তে মনোযোগ দেওয়া উচিত।

উদ্গ্রহ-নিমিত্ত নিয়ে ধ্যানকেও পরিকর্ম ধ্যান বলা হয়, আর ভাবনাকে বলা হয় পরিকর্ম ভাবনা।

(৩) **প্রতিভাগ-নিমিত্ত :** যখন মনোযোগ আরও সুদৃঢ় এবং আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠে, তখন উদ্গ্রহ-নিমিত্ত প্রতিভাগ-নিমিত্তে বদলে যায়। সাধারণ প্রতিভাগ-নিমিত্ত হয় পরিষ্কার, উজ্জ্বল ও দীপ্তিমান, সকালের শুকতারার মতো। এক্ষেত্রেও উপলব্ধি বদলালে নিমিত্ত বদলাতে পারে। যখন মনোযোগ প্রবল ও শক্তিশালী হয়, তখন ভাবনাকারী যদি চান নিমিত্ত দীর্ঘ হোক, এটি দীর্ঘ হবে; ছোট হতে চাইলে ছোট হবে; যদি রুবির মতো লাল চান, তো এটি রুবির মতো লাল হয়ে যাবে। এর কারণ হচ্ছে ভাবনাকারীর উপলব্ধি বদলাচ্ছে। *বিশুদ্ধিমার্গ*মতে, এমন করা উচিত নয়। কারণ, তাহলে মনোযোগ গভীর হলেও তা আস্তে আস্তে কমতে থাকবে। কারণ, ভিন্ন ভিন্ন উপলব্ধি হবে, তাই ভিন্নভিন্ন বিষয়বস্তু আসবে। এজন্যই ভাবনাকারীর তার নিমিত্ত নিয়ে খেলা করা উচিত নয়। যদি তিনি খেলা করেন তো ধ্যান পাবেন না।

প্রতিভাগ-নিমিত্তের শুরুর ধাপটাকেও পরিকর্ম ধ্যান বলা হয়। ভাবনাটাকেও বলা হয় পরিকর্ম ভাবনা। কিন্তু ধ্যানের একেবারে কাছাকাছি হলে এদের তখন বলা হয় উপচার ধ্যান এবং উপচার ভাবনা। যখন গভীর একাগ্রতা আসে, তখন নিমিত্ত তখনো প্রতিভাগ-নিমিত্ত, কিন্তু ধ্যান এখন অর্পণা ধ্যান এবং ভাবনা তখন অর্পণা ভাবনা।

প্রশ্ন ৩.২ : *উপচার ধ্যান ও অর্পণা ধ্যানের মধ্যে পার্থক্য কী?*

উত্তর ৩.২ : যখন প্রতিভাগ-নিমিত্ত আবির্ভূত হয়, মনোযোগ তখন শক্তিশালী। কিন্তু এই পর্যায়ে, যা হচ্ছে উপচার ধ্যানের ধাপ, তখন ধ্যানের অঙ্গগুলো পরিপূর্ণভাবে গঠিত হয় না, ভবাঙ্গ মনের অবস্থা (জীবনের

চালিকাশক্তিমূলক চেতনা) তখনো ঘটে; ভাবনাকারী ভবাঙ্গের মধ্যে পড়ে যায়। ভাবনাকারী বলে যে, সবকিছু থেমে গেছে অথবা সে ভাবতে পারে এটিই নির্বাণ। আর বলে, 'আমি তো আগে কিছুই জানতাম না।' যদি সে এভাবে চর্চা করতে থাকে, তাহলে সে আরও দীর্ঘ সময় ধরে ভবাঙ্গে থাকতে পারে।

যেকোনো চর্চায়, সেটি ভালো হোক বা মন্দ হোক, কেউ যদি বার বার চেষ্টা করে, সে একসময় তার উদ্দেশ্যে সফল হবে। 'চর্চায় সাফল্য আসে।' এক্ষেত্রেও যদি সে বার বার একইভাবে চেষ্টা করে, তাহলে ভবাঙ্গে দীর্ঘ সময় ধরে থাকতে পারে। সে কেন বলে যে, সে কিছুই জানে না? কারণ, ভবাঙ্গের বিষয়বস্তু হচ্ছে এর আগের জন্মের মৃত্যুর কাছাকাছি সময়। সেই বিষয়বস্তুটি কর্মও হতে পারে, কর্মনিমিত্তও হতে পারে, অথবা গতিনিমিত্তও হতে পারে। কিন্তু ভাবনাকারী সেটাকে দেখতে পায় না। কারণ, সে এখনো প্রতীত্যসমুৎপাদ-নীতিকে উপলব্ধি করতে পারে নি। যদি তারা একবার প্রতীত্যসমুৎপাদ-নীতিকে উপলব্ধি করে, তখন তারা দেখে যে ভবাঙ্গ এগুলোর যেকোনো একটাকে বিষয়বস্তু হিসেবে নিয়েছে।

যদি ভাবনাকারী মনে করে যে এটি নির্বাণ, তাহলে ধারণাটি নির্বাণের পথে বিশাল একটি পাথরের মতো প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। যদি সে এই বিশাল 'পাথর'টি না সরায়, তাহলে সে নির্বাণ লাভ করতে পারবে না। এমন ধারণা হয় কেন? অনেক ভাবনাকারী ভাবে যে একজন শিষ্য *(সাবক)* বুদ্ধের শিক্ষা দেয়া নামরূপকে জানতে পারে না। তাই তারা ভাবে না যে, বুদ্ধের শেখানো নামরূপ ও তাদের কারণগুলোকে জানতে হলে যথেষ্ট গভীর মনোযোগ গড়ে তোলা দরকার। তাই তাদের ধ্যান দুর্বল হয়, ভবাঙ্গ মনের অবস্থাও হয়, কারণ ধ্যানের অঙ্গগুলো তখন খুব দুর্বল হয়। তারা দীর্ঘক্ষণ ধরে মনোযোগ রাখতে পারে না। যদি কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে ভবাঙ্গে পড়ে যাওয়াটা চর্চা করে, সে তার লক্ষ্যে পৌঁছাবে, কিন্তু এটি নির্বাণ নয়। নির্বাণ লাভ করতে হলে আমাদের অবশ্যই সপ্ত বিশুদ্ধির ধাপগুলো পেরোতে হবে একে একে। পরমার্থ নামরূপ ও তাদের কারণগুলো না জেনে কেউ নির্বাণ লাভ করতে পারে না।

তাই, যখন আনাপান প্রতিভাগ-নিমিত্ত আবির্ভূত হয়, ভাবনাকারীর মন ভবাঙ্গে পড়তে পারে, কারণ ধ্যানের অঙ্গগুলো তখনো শক্তিশালী হয় নি। এটি ঠিক একটি ছোট শিশুর মতো যে এত দুর্বল যে এখনো নিজে নিজে দাঁড়াতে পারে না, সে বার বার পড়ে যায়। একইভাবে উপচার ধ্যানের ধাপে ধ্যানের অঙ্গগুলো পরিপূর্ণভাবে গঠিত হয় না, আর কেউ কেউ ভবাঙ্গে পড়ে যেতে

পারে। মনে রাখতে হবে, এটি কিন্তু নির্বাণ নয়।

ভবাঙ্গে পড়াটা এড়ানোর জন্য, আর ধ্যানকে আরও সুদৃঢ় করার জন্য আপনার দরকার পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের সহায়তা : শ্রদ্ধা *(সদ্ধা)*, বীর্য *(বীরিয়)*, স্মৃতি *(সতি)*, সমাধি তথা মনোযোগ *(সমাধি)*, এবং প্রজ্ঞা *(পঞ্ঞা)*। এগুলো আপনার মনকে ঠেলে সামনে নিয়ে যায় এবং প্রতিভাগ-নিমিত্তের উপরে একাগ্র করে রাখে। মনকে প্রতিভাগ-নিমিত্ত জানার কাজে বার বার প্রচেষ্টার দরকার হয়, স্মৃতির দরকার হয় এটিকে ভুলে না যাওয়ার জন্য, এবং জানার জন্য দরকার হয় প্রজ্ঞার।

অর্পণা-ধ্যানের ধাপে, ধ্যান অঙ্গগুলো পুরোপুরি সুগঠিত। একজন সবল ও শক্তিশালী লোক যেমন সারাদিন দাঁড়িয়ে থাকতে পারে, ঠিক সেভাবে একজন ভাবনাকারীও প্রতিভাগ-নিমিত্তকে বিষয়বস্তু করে অর্পণা ধ্যানে মগ্ন থাকতে পারে দীর্ঘক্ষণ ধরে, ভবাঙ্গে না পড়ে।

পুরোপুরি এবং অবিচ্ছিন্ন নিবিষ্টতা থাকতে পারে এক, দুই, তিন ঘণ্টা বা আরও বেশি সময় ধরে। সেই সময় সে একটি শব্দও শোনে না। তার মন অন্য কোনো বিষয়বস্তুর দিকে যায় না। প্রতিভাগ-নিমিত্ত বাদে সে আর কিছুই জানে না তখন।

প্রশ্ন ৩.৩ : *কোন কোন অবস্থায়, অথবা কোন ধাপে আমরা বুঝব যে এটি উপচার ধ্যানের অথবা অর্পণা ধ্যানের?*

উত্তর ৩.৩ : যদি অনেকবার ভবাঙ্গ অবস্থা হয় ধ্যানের সময়, তাহলে বলা যায় যে এটি উপচার ধ্যান। কিন্তু নিমিত্ত অবশ্যই প্রতিভাগ-নিমিত্ত হতে হবে। যদি কেউ দীর্ঘ সময় ধরে পূর্ণ নিবিষ্টতায় থাকতে পারে, কোনোরূপ ব্যাঘাত ছাড়াই, বিষয়বস্তুও প্রতিভাগ-নিমিত্ত, তখনই কেবল বলা যায় যে এটি অর্পণা ধ্যান, অর্পণা ভাবনা।

ভাবনাকারী কীভাবে জানে যে তার মন ভবাঙ্গে পড়ে যাচ্ছে? যখন সে খেয়াল করে যে প্রায়ই সে প্রতিভাগ-নিমিত্তের প্রতি অমনোযোগী হয়ে পড়ছে, সে তখন জানে যে ভবাঙ্গ অবস্থা ঘটছে। তার মন অবশ্য একটু ক্ষণের জন্য প্রতিভাগ-নিমিত্তের বদলে অন্য বিষয়বস্তুও ভাবতে পারে। এমনটা কিন্তু অর্পণা ধ্যানে ঘটে না। অর্পণা ধ্যানে কোনো ব্যাঘাত ছাড়া পূর্ণ নিবিষ্টতায় থাকা যায়।

প্রশ্ন ৩.৪ : *চারটি ধ্যানের প্রত্যেকটিতেই কি উপচার ধ্যান এবং অর্পণা ধ্যান আছে? সেগুলোর বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী?*

উত্তর ৩.৪ : আনাপান ধ্যানগুলোর কথা ধরা যাক তাহলে। এই ধ্যানগুলোর বিষয়বস্তু হচ্ছে প্রতিভাগ-নিমিত্ত। প্রত্যেকটি স্তরে প্রথমে আছে

উপচার ধ্যান, এর পরে অর্পণা ধ্যান। উভয়ই কিন্তু প্রতিভাগ-নিমিত্তকে তাদের বিষয়বস্তু হিসেবে নেয়। তাই এতে শুধুমাত্র ধ্যানের স্তরটাই ভিন্ন।

প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় উপচার ধ্যানে পাঁচটি ধ্যান অঙ্গ আছে। কিন্তু চতুর্থ উপচার ধ্যানে সেখানে সুখ *(সুখ)* নেই, কেবল আছে বিতর্ক *(বিতক্ক)*, বিচার *(বিচার)*, উপেক্ষা *(উপেকখা)* এবং একাগ্রতা *(একগ্গতা)*। যদিও তারা একই নিমিত্তকে বিষয়বস্তু হিসেবে নেয়, প্রত্যেকটি উপচার ধ্যানে তারা আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

ধ্যানাঙ্গগুলো প্রথম উপচার ধ্যানে দৈহিক বেদনাকে *(কায়িক-দুকখ-বেদনা)* চেপে রাখে, দ্বিতীয়টাতে মানসিক কষ্টকে *(দোমনস্স-বেদনা)* চেপে রাখে, তৃতীয়টিতে দৈহিক সুখের অনুভূতিকে *(কায়িক-সুখ-বেদনা)*, এবং চতুর্থটিতে মানসিক আনন্দ বা সুখকে *(সোমনস্স-বেদনা)* চেপে রাখে। এই ধাপে শ্বাসপ্রশ্বাস সবচেয়ে সূক্ষ্ম, প্রায় থেমে যাওয়ার মতো। চতুর্থ অর্পণা ধ্যানে শ্বাসপ্রশ্বাস সম্পূর্ণ থেমে যায়।

আমরা অর্পণা ধ্যানগুলোকে ধ্যানাঙ্গগুলো দেখেও ভাগ করতে পারি। প্রথম অর্পণা ধ্যানে পাঁচটি ধ্যানাঙ্গ থাকে : বিতর্ক, বিচার, প্রীতি, সুখ এবং একাগ্রতা। দ্বিতীয়টাতে থাকে তিনটি : প্রীতি, সুখ এবং একাগ্রতা। তৃতীয়টাতে দুটি : সুখ এবং একাগ্রতা। চতুর্থটিতেও দুটি : উপেক্ষা এবং একাগ্রতা। ধ্যানাঙ্গগুলো দেখে আমরা বলতে পারি, 'এটি প্রথম অর্পণা ধ্যান' এবং 'এটি দ্বিতীয় অর্পণা ধ্যান' ইত্যাদি। এখানেও মনোযোগ বেড়ে যায় ধাপে ধাপে। চতুর্থ ধ্যানে মনোযোগ থাকে সর্বোচ্চ। কীভাবে সর্বোচ্চ হয়? আপনি নিজেই দেখুন না। অনেক ভাবনাকারী তথ্য দেন যে চতুর্থ ধ্যান হচ্ছে শ্রেষ্ঠ এবং সবচেয়ে শান্ত।

প্রশ্ন ৩.৫ : *কোন কোন অবস্থায় একজন ভাবনাকারী অর্পণা ধ্যান থেকে উপচার ধ্যানে পড়ে যায়? কোন কোন অবস্থায় একজন ভাবনাকারী উপচার ধ্যান থেকে অর্পণা ধ্যান লাভ করতে পারে?*

উত্তর ৩.৫ : যদি ভাবনাকারী তার ধ্যানকে সম্মান না করে, প্রতিভাগ-নিমিত্তকে সম্মান না করে অন্যান্য বিষয় নিয়ে মেতে থাকে, তখন অনেক নীবরণ *(নীবরণ)* উৎপন্ন হবে। যৌন আকাঙ্ক্ষা এবং ঘৃণার চিন্তা উৎপন্ন হবে। এগুলো হচ্ছে অনভিজ্ঞ তথা অযথাযথ মনোযোগ *(অয়োনিসো মনসিকার)*। এই বিষয়গুলো মনোযোগকে কমিয়ে দেয়, কারণ শুভ এবং অশুভ গুণগুলো সব সময় বিপরীত। যখন শুভ গুণগুলো সবল ও শক্তিশালী, তখন অশুভ গুণগুলো অনেক দূরে থাকে। আর যখন অনভিজ্ঞ মনোযোগের কারণে অশুভ

গুণগুলো প্রবল ও শক্তিশালী হয়, তখন শুভ গুণগুলো অনেক দূরে থাকে। শুভ ও অশুভ ধর্মগুলো এক চিত্তক্ষণে অথবা চিন্তার প্রক্রিয়ায় একই সাথে উৎপন্ন হতে পারে না।

এখানে আমি একটু ব্যাখ্যা করতে চাই বিচক্ষণ তথা যথাযথ মনোযোগ *(য়োনিসো-মনসিকার)* এবং অবিচক্ষণ তথা অযথাযথ মনোযোগের *(অয়োনিসো-মনসিকার)* ব্যাপারে। যখন ভাবনাকারী শ্বাসপ্রশ্বাস ভাবনা অনুশীলন করেন, এবং স্বাভাবিক শ্বাসপ্রশ্বাসের উপরে মনোযোগ স্থাপন করেন, সেটি হচ্ছে বিচক্ষণ মনোযোগ। যখন উদগ্রহ-নিমিত্ত অথবা প্রতিভাগ-নিমিত্ত আবির্ভূত হয়, এবং ভাবনাকারী তার মনোযোগ দেন নিমিত্তে, তখনো এটি বিচক্ষণ মনোযোগ। যদি তিনি বিদর্শন ভাবনায় দেখেন : 'এটি রূপ', 'এটি নাম', 'এটি কারণ', 'এটি তার ফল', 'এটি অনিত্য', 'এটি দুঃখ', অথবা 'এটি অনাত্ম', তার মনোযোগও তখন বিচক্ষণ মনোযোগ। কিন্তু যদি তিনি দেখেন : 'এটি পুরুষ, নারী, পুত্র, কন্যা, বাবা, মা, দেবতা, ব্রহ্মা, পশু ইত্যাদি'; 'এটি সোনা, টাকা, ইত্যাদি' তাহলে তার মনোযোগ হচ্ছে অবিচক্ষণ মনোযোগ। সোজা কথায়, আমরা বলতে পারি যে, বিচক্ষণ মনোযোগের কারণে অনেক শুভ গুণ উৎপন্ন হয়, এবং অবিচক্ষণ মনোযোগের কারণে অনেক অশুভ গুণ উৎপন্ন হয়। যদি আপনার ভাবনা চর্চার সময় অবিচক্ষণ মনোযোগ আসে, তাহলে তার পিছে পিছে নিশ্চিত আসবে নীবরণ এবং ক্লেশগুলো। সেগুলো অশুভধর্ম। এই অশুভ ধর্মগুলো মনোযোগকে কমিয়ে দেয়, অথবা আগের অবস্থায় নিয়ে যায় এবং শেষে পথ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্যুত করে দেয়।

যদি আপনি ভাবনার বিষয়বস্তুতে বিচক্ষণ মনোযোগ দেন, বার বার, তাহলে শুভ ধর্মগুলো উৎপন্ন হয় এবং বৃদ্ধি পায়। উদাহরণস্বরূপ, ধ্যানের শুভ ধর্মগুলো হচ্ছে এই শুভ ধর্মগুলোর মধ্যে অন্যতম। তাই, আপনি যদি নিমিত্তে মনোযোগ দেন, যেমন আনাপানের প্রতিভাগ-নিমিত্তে, বার বার, তাহলে এটি শুভ মনোযোগ। যদি আপনি পূর্ণ শক্তিতে শুভ মনোযোগ বৃদ্ধি করেন, তাহলেই আপনি উপচার ধ্যান থেকে অর্পণা ধ্যান লাভ করবেন।

প্রশ্ন ৩.৬ : *যখন একজন মানুষ মরে যায়, তখন অতীতের শুভ বা অশুভ কর্মের কারণে একটি কর্মনিমিত্ত আসতে পারে। ধ্যানেও মাঝেমধ্যে এমন হয়, যখন অতীতের ঘটনাগুলো, যেগুলো ভাবনাকারী ভুলেই গেছে, সেগুলো চলে আসে। দুটো ঘটনা কি একই?*

উত্তর ৩.৬ : কিছুটা মিল থাকতে পারে, কিন্তু তা কেবল বিশেষ বিশেষ

ক্ষেত্রে। অতীতে যার মৃত্যু খুব দ্রুত ঘটেছে, তার কর্মনিমিত্ত উৎপত্তির সাথে এর কিছুটা মিল থাকতে পারে।

প্রশ্ন ৩.৭ : *ধ্যানের সময় ত্রিশ বছরেরও আগের ঘটনার ছবি ভেসে ওঠে, যা ভাবনাকারী ভুলেই গিয়েছিল। এটি কি স্মৃতির অভাবে হয়, যার ফলে মন বিষয়বস্তু থেকে দূরে সরে যায়?*

উত্তর ৩.৭ : হতে পারে। তবে এটি মনোযোগের *(মনসিকার)* কারণেও হতে পারে। অনেক ভাবনাকারীই মনোযোগের বিষয়ে জানে না। নামের উপর ভাবনা করলে তবেই তারা এটি বুঝতে পারে। চিন্তা-প্রক্রিয়া খুব দ্রুত ঘটে, তাই তারা বুঝে না যে এই ছবিগুলো আসলে মনোযোগের কারণেই হচ্ছে। বুদ্ধের অভিধর্মমতে, কোনো ধর্মই কারণ ছাড়া, নিজে নিজে উৎপত্তি হয় না। কারণ সমস্ত সৃষ্টিই শর্তাধীন।

প্রশ্ন ৩.৮ : *মৃত্যুর সময়ে যদি কোনো ব্যক্তির শক্তিশালী স্মৃতি থাকে, তখন সে কি অতীতের কুশল বা অকুশল কর্মের কর্মনিমিত্ত উৎপত্তি হওয়া থেকে রোধ করতে পারে?*

উত্তর ৩.৮ : প্রবল, শক্তিশালী স্মৃতি এমন নিমিত্তের উৎপত্তিকে রোধ করতে পারে; তবে কথা হচ্ছে, প্রবল ও শক্তিশালী স্মৃতি কী? যদি ভাবনাকারী ধ্যানে প্রবেশ করে এবং সম্পূর্ণ ধ্যানে নিমগ্ন থাকে মৃত্যুর সময় পর্যন্ত, তখন আপনি বলতে পারেন যে সেই ধ্যান প্রবল ও শক্তিশালী। সেই ধরনের স্মৃতি অকুশল-নিমিত্ত অথবা কাম-সুগতি ভূমির কুশল-নিমিত্ত উৎপত্তি হওয়া থেকে রোধ করতে পারে। এটি কেবল ধ্যানের বিষয়বস্তুকে গ্রহণ করে, যেমন উদাহরণস্বরূপ আনাপান বা সাদা কৃৎস্নের প্রতিভাগ-নিমিত্তকে।

আরেক ধরনের প্রবল ও শক্তিশালী স্মৃতি হচ্ছে বিদর্শন-জ্ঞানসংশ্লিষ্ট স্মৃতি। যদি ভাবনাকারীর বিদর্শন-জ্ঞান হয় সংস্কারোপেক্ষা জ্ঞান, তখন তার স্মৃতি হয় প্রবল ও শক্তিশালী আর ভাবনাকারীর নিমিত্ত তখন হয় কুশল-নিমিত্ত। এমন স্মৃতি অকুশল-নিমিত্তগুলো আবির্ভূত হওয়া থেকে রোধ করতে পারে, সেই সাথে অন্যান্য কুশল-নিমিত্তগুলোকেও বিদর্শন-নিমিত্তের স্থানে জায়গা করে নেওয়াকে রোধকরে। বিদর্শন-নিমিত্ত হচ্ছে কোনো বেছে নেওয়া সংস্কারের অনিত্য, দুঃখময় ও অনাত্ম স্বভাব। সে এই বিদর্শন জ্ঞানকে মরণাসন্ন-জবনচিত্তের বিষয়বস্তু হিসেবে নিয়ে মারা যেতে পারে। এটা দেব-প্রতিসন্ধির জন্ম দেয়, ফলে সে তৎক্ষণাৎ দেবতা হিসেবে জন্ম নেয়।

এ ধরনের ভাবনাকারীদের উদ্দেশ্যে করেই অঙ্গুত্তর নিকায়ের চতুষ্ক নিপাতের সোতনুগত সুত্তে বুদ্ধ বলেছেন :

'সো মুট্ঠস্সতি কালং কুরুমানো অঞ্ঞতরং দেবনিকায়ং উপপজ্জতি।

তস্স তত্থ সুখিনধম্মপদা প্লবন্তি। দন্ধো ভিকখবে সতুপ্পাদো, অথ সো সত্তো খিপ্পংয়েব বিসেসগামী হোতি।'

'ভিক্ষুগণ, যদি কোনো সাধারণ লোক মৃত্যুবরণ করে, সে কোনো একটা দেবলোকে জন্ম নেয়, যেখানে সমস্ত সংস্কারগুলো তার মনে ভেসে ওঠে। তার হয়তো ধর্মকে নিয়ে ভাবতে বা বিদর্শন করতে দেরী হয়, কিন্তু সে নির্বাণ লাভ করে খুব দ্রুত।' কেন সংস্কারগুলো তার মনে পরিষ্কারভাবে ভেসে ওঠে? কারণ অতীতের মৃত্যুকালীন চেতনা ও তার পরবর্তী দেবজন্মের ভবাঙ্গ, দুটোই একই বিষয়বস্তু গ্রহণ করে, এক্ষেত্রে সেই বিষয়বস্তু হচ্ছে সংস্কারগুলোর অনিত্য, দুঃখময় ও অনাত্ম স্বভাব। তাই গৃহকর্তা অর্থাৎ ভবাঙ্গ ইতিমধ্যেই বিদর্শন বিষয়বস্তুকে জেনে ফেলেছে। এই সুত্তমতে, বিদর্শন-জ্ঞানসমন্বিত শক্তিশালী স্মৃতি অশুভ চিহ্নগুলোর আবির্ভাবকে রোধ করে, সাথে সাথে শুভ চিহ্নগুলোকেও বিদর্শন চিহ্নের জায়গা দখল করতে দেয় না। তাই আপনার মৃত্যু হওয়ার আগে এ ধরনের স্মৃতি জাগানোর চেষ্টা করা উচিত।

এর একটা উদাহরণ হচ্ছে *সক্কপঞহ সুত্ত*, যেখানে তিনজন ভিক্ষু সম্বন্ধে বলা হয়েছে যারা শমথ ও বিদর্শন চর্চা করেছিল। তাদের আচার ব্যবহার ছিল মার্জিত এবং তাদের ধ্যানও ছিল ভালো, কিন্তু তাদের মন ঝুঁকে ছিল নারী গন্ধর্ব জীবনের প্রতি। এই গন্ধর্বরা হচ্ছে স্বর্গের শিল্পী ও নর্তকীর দল। যখন তারা মরে গেল, তারা গন্ধর্ব হিসেবে জন্ম নিল। তারা খুব সুন্দর ও চোখ ধাঁধানো গন্ধর্ব মেয়ে হিসেবে জন্মগ্রহণ করল, যাদের দেখতে ষোড়শী কন্যা বলে মনে হতো। তাদের ভিক্ষুজীবনের সময়ে এক মহিলা ছিল। এই তিনজন ভিক্ষু তার বাড়িতে প্রতিদিন পিন্ডচারণে যেত, আর তাকে ধর্ম শিক্ষা দিত। মহিলাটি স্রোতাপন্ন হয়েছিল এবং মৃত্যুর পরে দেবরাজ শক্রের পুত্র গোপক হিসেবে জন্ম নিল। তিনজন গন্ধর্ব মেয়ে শক্রের পুত্রের জন্য নাচল, গাইল। গোপক দেখল যে তারা খুবই সুন্দরী এবংতাদের চোখ ঝলসানো রূপ। সে ভাবলো : 'তারা খুবই সুন্দরী এবং চোখ ধাঁধানো রূপের অধিকারী। কোন কর্মের ফলে এমন হয়েছে তারা?' সে দেখল যে গতজন্মে সে যখন মহিলা ছিল, তারা ছিল তিনজন ভিক্ষু। সে জানত তাদের সংযম, ধ্যান ও প্রজ্ঞা খুবই উচ্চ স্তরের। তাই সে তাদের পূর্বজন্মের কথা স্মরণ করিয়ে দিল। সে বলল, 'যখন তোমরা বুদ্ধের শিক্ষাগুলো শুনেছিলে আর ধর্ম চর্চা করেছিলে, তখন তোমাদের চোখ কোথায় ছিল, আর কানগুলো কোন দিকে ছিল?'

দুজন গন্ধর্ব তাদের অতীত জন্মের কথা স্মরণ করল এবং লজ্জিত হলো। তারা শমথ এবং বিদর্শন আরম্ভ করল, শীঘ্রই অনাগামীমার্গফল লাভ করল

এবং সেখানেই মারা গেল। সেখান থেকে তারা সুদ্ধাবাস ব্রহ্মলোকে জন্ম নিল, আর সেখানেই অর্হত্ত্ব লাভ করল। তৃতীয় ভিক্ষুটি লজ্জা পেল না, সে গন্ধর্বই থেকে গেল।

তাই, জীবন বীমা কোম্পানির সাথে যোগাযোগের কোনো দরকার নেই। এ ধরনের স্মৃতিই শ্রেষ্ঠ বীমা।

প্রশ্ন ৩.৯ : *চার ধাতু-ভাবনা চর্চা করতে গিয়ে এবং বারোটি লক্ষণকে বুঝতে গিয়ে শুরু থেকেই কি ক্রমান্বয়ে যাওয়ার দরকার আছে; যেমন : কাঠিন্য, কর্কশতা, ভারীত্ব এই ক্রমে? নাকি যেকোনো একটি লক্ষণ বেছে নিয়ে ভাবনা শুরু করা যায়?*

উত্তর ৩.৯ : প্রথমে যে লক্ষণটি বুঝতে সুবিধে হয়, সেটি দিয়েই আমরা শুরু করতে পারি। কিন্তু যখন আমরা সমস্ত লক্ষণগুলোকে সহজে ও পরিষ্কার করে বুঝতে পারব, তখন আমাদের অবশ্যই বুদ্ধের দেয়া ক্রম অনুসরণ করতে হবে : মাটি-স্বভাব *(পঠবীধাতু)*, পানি-স্বভাব *(আপোধাতু)*, অগ্নি-স্বভাব *(তেজোধাতু)*, এবং বায়ু-স্বভাব *(বায়োধাতু)*। কারণ, এই ক্রমটি প্রবল ও শক্তিশালী মনোযোগের জন্ম দেয়। যখন আমরা কলাপগুলো দেখি, আর সেগুলোর প্রত্যেকটিতে সহজে এই চারটি ধাতুকে সনাক্ত করতে পারি, তখন ক্রমটা এত গুরুত্বপূর্ণ নয়। যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ তা হচ্ছে তাদের একসাথে চিনতে পারা।

কেন? কলাপগুলোর আয়ুষ্কাল খুব অল্প। তাদের আয়ু এক সেকেন্ডের শতকোটি ভাগের এক ভাগেরও কম সময় হতে পারে। তাই একটি কলাপের মধ্যে চারটি ধাতুকে দেখতে গিয়ে সেখানে 'মাটি, পানি, আগুন, বায়ু' এভাবে আবৃত্তির সময় পাওয়া যায় না। তাই আমাদের অবশ্যই তাদের যুগপৎ দেখতে হবে, আবার ক্রমান্বয়েও।

প্রশ্ন ৩.১০ : *চার ধাতু-ভাবনার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি তার শরীরে চারটি ধাতুর ভারসাম্য আনতে পারে। মাঝেমধ্যে দেহের চার উপাদান ভারসাম্যহীন হলে কেউ কেউ অসুস্থ হয়। যখন কোনো একজন অসুস্থ, সে কি তার অসুস্থতা দূর করার জন্য শক্তিশালী স্মৃতি নিয়ে চার ধাতু-ভাবনা চর্চা করতে পারবে?*

উত্তর ৩.১০ : অনেক ধরনের অসুস্থতা আছে। কিছু কিছু অসুখ আছে যা অতীত কর্মের কারণে হয়, যেমন বুদ্ধের পিঠের ব্যথা। কিছু কিছু অসুখ হচ্ছে ধাতুর ভারসাম্যহীনতার কারণে। অতীত কর্মের কারণে উৎপন্ন অসুখ চার ধাতুর ভারসাম্য করেও আরোগ্য হয় না। কিন্তু কিছু কিছু অসুখ, যেগুলো ধাতুর ভারসাম্যহীনতার কারণে হয়, সেগুলো চলে যেতে পারে যখন

ভাবনাকারী চার ধাতুর মধ্যে ভারসাম্য আনেন।

আরও অসুখ আছে যেগুলো খাদ্য, তাপমাত্রা বা ঋতু *(উতু)* অথবা মনের *(চিত্ত)* কারণে হয়। যদি মানসিক কারণে কোনো অসুখ হয়, তাহলে মনটাকে ভালো করতে পারলে অসুখও ভালো হতে পারে। যদি তাপমাত্রা বা তেজধাতুর কারণে অসুখ দেখা দেয়, যেমন ক্যান্সার, ম্যালেরিয়া ইত্যাদি; সেগুলো কেবল ওষুধ সেবনের দ্বারা ভালো হয়। অনুপযুক্ত খাবারের মাধ্যমে সৃষ্ট অসুখের বেলায়ও সেই একই কথা।

প্রশ্ন ৩.১১ : *চতুর্থ ধ্যান লাভ এবং অজ্ঞানতা (অবিজ্জা) নির্মূলের আগে, খারাপ অভ্যাসের কারণে অনেক অশুভ চিন্তার উদয় হয়। উদাহরণস্বরূপ, আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমরা জানি যে মাঝে মাঝেই আমাদের মনে লোভ ও ঘৃণার উদয় হয়। সেগুলো দূর করার জন্য কি আমরা বিরূপতা-ভাবনা (অসুভ), অথবা মৈত্রী-ভাবনা ব্যবহার করব? নাকি সেগুলোকে অগ্রাহ্য করে আমাদের ভাবনার বিষয়বস্তুতে মনোযোগ দেব, এবং তাদের আপনাআপনি চলে যেতে দেব?*

উত্তর ৩.১১ : খারাপ কর্মের সুপ্ত কারণ হচ্ছে অজ্ঞানতা। আর কাছাকাছি কারণ হচ্ছে অবিচক্ষণ মনোযোগ। অবিচক্ষণ মনোযোগ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যদি আপনি অবিচক্ষণ মনোযোগকে বিচক্ষণ মনোযোগ দিয়ে পাল্টে দিতে পারেন, লোভ ও ঘৃণা কিছু সময়ের জন্য সরে যাবে, অথবা বিচক্ষণ মনোযোগ যদি খুব প্রবল ও শক্তিশালী হয়, সেগুলো এমনকি চিরতরেও চলে যেতে পারে। আমরা ইতিমধ্যে বিচক্ষণ ও অবিচক্ষণ মনোযোগ নিয়ে আগের প্রশ্নে আলোচনা করেছি।

আপনি বিরূপতা-ভাবনা অথবা মৈত্রী-ভাবনা ব্যবহার করতে পারেন সেগুলো দূর করার জন্য। এই ভাবনাগুলোও বিচক্ষণ মনোযোগ। বিদর্শন হচ্ছে কলুষতাগুলো দূর করার জন্য শ্রেষ্ঠ অস্ত্র। বিদর্শন শ্রেষ্ঠ বিচক্ষণ মনোযোগও বটে।

প্রশ্ন ৩.১২ : *ভবাঙ্গ কীভাবে কামলোক বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতে, রূপলোক বা সূক্ষ্ম-বস্তুর জগতে, অরূপলোক বা বস্তুহীন জগতে এবং লোকোত্তর জগতে কাজ করে? সেয়াদ কি দয়া করে উদাহরণ দিয়ে একটু ব্যাখ্যা করবেন?*

উত্তর ৩.১২ : প্রথম তিনটি জগতে ভবাঙ্গের কাজ একই। অর্থাৎ এটি উৎপত্তি হয়, যাতে একটি জীবনের চিত্তক্ষণগুলো না থামে। কারণ এই জীবনের কারণ যে কর্ম, সেই কর্ম এখনো নিঃশেষ হয়নি। ভবাঙ্গের বিষয়বস্তু কোনো একটি কর্মও হতে পারে, কর্মনিমিত্ত হতে পারে অথবা গতিনিমিত্তও হতে পারে। রূপলোক এবং অরূপলোকের ক্ষেত্রে ভবাঙ্গের বিষয়বস্তুরূপে

সাধারণত কেবল কর্ম অথবা কর্মনিমিত্তগুলো থাকে, কোনো গতি-নিমিত্ত থাকে না। উদাহরণস্বরূপ, একজনের ভবাঙ্গের বিষয়বস্তু যদি হয় ক্যায়িকথিও বিহার, অন্যদিকে আরেকজনের ভবাঙ্গের বিষয়বস্তু হতে পারে শোয়েডাগন বিহার। যখন আমরা 'লোকোত্তর জগৎ' বলি, এখানে 'জগৎ' শব্দটা কেবল রূপক মাত্র। প্রকৃতপক্ষে এটা কোনো জায়গাই নয়। 'লোকোত্তর জগৎ' বলতে আমরা বুঝি কেবল চারটি মার্গ, চারটি ফল, এবং নির্বাণকে, কোনো জায়গাকে নয়।

চারটি মার্গ ও চারটি ফলচিত্তগুলো ভবাঙ্গচিত্ত নয়। নির্বাণে কোনো নামরূপ নেই বিধায় সেখানেও কোনো ভবাঙ্গ থাকতে পারে না। রূপাবচর-বিপাক-ধ্যানে ভবাঙ্গের বিষয়বস্তু হচ্ছে আনাপান ধ্যানের মতোই আনাপান প্রতিভাগ-নিমিত্ত। বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তনের অরূপাবচর-বিপাক-ধ্যানের ভবাঙ্গের বিষয়বস্তু হচ্ছে আকাশ-অনন্ত-আয়তন ধ্যানচিত্ত। এটি কর্ম। এর কোনো গতিনিমিত্ত নেই।

প্রশ্ন ৩.১৩ : *লৌকিক ও লোকোত্তর ধ্যানগুলোর মধ্যে পার্থক্য কী?*

উত্তর ৩.১৩ : লৌকিক ধ্যান হচ্ছে চারটি রূপাবচর-ধ্যান এবং চারটি অরূপাবচর ধ্যান, অর্থাৎ অষ্ট সমাপত্তি। লোকোত্তর ধ্যানগুলো হচ্ছে মার্গফল জ্ঞানের সাথে সংশ্লিষ্ট ধ্যানের অঙ্গ। যখন আপনি সংস্কারগুলোকে, উদাহরণস্বরূপ, লৌকিক রূপাবচর প্রথম ধ্যানকে অনিত্য, দুঃখময় ও অনাত্ম হিসেবে উপলব্ধি করবেন, এবং তখন যদি আপনি নির্বাণকে দেখেন, আপনার মার্গজ্ঞান তখন প্রথম ধ্যান। এটি একটি লোকোত্তর ধ্যান।

কেন? সাধারণ রূপাবচর প্রথম ধ্যানে, বিদর্শনের বিষয়বস্তু হিসেবে পাঁচটি ধ্যানাঙ্গ ছিল : বিতর্ক, বিচার, প্রীতি, সুখ ও একাগ্রতা। লোকোত্তর ধ্যানেও সেই একই পাঁচটি ধ্যানাঙ্গ। এখানে পার্থক্য কেবল মার্গ ও ফলের। সেই মার্গ ও ফল হচ্ছে প্রথম ধ্যানের মার্গ এবং প্রথম ধ্যানের ফল। অন্যান্য ধ্যানগুলোও একইভাবে মার্গ ও ফলের বিষয়বস্তু হতে পারে। ❑

[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[দেশনা ৪]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]

কীভাবে রূপকে দেখবেন

আজ আমি ব্যাখ্যা করব কীভাবে বিদর্শন ভাবনা করতে হয়। শুরু করব চারি ধাতু ভাবনা ও বিভিন্ন প্রকার রূপের বিশ্লেষণ দিয়ে। বিদর্শন ভাবনার দুটো পথ আছে। প্রথম পথটি হচ্ছে কোনো একটি শমথ ভাবনায়, যেমন- আনাপানস্মৃতিতে চতুর্থ ধ্যান লাভ করে, এরপর বিদর্শনে নামা। আরেকটা হচ্ছে চার ধাতু ভাবনায় উপচার ধ্যান লাভ করে বিদর্শন শুরু করা। উভয় পথেই কিন্তু ভাবনাকারীকে বিদর্শনের আগে চার ধাতু ভাবনা করতে হয়। আমি মায়ানমারে আমার ভাবনা কেন্দ্রগুলোতে দুটো পদ্ধতিতেই ভাবনা শেখাই।

চার ধাতু ভাবনা

পালি গ্রন্থগুলোতে দুভাবে চারধাতু ভাবনা করার কথা বলা হয়েছে : সংক্ষেপে এবং বিস্তারিতভাবে। সংক্ষিপ্তটা হচ্ছে যাদের তীক্ষ্ণ প্রজ্ঞা আছে তাদের জন্য, আর বিস্তারিতটা হচ্ছে যাদের সংক্ষিপ্ত উপায়ে বুঝতে সমস্যা, তাদের জন্য। বুদ্ধ মহাসতিপট্ঠান সুত্রে বলেছেন :

"ভিক্ষু তার এই শরীরকে দেখে, যে অবস্থায় এটাকে রাখা হোক না কেন, সেটাতে বিদ্যমান ধাতুপুঞ্জকে দেখে এভাবে : 'এই শরীরে আছে পৃথিবীধাতু, আপধাতু, তেজধাতু এবং বায়ুধাতু।'"

বিশুদ্ধিমার্গে সেটা আরও বিস্তৃত ব্যাখ্যা করা আছে :

'প্রথমত, তীক্ষ্ণ প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি, যে এই ভাবনা করতে চায়, তার কোনো নির্জন স্থানে যাওয়া উচিত। এরপর তার এই সম্পূর্ণ দেহের প্রতি মনোযোগ দেওয়া উচিত এবং সংক্ষেপে এভাবে ধাতুগুলোকে চিনে নেওয়া উচিত, 'এই দেহের যা কিছু কঠিন বা কর্কশ, সেগুলো পৃথিবী ধাতু। যা কিছু প্রবহমান বা জড়িয়ে আছে, সেগুলো আপধাতু। যা কিছু পাকছে বা উত্তপ্ত, সেগুলো

তেজধাতু। যা কিছু ঠেলছে বা ধরে রাখছে, সেগুলো বায়ুধাতু।' তার এটাতে পূর্ণ মনোযোগ দেওয়া উচিত, বার বার পর্যালোচনা করা উচিত এই বলে, 'পৃথিবীধাতু, আপধাতু, তেজধাতু, বায়ুধাতু।' অর্থাৎ তার এই দেহকে দেখা উচিত সামান্য ধাতুসমষ্টি হিসেবে, আত্মাহীন হিসেবে, কোনো সত্ত্ব হিসেবে নয়। এভাবে প্রচেষ্টা করলে অচিরেই ধ্যান উৎপন্ন হবে, যা প্রজ্ঞা দ্বারা আরও পরিপুষ্ট হয়, কেননা প্রজ্ঞা তার জ্ঞানের আলোয় ধাতুগুলোর শ্রেণিবিন্যাসকে আলোকিত করে। এই ধ্যান শুধু উপচার ধ্যান পর্যন্ত। অর্পণা ধ্যান পর্যন্ত এটি পৌঁছায় না।

অন্যভাবে, স্থবির সারিপুত্র কর্তৃক দেহের চারটি অংশের কথা বলা হয়েছে। চারি মহাধাতুতে কোনো সত্ত্ব নেই এটা দেখানোর উদ্দেশ্যে এভাবে বলা হয়েছে, 'যখন কোনো শূন্যস্থান হাড়, স্নায়ু, মাংস ও চামড়া দ্বারা আবদ্ধ হয়, তখন সেটিকে রূপ বলা হয়।' আর এগুলোর প্রত্যেকটিকে জ্ঞানের মাধ্যমে আলাদা করে দেখা উচিত, আর উপর্যুক্ত নিয়মে এদের জানা উচিত : 'এই দেহে যা কিছু কঠিন...।'

পা-অক ভাবনা কেন্দ্রে যেভাবে শেখানো হয়, সেভাবে সারা দেহের চারটি ধাতুর বারোটি স্বভাবকে জেনে নিন :

পৃথিবীধাতু : কাঠিন্য, কর্কশতা, ভারীত্ব, কোমলতা, মসৃণতা, লঘুত্ব।

আপধাতু : প্রবাহ, সংসক্তি।

তেজধাতু : তাপ, শৈত্য।

বায়ুধাতু : ধারকত্ব, চাপ।

এই ভাবনা করতে গিয়ে আপনাকে অবশ্যই এই বারোটি স্বভাবের প্রত্যেকটিকে কী করে দেখতে হয় তা শিখতে হবে। সাধারণত নবীন শিক্ষার্থীদের প্রথমে সেই স্বভাবগুলোকে শেখানো হয় যেগুলো দেখা সহজ। কঠিনগুলো পরে শেখানো হয়। সেগুলো সাধারণত নিচের ক্রমানুসারে হয় : চাপ, কাঠিন্য, কর্কশতা, ভারীত্ব, ধারকত্ব, লঘুত্ব, তাপ, শৈত্য, প্রবাহ, সংসক্তি। প্রত্যেক স্বভাবকে প্রথমে অবশ্যই দেহের কোনো না কোনো অংশে চিহ্নিত করতে হবে এবং এরপর সারা দেহ জুড়ে চিহ্নিত করতে হবে।

১. চাপকে চিহ্নিত করতে হলে, প্রথমে স্পর্শের মাধ্যমে সচেতন হোন। আপনি যখন শ্বাস নেন ও নিঃশ্বাস ফেলেন, সেই সময়ে মাথার কেন্দ্রে স্পর্শের অনুভূতিকে, চাপের অনুভূতিকে খেয়াল করুন। যখন আপনি এটা অনুভব করতে পারবেন, এর উপরে মনোযোগ দিন যতক্ষণ না এটি আপনার মনে পরিষ্কার হয়ে ধরা দেয়। এর পরে মাথা থেকে মনোযোগ নিয়ে যান দেহের

অন্য কোনো অংশে, যা মাথার কাছাকাছি। সেখানেও চাপের অনুভূতিকে খেয়াল করুন। এভাবে আপনি চাপকে উপলব্ধি করতে পারবেন প্রথমে মাথায়, এরপরে ঘাড়ে, ধড়ে, হাতে, পায়ে ও পায়ের পাতায়। এভাবে বার বার চর্চা করুন, অনেকবার চর্চা করুন, যতক্ষণ না দেহের যেখানেই আপনি মনোযোগ দেন না কেন, সহজেই চাপকে দেখতে পান।

যদি মাথার কেন্দ্রস্থলে শ্বাসপ্রশ্বাসের চাপকে উপলব্ধি করা সহজ না হয়, তাহলে যখন বুক ফুলবে, তখন চাপটাকে অনুভব করার চেষ্টা করুন। অথবা শ্বাসপ্রশ্বাসের সময়ে পেটের বাড়া-কমাকে অনুভব করার চেষ্টা করুন। যদি সেটাও পরিষ্কার অনুভব করতে না পারেন, তাহলে নাড়ির স্পন্দন অনুভব করার চেষ্টা করুন, অথবা অন্য কোনো উপায়ে সহজে অনুভব করা যায় এমন চাপকে জানার চেষ্টা করুন। যেখানেই নড়াচড়া আছে, সেখানেই চাপ আছে। আপনি যেখান থেকেই শুরু করেন না কেন, অবশ্যই ধীরে ধীরে আপনাকে এটা বুঝে নিতে হবে, যাতে করে সারা দেহের মাথা থেকে পা পর্যন্ত সবখানে চাপকে উপলব্ধি করতে পারেন। কিছু কিছু জায়গায় এটি সহজেই বুঝা যাবে। অন্যান্য জায়গাগুলোতে চাপটা থাকবে সূক্ষ্মভাবে, কিন্তু এটি সারা দেহ জুড়ে বিদ্যমান থাকবেই।

২. যখন আপনি চাপকে উপলব্ধি করতে পারবেন, তখন কাঠিন্যকে খুঁজতে থাকুন। শুরু করুন দাঁতের কাঠিন্যকে অনুভব করার মধ্য দিয়ে। শক্ত করে কামড় দিন দুপাটি দাঁতের মধ্যে। অনুভব করুন তারা কেমন কঠিন ও শক্ত। যখন আপনি এটি অনুভব করতে পারবেন, এবার সারা দেহের মাথা থেকে পা পর্যন্ত এমন কাঠিন্য খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করুন, যেভাবে চাপকে উপলব্ধি করেছিলেন, ঠিক সেই একই পদ্ধতিতে। তবে ইচ্ছেকৃতভাবে দেহকে শক্ত করার চেষ্টা করবেন না।

সারা দেহ জুড়ে কাঠিন্যকে উপলব্ধি করতে সক্ষম হলে এবার আবার চাপকে খুঁজুন সারা দেহে। একবার চাপ, একবার কাঠিন্য, এভাবে পালাক্রমে চর্চা করুন বার বার। মাথা থেকে পা পর্যন্ত চাপকে উপলব্ধি করুন, এরপর উপলব্ধি করুন কাঠিন্যকে। অনেকবার এমনভাবে চর্চা করুন যতক্ষণ না আপনি নিজের উপর সন্তুষ্ট হন যে এবার আপনি পারবেন।

৩. এবার দেখুন কর্কশতাকে। আপনার জিহ্বাকে দাঁতের উপর ঘষুন, অথবা হাত দিয়ে চামড়ার উপরে ঘষুন এবং কর্কশতাকে উপলব্ধি করুন। এবার আগের মতোই ক্রমান্বয়ে সারা দেহে কর্কশতাকে খুঁজে নিন। যদি কর্কশতাকে অনুভব করতে না পারেন, তাহলে আবার চাপ ও কাঠিন্যকে

অনুভব করার চেষ্টা করুন। এবার হয়তো তাদের সাথে কর্কশতাকেও উপলব্ধি করতে পারবেন। সেটা হলে এবার চাপ, কাঠিন্য এবং কর্কশতাকে আবার একটি একটি করে উপলব্ধি করার চেষ্টা করুন বার বার, পালাক্রমে, সারা দেহ জুড়ে, যতক্ষণ না আপনি সন্তুষ্ট হন।

৪. এবার ভারীত্বকে খুঁজুন। আপনার কোলে এক হাতকে আরেক হাতের উপর রাখুন। উপরের হাতের ওজনকে (ভারীত্বকে) অনুভব করার চেষ্টা করুন। তা না হলে সামনে ঝুঁকে মাথার ভারীত্বকে অনুভব করার চেষ্টা করুন। আগের নিয়মেই সারা দেহে ভারীত্বকে খুঁজে নিন। এবার পালাক্রমে চারটি স্বভাব : চাপ, কাঠিন্য, কর্কশতা এবং ভারীত্বকে সারা দেহে উপলব্ধি করুন যতক্ষণ না সন্তুষ্ট হন।

৫. এবার ধারকত্বকে খুঁজুন। আপনার পিঠকে শিথিল করে দিন, এতে করে আপনার শরীর সামনে ঝুঁকবে। এবার এটাকে সোজা করুন, এবং পিঠটাকে খাড়া রাখুন। যে শক্তি আপনার শরীরকে খাড়া রাখে সেটাই হচ্ছে ধারকত্ব। এভাবে আগের নিয়মেই সারা দেহে ধারকত্বকে খুঁজে নিন। যদি এটি পরিষ্কার উপলব্ধি না হয়, এটিকে কাঠিন্যের সাথে খুঁজে নেয়ার চেষ্টা করুন, তখন এটিকে খুঁজে নেওয়া সহজ হবে। এবার ধারকত্বকে সহজে খুঁজে পেলে আগের মতোই সারা দেহে চাপ, কাঠিন্য, কর্কশতা, ভারীত্ব ও ধারকত্বকে উপলব্ধি করুন।

৬. উপর্যুক্ত পাঁচটি স্বভাবকে উপলব্ধি করতে পারলে এবার আপনার জিহ্বাকে ঠোঁটের ভেতরের দিকে চেপে ধরুন, ঠোঁটের কোমলতাকে অনুভব করুন। এবার আপনার দেহকে শিথিল করে দিন এবং আগের নিয়মেই সারা দেহ জুড়ে কোমলতাকে খুঁজে নিন। এবার একটি একটি করে চাপ, কাঠিন্য, কর্কশতা, ভারীত্ব, ধারকত্ব ও কোমলতাকে সারা দেহে উপলব্ধি করুন।

৭. এবার আপনার ঠোঁটগুলোকে একটু ভিজিয়ে নিন এবং জিহ্বাকে ঠোঁটের একপাশ থেকে আরেক পাশে হালকা করে নিয়ে যান এবং ঠোঁটের মসৃণতাকে উপলব্ধি করুন। এভাবে সারা দেহে কোমলতা উপলব্ধির চর্চা করুন। এরপর এই সাতটি স্বভাবকে একে একে উপলব্ধি করুন সারা দেহে।

৮. এরপরে একটি আঙুল উপরে নিচে নাচিয়ে দেখুন এবং এর লঘুত্বকে (হালকা ভাব) উপলব্ধি করুন। এভাবে চর্চা করুন যতক্ষণ না সারা দেহে লঘুত্বকে উপলব্ধি করতে পারেন। এবার আটটি স্বভাবকে সারা দেহে খুঁজে নিন।

৯. এবার সারা দেহে তাপ (উষ্ণতা) খুঁজে নিন। এটি খুঁজে নেওয়া

সাধারণত খুব সোজা।

১০. এবার শ্বাস নেওয়ার সময় এটি যখন নাকের মধ্যে প্রবেশ করে, তখন শ্বাসের শীতলতাকে অনুভব করুন। এবার সারা দেহে এটিকে খুঁজে নিন। এভাবে আপনি এখন দশটি স্বভাবকে উপলব্ধি করতে পারবেন।

দ্রষ্টব্য : উপরের দশটি স্বভাবকে সরাসরি স্পর্শের মাধ্যমে অনুভব করা যায়, কিন্তু সর্বশেষ দুটি স্বভাব, প্রবাহ এবং সংসক্তি—এগুলোকে দশটি স্বভাব থেকে অনুমান করা হয়। এ কারণেই এগুলোকে সবশেষে শেখানো হয়।

১১. সংসক্তিকে উপলব্ধি করতে হলে খেয়াল করুন কীভাবে চামড়া, মাংস ও স্নায়ু দিয়ে এই দেহ একসাথে জুড়ে আছে। বেলুনের মধ্যে রাখা পানির মতোই চামড়ার মধ্যে রক্তগুলো ছড়িয়ে আছে। সংসক্তি ছাড়া এই দেহ টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ত। মাধ্যাকর্ষণ শক্তি যা দেহকে পৃথিবীতে আটকে রাখে, তাও সংসক্তি। যদি তাতেও পরিষ্কার বুঝা না যায়, তাহলে আগের দশটি স্বভাবকে বার বার একটি একটি করে সারা দেহে উপলব্ধি করুন। যখন এতে সুদক্ষ হয়ে উঠবেন, তখন দেখবেন যে সংসক্তির গুণটাও আপনার কাছে পরিষ্কার হয়ে ফুটে উঠবে। তখনো সংসক্তি পরিষ্কার না বুঝলে শুধু চাপ এবং কাঠিন্যকে বার বার দেখুন। তখন আপনার অনুভব করা উচিত যেন পুরো দেহটা রশির মতো পাকানো। এই অনুভূতিকে সংসক্তি হিসেবে বুঝে নিন আর এটিকেও অন্যান্য স্বভাবগুলোর মতোই চর্চা করুন।

১২. প্রবাহকে উপলব্ধি করতে হলে মুখের মধ্যে লালার প্রবাহকে উপলব্ধি করুন, শিরার মধ্যে রক্তের প্রবাহকে উপলব্ধি করুন, ফুসফুসের মধ্যে বাতাসের প্রবাহকে উপলব্ধি করুন, সারা দেহে তাপের প্রবাহকে উপলব্ধি করুন। তাতেও পরিষ্কার না হলে শীতলতা, তাপ অথবা চাপের সাথে এর উপস্থিতি খুঁজে নিন। তাতে হয়তো আপনি প্রবাহকে খুঁজে পাবেন। যখন আপনি এই বারোটি স্বভাবকে সারা দেহে পরিষ্কার উপলব্ধি করতে পারবেন, মাথা থেকে পা পর্যন্ত, তখন একই ক্রমে তাদের বার বার দেখা উচিত। আপনি এভাবে নিজের কাজে সন্তুষ্ট হলে এবার উপর্যুক্ত ক্রমকে নতুন করে সাজান : কাঠিন্য, কর্কশতা, ভারীত্ব, কোমলতা, মসৃণতা, লঘুত্ব, প্রবাহ, সংসক্তি, তাপ, শীতলতা, ধারকত্ব এবং চাপ। এই ক্রমে প্রত্যেক স্বভাবকে মাথা থেকে পা পর্যন্ত একবার একবার করে উপলব্ধি করার চেষ্টা করুন। আপনার এভাবে চর্চা করা উচিত যতক্ষণ না মোটামুটি দ্রুত করতে পারেন, অন্ততপক্ষে মিনিটে তিন রাউন্ড করে চর্চা করতে পারেন।

এভাবে চর্চা করতে করতে কোনো কোনো ভাবনাকারীর কয়েকটি ধাতু

ভারসাম্যহীন হয়ে পড়বে, কিছু ধাতু মাত্রাতিরিক্ত ও অসহ্য হয়ে উঠবে। বিশেষ করে কাঠিন্য, তাপ ও চাপ খুব মাত্রাতিরিক্ত হয়ে উঠতে পারে। যদি এমন হয়, তাহলে তাদের বিপরীত গুণাবলীর উপর মনোযোগ দেওয়া উচিত, আর এভাবে ভাবনার চর্চা চালিয়ে যাওয়া উচিত। এতে করে ধাতুগুলো আবার ভারসাম্যে ফিরে আসতে পারে। এ কারণেই বারোটা স্বভাবগুলোকে শেখানো হয়েছে প্রথমে। যখন ধাতুগুলো ভারসাম্যে থাকে, তখন ধ্যান লাভ করা সহজ হয়।

বিপরীতার্থক গুণগুলো হচ্ছে : কাঠিন্য এবং কোমলতা, কর্কশতা এবং মসৃণতা, ভারীত্ব এবং লঘুত্ব, প্রবাহ এবং সংসক্তি, তাপ এবং শীতলতা, ধারকত্ব এবং চাপ।

যদি কোনো স্বভাব অতিরিক্ত হয়, এটিকে এর বিপরীত গুণ দ্বারা ভারসাম্যে নিয়ে আসুন। উদাহরণস্বরূপ, যদি প্রবাহ মাত্রাতিরিক্ত হয়, তাহলে সংসক্তিতে বেশি করে মনোযোগ দিন, অথবা যদি ধারকত্ব অতিরিক্ত হয়, তাহলে চাপে বেশি করে মনোযোগ দিন। অবশিষ্টগুলোও একইভাবে ভারসাম্যে আনা যায়।

সারা দেহে বারোটি স্বভাবের উপলব্ধিতে সুদক্ষ হয়ে উঠলে, সেই স্বভাবগুলো যখন পরিষ্কার হয়ে উঠবে, তখন আপনার এক পলক দেখলেই উপলব্ধি করা উচিত যে প্রথম ছয়টি একত্রে পৃথিবীধাতু, পরের দুটি একত্রে আপধাতু, পরের দুটি একত্রে তেজধাতু এবং শেষের দুটি একত্রে বায়ুধাতু। এভাবে আপনার পৃথিবী, আপ, তেজ এবং বায়ুধাতুকে উপলব্ধি করার চর্চা করা উচিত যতক্ষণ না মনটা শান্ত হয় ও ধ্যান লাভ হয়। এভাবে আপনার চর্চা করা উচিত বার বার, শত বার, হাজার বার, এমনকি লক্ষ বার পর্যন্ত।

এ পর্যায়ে একটি ভালো পদ্ধতি হচ্ছে একবারে পুরো দেহের উপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে চারটি ধাতুকেই উপলব্ধি করাটা চর্চা করা। মনটাকে শান্ত ও একাগ্র করার জন্য এখন আর আগের মতো দেহের এক অংশ থেকে আরেক অংশে যাওয়ার দরকার নেই। তার বদলে সারা দেহের উপর এক পলক দৃষ্টি বুলিয়ে নিন। সবচেয়ে ভালো হয় কাঁধ বরাবর পিছন থেকে দেখলে। আবার মাথার উপর থেকেও দৃষ্টি রাখা যায়, তবে এতে কিছু কিছু ভাবনাকারীর মধ্যে চাপ বাড়ে এবং ধাতুর ভারসাম্য বিনষ্ট হতে পারে।

বিসুদ্ধিমগ্গের টিকায় আরও দশ উপায়ে ভাবনার চর্চা করতে বলে : ক্রমান্বয়ে, খুব দ্রুত নয়, খুব ধীরে নয়, মনের বিক্ষিপ্ততা দূর করে, ধারণা অতিক্রম করে, যা পরিষ্কার নয় সেটিকে বাদ দিয়ে, স্বভাবগুলোকে উপলব্ধি

করে, এবং অধিচিত্ত সুত্ত, অনুত্তরসীতিভব সুত্ত ও বোজ্ঝঙ্গ সুত্ত অনুসারে ভাবনা করে।

১. ক্রমান্বয়ে *(অনুপুব্বতো)* : বুদ্ধের দেয়া ক্রমে পৃথিবী, আপ, তেজ ও বায়ু।

২. খুব দ্রুত নয় *(নাতিসীঘতো)* : তা না হলে চারটি ধাতু পরিষ্কার দেখা যাবে না।

৩. খুব ধীরে নয় *(নাতিসনিকতো)* : তা না হলে আপনি শেষই করতে পারবেন না।

৪. মনের বিক্ষিপ্ততা দূর করে *(বিকেখপপটিবাহনতো)* : মনটাকে কেবল ভাবনার বিষয়বস্তু—চারধাতুতে রাখুন, এর বাইরে ঘুরে বেড়াতে দেবেন না।

৫. ধারণার অতিক্রম করে *(পঞ্ঞত্তিসমতিক্কমনতো)* : কেবল মনে মনে 'পৃথিবী, আপ, তেজ, বায়ু' বললেই হবে না, তারা যে বাস্তব সত্যের প্রতিনিধিত্ব করে : কাঠিন্য, কর্কশতা, ভারীত্ব, কোমলতা, মসৃণতা, লঘুত্ব, প্রবাহ, সংসক্তি, তাপ, শীতলতা, ধারকত্ব ও চাপকে বুঝায়, তাও খেয়াল রাখতে হবে।

৬. যা পরিষ্কার নয় সেটি বাদ দিয়ে *(অনুপটঠানমুঞ্চনতো)* : বারোটি স্বভাবের সবগুলোকে উপলব্ধি করতে পারলে, যেগুলো পরিষ্কার নয়, সেগুলোকে সাময়িকভাবে বাদ দিতে পারেন। কিন্তু তাতে যদি ধাতুর ভারসাম্যহীনতার কারণে ব্যথা বা চাপ অনুভূত হয়, তাহলে বাদ দেবেন না। তা ছাড়া, আপনাকে চারটি ধাতুর প্রত্যেকটির জন্য কমপক্ষে একটি স্বভাবকে রাখতে হবে। কেবল তিনটি, দুটি বা একটি ধাতু নিয়ে কাজ হবে না। সবচেয়ে ভালো হয় বারোটি স্বভাবের সবগুলোই যদি পরিষ্কার হয় এবং কোনোটিই যাতে বাদ না যায়।

৭. স্বভাব বিচার করা *(লকখণতো)* : যখন ভাবনা শুরু করবেন, আর প্রত্যেক ধাতুর স্বভাবগুলো তখনো পরিষ্কার হয়ে ওঠে নি, তখন আপনি তাদের কাজগুলোর উপরে মনোযোগ দিতে পারেন। তবে মনোযোগ গভীর হলেই কেবল স্বাভাবিক লক্ষণগুলোর প্রতি মনোযোগ দেওয়া উচিত, যেমন : পৃথিবীধাতুর কাঠিন্যতা ও কর্কশতা; পানিধাতুর প্রবাহ ও সংসক্তি; তেজধাতুর তাপ ও শীতলতা এবং বায়ুধাতুর ধারকত্ব। এ পর্যায়ে আপনি কেবল ধাতুই দেখবেন, সেগুলোকে কোনো ব্যক্তি বা আত্মা হিসেবে দেখবেন না।

৮-৯-১০. টিকায় আরও বলা হয়েছে, (৮) **অধিচিত্ত সুত্ত**, (৯) **অনুত্তরসীতিভাব সুত্ত**, এবং (১০) **বোজ্ঝঙ্গসুত্ত** অনুসারে ভাবনা করার জন্য।

এই তিনটি সুত্তে বুদ্ধ পঞ্চ-ইন্দ্রিয়; যথা : শ্রদ্ধা, বীর্য, স্মৃতি, সমাধি এবং প্রজ্ঞাকে ভারসাম্যে আনার উপদেশ দিয়েছেন। সেই সাথে পরম জ্ঞান লাভের সাতটি বৈশিষ্ট্য; যথা : স্মৃতি, ধর্মবিচার (ঘটনাবলীর প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান), বীর্য (প্রচেষ্টা), প্রীতি, প্রশান্তি, সমাধি (মনোযোগ) এবং উপেক্ষা।

চার ধাতুর ভাবনায় অগ্রসর হয়ে আপনি যখন প্রাথমিক ধ্যানে (উপচার-সমাধি) উপনীত হবেন, তখন আপনি ভিন্ন ধরনের আলো দেখতে পাবেন। কিছু কিছু ভাবনাকারীর কাছে এই আলো যেন ধোঁয়ার মতো ধুসর হয়ে আসে। এই ধুসর আলোয় চার ধাতুকে দেখতে দেখতে এটি আরও সাদা শিমুল তুলার মতো হয়ে উঠবে। এরপর এটি হয়ে যাবে উজ্জ্বল সাদা, একেবারে মেঘের মতো, আর আপনার সারা দেহ একটি সাদা মূর্তি হিসেবে দেখাবে। এই সাদা রূপে চার ধাতুকে দেখতে থাকুন এবং এটি কোনো বরফ বা কাচের খণ্ডের মতো স্বচ্ছ হয়ে উঠবে।

এই স্বচ্ছ রূপ হচ্ছে পাঁচটি প্রসাদ-ধাতু, যাকে বলা হয় পাঁচটি 'স্বচ্ছ-ধাতু'। এগুলো হচ্ছে : দেহ, চোখ, কান, নাক এবং জিহ্বা প্রসাদ-ধাতু। এগুলোকে স্বচ্ছরূপে দেখা যায়, কারণ আপনি এখনো তিন ধরনের নিবিড়তা *(ঘন)*, যথা : বিরামহীনতার নিবিড়তা, দলের নিবিড়তা এবং কাজের নিবিড়তাকে জানেন না।

সেই স্বচ্ছ রূপে চারটি ধাতুকে দেখতে দেখতে একসময় এটি ঝিকমিক করে উঠবে এবং আলো ছড়াবে। এই আলোতে কমপক্ষে আধ ঘণ্টা মনোযোগ রাখতে পারলে আপনি উপচার ধ্যানে পৌঁছাবেন। সেই আলোয় স্বচ্ছ রূপের মধ্যে আকাশ-ধাতুকে দেখুন, এর মধ্যেকার ছোট ছোট ফাঁক খুঁজুন। আপনি দেখবেন যে সেই স্বচ্ছ রূপটি ছোট ছোট কণায় বিভক্ত হয়ে গেছে, যেগুলোকে রূপকলাপ বলা হয়। এই ধাপটাকে বলা হয় চিত্তবিশুদ্ধি। এই ধাপে পৌঁছে এবার আপনি রূপকলাপগুলোকে বিশ্লেষণ করে দৃষ্টিবিশুদ্ধির জন্য অগ্রসর হতে পারেন। বিদর্শন ভাবনার শুরু এখান থেকেই।

কীভাবে বিদর্শন ভাবনা করতে হয় তা ব্যাখ্যা করার আগে আমি বিশুদ্ধ-বিদর্শন ভাবনাকারীর উপচার ধ্যান এবং শমথ ভাবনাকারীর অর্পণা ধ্যানের ব্যবহারিক সুবিধাগুলো সম্পর্কে একটু বলতে চাই। বিদর্শন ভাবনায় অনেক কিছু বুঝতে হয়, তাই ক্লান্তি আসে। এমন হলে একটু বিশ্রাম নেওয়া ভালো। মধ্যম নিকায়ের দ্বেধাবিতক্ক সুত্তের অর্থকথায় একটি রূপক গল্প আছে যেখানে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, কীভাবে ধ্যানে বিশ্রাম নিতে হয়। কোনো এক যুদ্ধের সময় মাঝে মাঝে যোদ্ধারা ক্লান্তি অনুভব করে। শত্রুরা হয়তো শক্তিশালী হতে

পারে। মাথার উপর ঝাঁকে ঝাঁকে তীর ছুটে আসতে পারে। তাই যোদ্ধারা তাদের দূর্গে আশ্রয় নেয়। দূর্গের মধ্যে তারা শত্রুর তীরের হাত থেকে মুক্ত, আর নিশ্চিন্তে বিশ্রাম নিতে পারে। যখন তারা শক্তি ফিরে পায়, তারা আবার দূর্গ ছেড়ে যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরে যায়। শমথ ধ্যান হচ্ছে দূর্গের মতো, যেখানে বিদর্শন ভাবনার সময় বিশ্রাম নেওয়া যায়। বিশুদ্ধ বিদর্শন ভাবনাকারীরা, যারা কোনো শমথ ধ্যান লাভ করেন নি, এবং সরাসরি চার ধাতু ভাবনা শুরু করেছেন, তারাও চার ধাতু ভাবনার উপচার ধ্যানকে দূর্গের মতো বিশ্রাম নেওয়ার জায়গা হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন। উভয় ক্ষেত্রেই ভাবনাকারী বিশ্রাম নিয়ে সতেজ হয়ে আবার বিদর্শনের যুদ্ধ ক্ষেত্রে ফিরতে পারেন। বিশ্রাম নেওয়ার জায়গা থাকাটা খুব সুবিধা দেয়।

এখন আমি ব্যাখ্যা করব কীভাবে বিদর্শন ভাবনা করতে হয়। শুরু করছি রূপকলাপগুলো বিশ্লেষণের মাধ্যমে।

রূপকলাপ বিশ্লেষণ

রূপকলাপগুলো দুভাগে বিভক্ত : স্বচ্ছ রূপকলাপ এবং অস্বচ্ছ রূপকলাপ। যে-সমস্ত রূপকলাপগুলোতে পাঁচটি প্রসাদ-ধাতুরূপের যেকোনো একটি বিদ্যমান থাকে, সেগুলো স্বচ্ছ রূপকলাপ হয়। বাদবাকিগুলো অস্বচ্ছ।

আপনাকে প্রথমে স্বচ্ছ এবং অস্বচ্ছ রূপকলাপগুলোর প্রত্যেকটিতে চার ধাতু : পৃথিবী, আপ, তেজ ও বায়ুধাতুকে চিনতে হবে। আপনি দেখবেন রূপকলাপগুলো খুব, খুব দ্রুত উৎপন্ন হয় এবং বিলীন হয়ে যায়। আপনি তাদের বিশ্লেষণ করতেও পারবেন না, কারণ আপনি এখনো তাদের ক্ষুদ্র কণা হিসেবে দেখছেন, তাদের আকারের হিসেব করছেন। যেহেতু আপনি এখনো তিন ধরনের নিবিড়তার মধ্য দিয়ে দেখতে শেখেন নি, যেগুলো হচ্ছে : বিরামহীনতার নিবিড়তা *(সন্ততি-ঘন)*, দলের নিবিড়তা *(সমূহ-ঘন)* এবং কাজের নিবিড়তা *(কিচ্চ-ঘন)*। আপনি এখনো ধারণার *(পঞ্ঞত্তি)* জগতে আটকে আছেন, পরমার্থ বাস্তবতায় *(পরমত্থ)* এখনো পৌঁছান নি।

কারণ, আপনি এখনো শ্রেণি এবং আকারের মধ্য দিয়ে দেখেন নি, এখনো কণা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তুর দলা রয়ে গেছে অবশেষ হিসেবে। যদি আপনি আর অগ্রসর না হন, এবং রূপকলাপগুলোর উৎপত্তি ও বিলয় নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করে বিদর্শন ভাবনার চেষ্টা করতে থাকেন, তাহলে আপনি তখন ধারণার উপর বিদর্শন ভাবনা করার চেষ্টা করছেন মাত্র। অতএব, রূপকলাপগুলোকে

আরও বিশ্লেষণ করতে হবে, যতক্ষণ না ধাতুগুলোকে এক একটা রূপকলাপের মধ্যে দেখতে পান। এটি হচ্ছে পরমার্থ বাস্তবতার কাছে পৌঁছে যাওয়ার জন্য।

যদি একটি কলাপের মধ্যে চারটি ধাতুকে দেখতে না পান, কারণ তারা খুব, খুব দ্রুত উৎপন্ন হয় আর বিলীন হয়ে যায়, তাহলে উৎপত্তি ও বিলয়কে অগ্রাহ্য করুন। আপনি যার সাথে দেখা হতে চান না, কিন্তু ঘটনাক্রমে দেখা হয়ে গেছে, তখন আপনি যেভাবে তাকে না দেখার ভান করেন, বা খেয়াল না করার ভান করেন, ঠিক সেভাবে উৎপত্তি ও বিলয়কে অগ্রাহ্য করুন। কেবল একটি মাত্র রূপকলাপের মধ্যে চারটি ধাতুর উপর মনোযোগ দিন। আপনার মনোযোগের শক্তি তাদের উৎপত্তি-বিলয়কে অগ্রাহ্য করতে আপনাকে সাহায্য করবে। তবুও আপনি যদি সফল না হন, তখন সারা দেহের পৃথিবীধাতুর উপর একবার মনোযোগ দিয়ে এরপর একটি মাত্র কলাপের মধ্যে আবার পৃথিবীধাতুকে দেখুন। এভাবে পর্যায়ক্রমে সারা দেহে এবং কলাপগুলোতে পৃথিবীধাতুর উপর মনোযোগ দিন। আপধাতু, তেজধাতু, বায়ুধাতুর জন্যও ঠিক একইভাবে মনোযোগ দিন। এভাবে আপনি চারি ধাতুকে স্বচ্ছ ও অস্বচ্ছ উভয় রূপকলাপে দেখতে পাবেন।

যখন আপনি এতে সফল হবেন তখন ছয়টি আয়তন; যথা : চক্ষু-আয়তন, কর্ণ-আয়তন, ঘ্রাণ-আয়তন, জিহ্বা-আয়তন, কায়-আয়তন এবং মন-আয়তনের স্বচ্ছ ও অস্বচ্ছ রূপকলাপগুলোর চার ধাতুগুলো পালাক্রমে দেখুন।

একটি রূপকলাপ কমপক্ষে আট ধরনের রূপের সমষ্টি : পৃথিবী, আপ, তেজ, বায়ু, বর্ণ, গন্ধ, রস এবং ওজ। অতএব ছয় আয়তনের স্বচ্ছ ও অস্বচ্ছ রূপকলাপগুলোতে চারি ধাতুকে চিনে নেওয়ার পরে বাদবাকি ধাতু; যথা : বর্ণ, গন্ধ, রস ও ওজ ধাতুকেও চিনে নেওয়া উচিত আপনার।

বর্ণকে সকল রূপকলাপে পাওয়া যাবে। এটি হচ্ছে দৃষ্টির বিষয়বস্তু *(রূপারম্মণ)*। এটিকে সহজেই চেনা যায়।

গন্ধকেও সকল রূপকলাপে পাওয়া যায়। শুরুতে আপনার নাকের প্রসাদ-ধাতু এবং ভবাঙ্গচিত্তকে চেনা উচিত। প্রথমত, নাকের প্রসাদ-ধাতুকে খুঁজে নেওয়ার জন্য নাকের মধ্যেকার চারি ধাতুকে দেখুন। নাকের মধ্যে সংশ্লিষ্ট রূপকলাপগুলোর মধ্যে অবশ্যই নাকের প্রসাদ-ধাতুকে দেখতে পাবেন আপনি। যদি আপনি ছয় আয়তনের স্বচ্ছ ও অস্বচ্ছ কলাপগুলোর চারি ধাতুকে সফলভাবে চিনতে সফল হন, আপনি তখন মনোদ্বারের সেই উজ্জ্বল ও দীপ্তিমান ভবাঙ্গচিত্তকে সহজেই চিনতে সক্ষম হবেন। এটি অবস্থিত হৃদয়ে, আর নির্ভর করে হৃদয়বস্তুর উপরে, যা হৃদয়-দশক-কলাপ নামের অস্বচ্ছ

কলাপ দ্বারা গঠিত।

এভাবে নাকের প্রসাদ-ধাতু এবং ভবাঙ্গচিত্তকে সহজেই চিনে নিয়ে এবার রূপকলাপের গন্ধকে চিনতে অগ্রসর হোন। গন্ধকে ঘ্রাণবিজ্ঞান অথবা মনোবিজ্ঞান দিয়েও চেনা যায়। নাকের প্রসাদ-ধাতুর উপর ঘ্রাণবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়। ভবাঙ্গচিত্ত, যা হৃদয়বস্তুর রূপের উপর নির্ভরশীল, তার দ্বারা আকর্ষিত হয়ে মনোবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়। এজন্যই রূপকলাপের গন্ধকে দেখার ইচ্ছে হলে তার ধারক ও বাহক প্রসাদ-ধাতুগুলোকে আগে অবশ্যই চিনতে হবে।

রসকেও সকল রূপকলাপে পাওয়া যায়। জিহ্বার প্রসাদ-ধাতু এবং ভবাঙ্গচিত্তকে চিনে নিয়ে রূপকলাপের রসকে চিনে নিন। আপনি জিহ্বার উপরে লালার স্বাদকে দেখে নিতে পারেন। গন্ধের মতোই, রসকেও জিহ্বা বা মনচিত্ত দিয়ে জানা যায়, তবে তার আগে তাদের ধারক ধাতুগুলোকে অবশ্যই আগে জানতে হবে।

অভিধর্মের একটি অর্থকথা '*সম্মোহবিনোদিনী*'তে বলা হয়েছে : '*সব্বোপি পনেস পভেদোমনোদ্বারিকজাবনেয়েব লভতি।*' এতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে রূপকলাপের বর্ণ, গন্ধ এবং রসকে মনচিত্ত দিয়েই চেনা যায়। মনোযোগ শক্তিশালী হওয়ার আগে আপনি কীভাবে মনচিত্তের দ্বারা রস ও গন্ধকে চেনা যায়, তা শেখার জন্য ঘ্রাণ ও জিহ্বাবিজ্ঞানকে ব্যবহার করেন। মনোযোগ প্রবল ও শক্তিশালী হলে আপনি শুধুমাত্র মনচিত্তের মাধ্যমেই রূপকলাপের রস ও গন্ধকে চিনতে পারবেন।

ওজকে সকল রূপকলাপে পাওয়া যায়। এটি চার ধরনের : কর্ম-ওজ, চিত্ত-ওজ, ঋতু-ওজ এবং আহার-ওজ। যেকোনো রূপকলাপের মধ্যে দেখুন, সেখানে আপনি ওজকে দেখতে পাবেন, যা থেকে রূপকলাপগুলোকে বহু গুণে বেড়ে যেতে দেখা যায়।

রূপকলাপের মৌলিক আট ধরনের রূপকে চিনে নিয়ে এবার আপনি বিশেষ বিশেষ রূপকলাপে থাকা অবশিষ্ট রূপগুলোকে চেনার চেষ্টা করুন।

জীবিত-রূপ হচ্ছে সেই রূপ যা কর্ম দ্বারা উৎপন্ন রূপের (কর্মজ রূপের) জীবনকে ধারণ করে। এটিকে চিত্ত, ঋতু অথবা আহার দ্বারা উৎপন্ন রূপকলাপের মধ্যে পাওয়া যাবে না। এটিকে পাওয়া যাবে কেবল কর্ম দ্বারা উৎপন্ন রূপকলাপগুলোতে, অর্থাৎ স্বচ্ছ রূপকলাপগুলোতে। সেই স্বচ্ছ রূপকলাপগুলোকে আপনার চেনার কথা। এবার সেগুলোর মধ্যে জীবিত-রূপকে খুঁজুন। জীবিত-রূপ অন্যান্য রূপগুলোর জীবনকে ধারণ করে কেবল নিজের কলাপে, অন্যান্য কলাপগুলোতে নয়।

স্বচ্ছ রূপকলাপে জীবিত-রূপকে চিনে নিয়ে এবার এটিকে অস্বচ্ছ রূপ কলাপের মধ্যেও চেনার চেষ্টা করা উচিত। আমাদের দেহে তিন ধরনের অস্বচ্ছ রূপকলাপ রয়েছে যেগুলোতে জীবিত-রূপ রয়েছে। এক ধরনের রূপকলাপ হচ্ছে হৃদয়-দশক-কলাপ যেগুলোকে কেবল হৃদপিণ্ডেই পাওয়া যায়। অন্য দুটি রূপকলাপ হচ্ছে ভাব-দশক-কলাপ এবং জীবিত-নবক-কলাপ, যেগুলোকে সারা দেহে পাওয়া যায়। তাই হৃদপিণ্ডের আশেপাশের কোনো অস্বচ্ছ রূপকলাপে যদি আপনি জীবিত-রূপকে দেখেন, তাহলে বুঝবেন যে এটি অবশ্যই একটি ভাব-দশক-কলাপ অথবা জীবিত-নবক-কলাপ। এগুলোকে আলাদা করে চেনার জন্য আপনাকে চিনতে হবে লিঙ্গ-নির্ধারক-রূপকে (ভাবরূপকে)।

লিঙ্গ-নির্ধারক-রূপ বা ভাবরূপকে সারা দেহে, ছয়টি আয়তনের সবগুলোর অস্বচ্ছ কলাপে পাওয়া যায়। স্বচ্ছ এবং অস্বচ্ছ কলাপে জীবিত-রূপকে খুঁজে পাওয়ার পরে এবার যে অস্বচ্ছ কলাপের মধ্যে জীবিত-রূপকে খুঁজে পেয়েছেন তাতে ভাবরূপকে দেখার চেষ্টা করা উচিত। যদি সেখানে ভাবরূপ থাকে, তাহলে কলাপটি হচ্ছে ভাব-দশক-কলাপ এবং এটি জীবিত-নবক-কলাপ নয়। পুরুষের মধ্যে থাকে কেবল পুরুষ-ভাবরূপ এবং নারীর মধ্যে থাকে কেবল নারী-ভাবরূপ। পুরুষ-ভাবরূপ হচ্ছে সেই গুণ যার দ্বারা আপনি জানেন, 'এটি একজন পুরুষ'। নারী-ভাবরূপ হচ্ছে সেই গুণ যার দ্বারা আপনি জানেন, 'এটি একজন নারী'। যখন আপনি ভাবরূপকে চিনতে সক্ষম হবেন, সেটিকে ছয় আয়তনের সবখানে খুঁজুন—চোখ, কান, নাক, জিহ্বা, কায় ও মনে।

হৃদয়বস্তু-রূপ হচ্ছে সেই রূপ যা মনের দ্বারে উৎপন্ন সকল চিত্তকে ধারণ করে। তার মানে হচ্ছে পাঁচটি ইন্দ্রিয়-দ্বার : চোখ, কান, নাক, জিহ্বা ও কায়দ্বারে উৎপন্ন চিত্তগুলো বাদে।

হৃদয়বস্তু-রূপকে চিনতে হলে ভবাঙ্গচিত্তে মনোযোগ স্থাপন করুন। এরপর সেই রূপকলাপগুলোকে দেখুন যেগুলো ভবাঙ্গচিত্তকে ধারণ করে। আপনি এই রূপকলাপগুলোকে ভবাঙ্গচিত্তের নিচের অংশে খুঁজে পাবেন। এগুলো অস্বচ্ছ হৃদয়-দশক-কলাপ।

স্বচ্ছ ধাতুরূপের বিশ্লেষণ

আমাদের চোখে কয়েক ধরনের রূপকলাপ আছে, অনেকটা চালের গুড়ো এবং গমের গুড়ো একসাথে মিশে থাকার মতো। চোখে দু ধরনের প্রসাদ-ধাতু

একত্রে মিশে আছে, চক্ষু-প্রসাদ-ধাতু এবং কায়-প্রসাদ-ধাতু। অর্থাৎ চক্ষু-দশক-কলাপ এবং কায়-দশক-কলাপ মিশ্রিত হয়ে আছে। কায়-দশক-কলাপে আছে কায়-প্রসাদ-ধাতু, যা ছয়টি আয়তনের মধ্যে ছড়িয়ে আছে। সেগুলো মিশ্রিত হয়ে আছে চোখের মধ্যে চক্ষু-দশক-কলাপের সাথে, কানের মধ্যে শ্রোত্র-দশক-কলাপের সাথে, নাকের মধ্যে ঘ্রাণ-দশক-কলাপের সাথে, জিহ্বার মধ্যে জিহ্বা-দশক-কলাপের সাথে, হৃদপিণ্ডের মধ্যে হৃদয়-দশক-কলাপের সাথে। ভাবরূপ কলাপগুলোও ছয়টি আয়তনের মধ্যে ছড়িয়ে আছে, আর মিশ্রিত হয়ে আছে স্বচ্ছ কলাপগুলোর সাথে। এটি দেখার জন্য আপনাকে পাঁচ ধরনের স্বচ্ছ কলাপের রূপকে আগে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। এগুলো হচ্ছে :

১. চক্ষু-প্রসাদ-ধাতু *(চকখু-পসাদ)* : এটি বর্ণের প্রতি সংবেদনশীল, যেখানে কায়-প্রসাদ-ধাতু হচ্ছে স্পর্শের প্রতি, অর্থাৎ ছোঁয়া যায় এমন বস্তুর প্রতি সংবেদনশীল। এই পার্থক্যটাই আপনাকে জানিয়ে দেয় কোনটা কীসের। প্রথমে চোখের চারটি ধাতুকে দেখুন, এবং একটি স্বচ্ছ রূপকলাপকে দেখুন। এরপর চোখ থেকে কিছু দূরে কোনো একটি রূপকলাপের বর্ণটি দেখুন। যদি সেই বর্ণটি প্রসাদ-ধাতুকে আঘাত করে, এটি একটি চক্ষু-প্রসাদ-ধাতু, আর যে রূপকলাপে এটি আছে, সেটি হচ্ছে একটি চক্ষু-দশক-কলাপ। বর্ণটি এমন না করলে সেটি চক্ষু-প্রসাদ-ধাতু নয়। সেটি একটি কায়-প্রসাদ-ধাতু মাত্র। কারণ, চোখে কেবল দু ধরনেরই প্রসাদ-ধাতু আছে।

২. কায়-প্রসাদ-ধাতু *(কায়-পসাদ)* : এটি স্পর্শযোগ্য (কায়গ্রাহ্য) বস্তুর প্রতি সংবেদনশীল, যেগুলো হচ্ছে পৃথিবী, তেজ ও বায়ুধাতু। একটি স্বচ্ছ রূপকলাপ দেখুন। এরপর কাছাকাছি কোনো রূপকলাপের পৃথিবী, তেজ বা বায়ুধাতুকে দেখুন। যদি তিনটি ধাতুর মধ্যে যেকোনো একটি ধাতু প্রসাদ-ধাতুকে আঘাত করে, তাহলে এটি কায়-প্রসাদ-ধাতু এবং যে রূপ-কলাপে এটি আছে সেটি একটি কায়-দশক-কলাপ। চোখের ক্ষেত্রে যেমনটা করেছেন, ঠিক একইভাবে কান, নাক, জিহ্বা, দেহ এবং হৃদপিণ্ডের মধ্যে কায়-দশক-কলাপগুলোকে দেখুন।

৩. শ্রোত্র-প্রসাদ-ধাতু *(সোত-পসাদ)* : এটি শব্দের প্রতি সংবেদনশীল। কানের চারটি ধাতুকে দেখুন এবং একটি স্বচ্ছ রূপকলাপকে দেখুন। এরপর কোনো শব্দ শুনুন। যদি এটি প্রসাদ-ধাতুর উপর আঘাত করে, তাহলে এটি একটি শ্রোত্র-প্রসাদ-ধাতু। যে রূপকলাপে এটি বিদ্যমান, সেই রূপকলাপকে বলা হয় শ্রোত্র-দশক-কলাপ। এর পরে কায়-দশক-কলাপকে দেখাটা উপরে উল্লিখিত চোখের মতো।

৪. ঘ্রাণ-প্রসাদ-ধাতু *(ঘাণ-পসাদ)* : এটি গন্ধের প্রতি সংবেদনশীল। নাকের মধ্যে চারটি ধাতুকে দেখুন এবং একটি স্বচ্ছ রূপকলাপকে দেখুন। এরপরে কাছাকাছি কোনো রূপকলাপের গন্ধ নিন। যদি এটি স্বচ্ছ ধাতুতে আঘাত করে, তাহলে এটি একটি ঘ্রাণ-প্রসাদ-ধাতু, আর যে রূপকলাপে এটি বিদ্যমান সেটি হচ্ছে ঘ্রাণ-দশক-কলাপ।

৫. জিহ্বা-প্রসাদ-ধাতু *(জিহ্বা-পসাদ)* : এটি স্বাদের প্রতি সংবেদনশীল। জিহ্বার মধ্যে চারটি ধাতুকে দেখুন এবং কোনো প্রসাদ-ধাতুকে দেখুন। এরপর কাছাকাছি কোনো রূপকলাপের স্বাদ নিন। যদি এটি প্রসাদ-ধাতুর উপর আঘাত করে, তাহলে এটি একটি জিহ্বা-প্রসাদ-ধাতু, আর যে রূপকলাপে এটি বিদ্যমান, সেটি একটি জিহ্বা-দশক-কলাপ।

কায়-দশক-কলাপ এবং ভাব-দশক-কলাপকে ছয়টি আয়তনের সবগুলোতে পাওয়া যায় এবং প্রত্যেক স্থানে অবশ্যই তাদের পালাক্রমে দেখতে হবে।

চোখের মধ্যে চুয়াল্লিশ প্রকার রূপ

আপনি যদি চক্ষু-রূপকে বিশ্লেষণ করেন, তাহলে তাতে ছয়টি রূপ কলাপের মধ্যে চুয়াল্লিশ ধরনের রূপকে খুঁজে পাবেন। এই ছয়টি রূপ কলাপ হচ্ছে :

১. চক্ষু-দশক-কলাপ, যা বর্ণের প্রতি সংবেদনশীল, স্বচ্ছ এবং কর্ম দ্বারা উৎপন্ন।

২. কায়-দশক-কলাপ, যা স্পর্শযোগ্য বস্তুর (পৃথিবী, তেজ এবং আপ ধাতুর) প্রতি সংবেদনশীল, স্বচ্ছ এবং কর্ম দ্বারা উৎপন্ন।

৩. ভাব-দশক-কলাপ, যা অস্বচ্ছ এবং কর্ম দ্বারা উৎপন্ন।

৪. চিত্ত দ্বারা উৎপন্ন ওজ-অষ্টক-কলাপ।

৫. ঋতু দ্বারা উৎপন্ন ওজ-অষ্টক-কলাপ।

৬. আহার দ্বারা উৎপন্ন ওজ-অষ্টক-কলাপ।

আমি আগেই ব্যাখ্যা করেছি কীভাবে প্রথম তিনটি রূপকলাপকে দেখতে হয়। শেষের তিনটি কলাপে আছে আট ধরনের রূপ। তাদের একমাত্র পার্থক্য হচ্ছে তাদের উৎসে : চিত্তে, ঋতুতে অথবা আহারে। তাই আমি এখন উদাহরণ দেব কীভাবে বুঝে নিতে হয় কোনটা চিত্ত দ্বারা উৎপন্ন, কোনটা ঋতু দ্বারা উৎপন্ন এবং কোনটা আহার দ্বারা উৎপন্ন।

চিত্ত দ্বারা উৎপন্ন রূপ (চিত্তজ-রূপ)

মন-আয়তনের রূপের উপর নির্ভরশীল সকল চিত্তগুলো, যেগুলো সারা জীবন ধরে উৎপন্ন হয়, সেগুলো চিত্ত দ্বারা উৎপন্ন ওজ-অষ্টক-কলাপ উৎপন্ন করে। এক একটি চিত্ত বহু সংখ্যক ওজ-অষ্টক-কলাপ উৎপন্ন করে যা সারা দেহে ছড়িয়ে পড়ে।

ভবাঙ্গচিত্তে মনোযোগ দিলে আপনি দেখবেন যে মন-আয়তন রূপের উপর নির্ভরশীল অনেক চিত্ত অবিরাম রূপকলাপ উৎপন্ন করে। যদি এটা পরিষ্কার না হয়, তাহলে ভবাঙ্গচিত্তে মনোযোগ দিয়ে আপনার একটি আঙুলকে নাচান। আপনি দেখবেন যে প্রচুর রূপকলাপ উৎপন্ন হচ্ছে। কারণ, মনটি আঙুলটিকে নাড়াতে চায়। আপনি আরও দেখবেন যে সেগুলো সারা ছয়টি আয়তনে ছড়িয়ে পড়ছে। এগুলো হচ্ছে ওজ-অষ্টক-কলাপ, যেগুলো অস্বচ্ছ এবং চিত্ত দ্বারা উৎপন্ন।

ঋতু দ্বারা উৎপন্ন রূপ (ঋতুজ-রূপ)

তেজধাতুকে বলা হয় তাপমাত্রা বা ঋতু। এটিকে সকল রূপকলাপে পাওয়া যায়। এটি দ্রুত ঋতু দ্বারা উৎপন্ন ওজ-অষ্টক-কলাপের প্রথম প্রজন্ম উৎপন্ন করে। এই উৎপন্ন কলাপগুলোতেও তেজধাতু থাকে, যেটি ঋতু দ্বারা উৎপন্ন ওজ-অষ্টক-কলাপের দ্বিতীয় প্রজন্ম উৎপন্ন করে। কর্ম দ্বারা উৎপন্ন কলাপের মধ্যেকার তেজধাতু, যেমন চক্ষু-দশক-কলাপ একইভাবে চার বা পাঁচ প্রজন্ম ঋতু দ্বারা উৎপন্ন কলাপের জন্ম দেয়। এটি কেবল ঘটে যখন তাপমাত্রা তার স্থিতিশীল অবস্থায় *(ঠিতিকাল)* পৌঁছে যায়। এটি রূপের নিয়ম যে, কেবল স্থিতিশীল অবস্থায় আসলে তবেই এটি শক্তিশালী হয়।

(সংক্ষেপে : কর্মজ=> প্রথম ঋতুজ => ২য় => ৩য় => ৪র্থ => ৫ম)

আহার দ্বারা উৎপন্ন রূপ (আহারজ-রূপ)

দেহের চারটি অংশ, যথা : হজম না হওয়া খাদ্য, মল, পুঁজ এবং প্রস্রাব, এগুলোতে কেবল থাকে তাপমাত্রা (উতু) দ্বারা উৎপন্ন ওজ-অষ্টক-কলাপগুলো। কর্মজ-হজমী-তাপের উৎপন্ন হয় জীবিত-নবক-কলাপের তেজধাতু দ্বারা। এই তেজধাতুর সহায়তায় ওজ-অষ্টক-কলাপের ওজ পর পর অনেক প্রজন্ম ওজ-অষ্টক-কলাপ উৎপন্ন করে। সেগুলো হচ্ছে আহার দ্বারা

উৎপন্ন কলাপ (আহারজ-কলাপ), এবং এগুলো ছয়টি আয়তনে ছড়িয়ে থাকে। এক দিনের আহার আহারজ ওজ-অষ্টক-কলাপ উৎপন্ন করে সর্বোচ্চ সাত দিন পর্যন্ত। কর্মজ-হজমী-তাপের সহায়তায় এক দিনে করা আহার সর্বোচ্চ সাত দিন পর্যন্ত কর্মজ, চিত্তজ, ঋতুজ, এবং এর পরবর্তী আহারজ কলাপগুলোর ওজকে সতেজ রাখতে সাহায্য করে।

এই ব্যাপারগুলো দেখতে হলে খাওয়ার সময় যখন আহারজ কলাপগুলো মুখ থেকে গলা, পাকস্থলী এবং অন্ত্র দিয়ে সারা দেহে ছড়িয়ে পড়ছে, তখন ভাবনা করতে পারেন। মুখ, গলা, পাকস্থলী ও অন্ত্রের মধ্যে নতুন আহার করা খাদ্যে চারটি ধাতুকে দেখুন এবং সেখানের রূপকলাপগুলোকে দেখুন। এভাবে দেখতে থাকুন যতক্ষণ না দেখতে পান যে রূপকলাপের ওজ নতুন রূপকলাপ উৎপন্ন করছে, যেগুলো সারা দেহে ছড়িয়ে পড়ছে।

বিকল্প পদ্ধতি হিসেবে, খাওয়ার পরেও আপনি এসব জিনিস দেখতে পারেন। পাকস্থলী অথবা অন্ত্রে নতুন খাওয়া খাদ্যগুলোর মধ্যে চারি ধাতুকে দেখুন। দেখতে থাকুন যতক্ষণ না আপনি দেখতে পাবেন যে কর্ম দ্বারা উৎপন্ন হজমী তাপের সহায়তায় খাদ্যের রূপকলাপের ওজ নতুন রূপকলাপ উৎপন্ন করছে, যেগুলো সারা দেহে ছড়িয়ে পড়ছে। দেখুন যে এই কলাপগুলো অস্বচ্ছ, এগুলোকে বিশ্লেষণ করুন, এবং প্রত্যেকটি কলাপে আট ধরনের রূপকে দেখুন।

এই আহার দ্বারা উৎপন্ন ওজ-অষ্টক কলাপগুলোকে সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়তে দেখুন এবং দেখুন সেগুলো চোখে পৌঁছে যাচ্ছে। চোখের মধ্যেকার সেই কলাপগুলোর মধ্যে আট ধরনের রূপকে দেখুন। দেখুন যে সেই কলাপগুলোর ওজ হচ্ছে আহার দ্বারা উৎপন্ন ওজ (আহারজ-ওজ)। যখন এই আহার দ্বারা উৎপন্ন ওজ চক্ষু-দশক-কলাপের ওজের সাথে মিলিত হয়, এটি চক্ষু-দশক-কলাপের মধ্যে কর্ম দ্বারা উৎপন্ন ওজকে চার বা পাঁচ প্রজন্ম রূপকলাপ উৎপন্ন করতে সাহায্য করে। এই প্রজন্মের সংখ্যাগুলো নির্ভর করে কর্ম দ্বারা উৎপন্ন ওজ এবং আহার দ্বারা উৎপন্ন ওজের সহায়তা শক্তির উপরে। আবার, এই চার বা পাঁচ প্রজন্মের রূপকলাপগুলোতে থাকে তেজধাতু বা তাপমাত্রা, যা তার স্থিতিশীল অবস্থায় আছে, যা অনেক প্রজন্ম ঋতুজ ওজ-অষ্টক-কলাপ উৎপন্ন করে। এখানে সেটাও দেখার চেষ্টা করুন।

এ ছাড়াও দেখার চেষ্টা করুন যে আহারজ ওজের সহায়তায় কায়-দশক-কলাপের ওজ এবং ভাব-কলাপের ওজ চার বা পাঁচটি প্রজন্মের আহারজ ওজ-অষ্টক-কলাপ উৎপন্ন করছে। সেই অনেকগুলো প্রজন্মেও তেজধাতু বা

তাপমাত্রা অনেক অনেক ঋতুজ ওজ-অষ্টক-কলাপ উৎপন্ন করে।

চোখের প্রত্যেকটি চিত্ত দ্বারা উৎপন্ন ওজ-অষ্টক-কলাপে ওজ থাকে। আহারজ ওজের সহায়তায় এই চিত্তজ ওজ দুই বা তিন প্রজন্মের আহারজ ওজ-অষ্টক-কলাপ উৎপন্ন করে। এগুলোর মধ্যেকার তেজধাতুও অনেক প্রজন্ম তাপমাত্রা দ্বারা উৎপন্ন ওজ-অষ্টক-কলাপ উৎপন্ন করে।

চিত্ত শমথচিত্ত হোক, বিদর্শনচিত্ত হোক, মার্গচিত্ত হোক বা ফলচিত্ত হোক, এটি দেহের মধ্যে অনেক প্রজন্ম ধরে চিত্তজ ওজ-অষ্টক-কলাপের জন্ম দেয়। এই কলাপগুলোর মধ্যেকার তেজধাতু দেহের ভেতরে ও বাইরে ঋতুজ ওজ-অষ্টক-কলাপের জন্ম দেয়। আলো হচ্ছে সেই চিত্তজ ও ঋতুজ কলাপগুলোর বর্ণরূপের ঔজ্জ্বল্য।

চক্ষু-আয়তনে যেভাবে রূপকে দেখেছেন সেভাবে অন্যান্য পাঁচটি আয়তনেও সকল ধরনের রূপকে দেখা উচিত।

সারাংশ

আজকে আমি খুব সংক্ষিপ্ত করে বুঝিয়ে দিলাম কীভাবে রূপকলাপ বিশ্লেষণ করতে হয়। বাস্তবে চর্চা করতে গেলে আরও অনেক কিছু করতে হয়, যা বলার সময় এখানে নেই। উদাহরণস্বরূপ, বিস্তৃত পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ, যাকে আমরা বলি দেহের বিয়াল্লিশটি অংশের বিশ্লেষণ, সেখানে আছে : বাইশটি পৃথিবীধাতুর অংশ, বারোটি আপধাতুর অংশ, চারটি তেজধাতুর অংশ এবং ছয়টি বায়ুধাতুর অংশ। সেগুলো মধ্যম নিকায়ের ধাতুবিভঙ্গ সুত্তে উল্লেখ করা হয়েছে। যদি আপনি সেগুলো চর্চা করতে চান, তাহলে কোনো দক্ষ গুরুর কাছে যাওয়া উচিত। ক্রমান্বয়ে চর্চার মাধ্যমে আপনি ধীরে ধীরে চারটি কারণে উৎপন্ন কলাপগুলো, যথা : কর্মজ, চিত্তজ, ঋতুজ এবং আহারজ কলাপগুলোকে দেখতে দক্ষ হয়ে উঠবেন। সংক্ষেপে বলতে গেলে :

১. রূপকলাপগুলো দেখতে হলে আপনাকে চার ধাতু, যথা : পৃথিবী, আপ, তেজ ও বায়ুধাতুকে চিনে নিয়ে ভাবনার চর্চা করতে হবে উপচার ধ্যান পর্যন্ত।

২. যখন আপনি রূপকলাপগুলোকে দেখতে পাবেন, তখন সেগুলোকে বিশ্লেষণ করুন যাতে এক একটি কলাপের মধ্যেকার সকল রূপগুলোকে দেখতে পান। উদাহরণস্বরূপ, একটি কলাপের মধ্যে পৃথিবী, আপ, তেজ, বায়ু, বর্ণ, গন্ধ, ওজ, জীবিত-রূপ এবং চক্ষু-প্রসাদ-ধাতুকে দেখুন।

৩. সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে একটি মাত্র আয়তনে সকল প্রকার রূপকে দেখুন। এরপর সবগুলো আয়তনে দেখুন। বিস্তৃত পদ্ধতিতে দেহের বিয়াল্লিশটি

অংশের সবগুলোতে সকল প্রকার রূপকে দেখুন। এখানেই রূপকে দেখার উপরে আমার বক্তব্য শেষ হলো। পরবর্তী দেশনায় আমি ব্যাখ্যা করব কীভাবে মনকে দেখতে হয়।

প্রশ্নোত্তর পর্ব - ৪

প্রশ্ন ৪.১ : *আর্যমৈত্রেয় বোধিসত্ত্বসহ সকল বোধিসত্ত্ব কি সাধারণ লোক (পৃথকজন)? যদি আর্যমৈত্রেয় বোধিসত্ত্ব আমাদের মতোই সাধারণ লোক হন, তাহলে যখন তিনি মৈত্রেয় বুদ্ধ হওয়ার জন্য নেমে আসবেন, তখন বুদ্ধ হওয়ার জন্য আমাদের ও তার মাঝে কী কী পার্থক্য বিদ্যমান থাকবে?*

উত্তর ৪.১ : পার্থক্য হচ্ছে তাঁর পারমী পূর্ণ হয়েছে, যেমন আমাদের শাক্যমুনি বুদ্ধ যখন সিদ্ধার্থ বোধিসত্ত্ব ছিলেন, তাঁর মতো। এমন বোধিসত্ত্বরা অনেক জন্ম ধরে তাঁদের পারমী পূর্ণ করে আসছেন, যেমন দান পারমী, শীল পারমী, মৈত্রী পারমী এবং প্রজ্ঞা পারমী। যদিও তারা ইন্দ্রিয়সুখ উপভোগ করেন, তাদের পরিপক্ব পারমীগুলো তাদের সংসার ত্যাগের পথে ঠেলে দেয়। প্রত্যেক বোধিসত্ত্ব শেষ জীবনে বিয়ে করেন, এবং একটি পুত্র সন্তান লাভ করেন, এটি প্রকৃতির নিয়ম। আমি মৈত্রেয় বোধিসত্ত্বের স্ত্রী এবং পুত্রের নাম ভুলে গেছি। থেরবাদী ত্রিপিটক অনুসারে, বুদ্ধসহ কোনো অর্হৎ পরিনির্বাণের পরে আর জন্মান না। পরিনির্বাণ হচ্ছে তার পুনর্জন্মের চক্রের সমাপ্তি। তারা আর কোথাও জন্ম লাভ করবেন না।

আমাদের শাক্যমুনি বুদ্ধের কথাই ধরুন না, তাঁর শেষ জীবনে, বুদ্ধত্ব লাভের আগে তিনি ছিলেন একজন সাধারণ লোক, পৃথকজন। কীভাবে? ষোল বছর বয়সে তিনি রাজপুত্র হন এবং রাজকন্যা যশোধরাকে বিয়ে করেন। তিনি ইন্দ্রিয়সুখ উপভোগ করেন তের বছরেরও বেশি সময় ধরে। তার বামে পাঁচ শ এবং ডানে পাঁচ শ দেবী ছিল না, কিন্তু তাকে ঘিরে ছিল হাজার জন রাজকন্যা। এটিই *কামসুখল্লিকায়ানুয়োগো*—ইন্দ্রিয়সুখ উপভোগ বা ইন্দ্রিয়সুখে মগ্ন হওয়া।

ইন্দ্রিয়সুখ পরিত্যাগের পরে তিনি উরুবেলার অরণ্যে আত্মনিগ্রহমূলক অনেক তপস্যা করেন। ছয় বছরের ব্যর্থ চর্চা শেষে তিনি এটিকে ত্যাগ করেন এবং মধ্যপথ অবলম্বন করেন, আর অচিরেই বুদ্ধত্ব লাভ করেন। বুদ্ধত্ব লাভের পরে তাঁর প্রথম দেশনা, *ধম্মচক্কপবত্তন সুত্তে* তিনি ঘোষণা করেন : *'...কামেসু কামসুখল্লিকায়ানুয়োগো হীনো, গম্মো, পুথুজ্জনিকো, অনরিয়ো, অনত্থসংহিতো।'* ইন্দ্রিয়সুখ উপভোগ হচ্ছে হীন, গ্রাম্য লোকদের কাজ,

সাধারণ লোকদের কাজ। এটি আলোকিত মহান লোকদের কাজ নয়, আর্যদের কাজ নয়। এই কাজের মাধ্যমে মার্গ, ফল ও নির্বাণের কোনো কিছুই পাওয়া যায় না।

তাই তার প্রথম দেশনায় বুদ্ধ ঘোষণা করেন যে, যেকোনো ব্যক্তি, সে যদি ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করে, তাহলে সে একজন সাধারণ লোক বা পৃথকজন। বোধিসত্ত্ব অবস্থায় তিনি রাজপ্রাসাদে যশোধরার সাথে ইন্দ্রিয়সুখ উপভোগ করেছিলেন। সে সময় তিনিও একজন সাধারণ পৃথকজন ছিলেন। কারণ, ইন্দ্রিয়সুখ উপভোগ করাটা পৃথকজনের কাজ।

এটি কেবল আমাদের বোধিসত্ত্বের ক্ষেত্রেই নয়, প্রত্যেক বোধিসত্ত্বের জন্যই খাটে। এখানেও বর্তমান শ্রোতাদের মাঝে হয়তো অনেক বোধিসত্ত্ব আছেন। আপনাদের এটি খুব মনোযোগ দিয়ে চিন্তা করা উচিত : এই বোধিসত্ত্বরা কি সাধারণ লোক নাকি মহান লোক *(অরিয়)*? আমার মনে হয় এর উত্তর আপনাদের জানা আছে।

প্রশ্ন ৪.২ : *ভাবনা কোর্সের পরে কোনো ভাবনাকারী কি মার্গফল লাভ করতে পারে? যদি না পারে, তাহলে কেন পারে না?*

উত্তর ৪.২ : সে লাভ করতে পারে। এটি তাঁর পারমীর উপর নির্ভর করে। উদাহরণস্বরূপ, বাহিয়-দারুচিরিয়ের কথা ধরুন। তিনি কাশ্যপ বুদ্ধের শাসনে শমথ-বিদর্শন ভাবনা করে সংস্কারোপেক্ষা জ্ঞান পর্যন্ত লাভ করেছিলেন। তিনি প্রায় বিশ হাজার বছর ধরে ভাবনা করেছিলেন; কিন্তু কোনো মার্গ ও ফলজ্ঞান লাভ করতে পারেন নি। কারণ, তিনি পদুমুত্তর বুদ্ধের কাছ থেকে একটি সুনির্দিষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী লাভ করেছিলেন যে তিনি ক্ষিপ্রাভিজ্ঞ বা সবচেয়ে দ্রুত অর্হত্ত্ব লাভকারী হবেন গৌতম বুদ্ধের শাসনে। একইভাবে, গৌতম বুদ্ধের শাসনে যেসব শ্রাবক প্রতিসম্ভিদা জ্ঞান (বিশ্লেষণাত্মক জ্ঞান) লাভ করেছিলেন, তারাও অতীত বুদ্ধদের শাসনে সংস্কারোপেক্ষা জ্ঞান পর্যন্ত চর্চা করেছিলেন। এটিই প্রকৃতির নিয়ম। চারটি প্রতিসম্ভিদা জ্ঞান হচ্ছে :

১. অর্থ-প্রতিসম্ভিদা জ্ঞান *(অর্থের বিশ্লেষণাত্মক জ্ঞান)* : কর্মফল সম্পর্কিত বিদর্শন জ্ঞান, যা হচ্ছে দুঃখ আর্যসত্য।

২. ধর্ম-প্রতিসম্ভিদা জ্ঞান *(ধর্মের বিশ্লেষণাত্মক জ্ঞান)* : কারণ বা হেতু সম্পর্কিত বিদর্শন জ্ঞান, যা হচ্ছে দুঃখের কারণ আর্যসত্য।

৩. নিরুক্তি-প্রতিসম্ভিদা জ্ঞান *(ভাষার বিশ্লেষণাত্মক জ্ঞান)* : ভাষার ব্যাকরণ, বিশেষ করে পালি ব্যাকরণ সম্বন্ধে জ্ঞান।

৪. প্রতিভাণ-প্রতিসম্ভিদা জ্ঞান *(বিভিন্ন প্রকার জ্ঞানের বিশ্লেষণাত্মক*

জ্ঞান) : বিদর্শন জ্ঞান যাতে করে উপর্যুক্ত তিনটি জ্ঞান সম্পর্কে জানা যায়।

এই প্রতিসম্ভিদা জ্ঞান লাভের পাঁচটি কারণ আছে :

১. অধিগম *(অর্জন)* : এটি হচ্ছে অর্হত্ত্বমার্গফল লাভ অথবা অন্য কোনো মার্গফল লাভ করা।

২. পরিয়ত্তি *(ত্রিপিটক শাস্ত্রে দক্ষতা)* : ধর্মীয় শাস্ত্র অধ্যয়ন করা।

৩. শ্রবণ *(শোনা)* : ধর্মের ব্যাখ্যা মনোযোগ সহকারে এবং শ্রদ্ধার সাথে শোনা।

৪. প্রতিপ্রশ্ন *(অনুসন্ধান)* : মূল ত্রিপিটক ও অর্থকথাগুলোর জটিল পরিচ্ছেদগুলো সম্বন্ধে আলোচনা করা।

৫. পূর্বযোগ *(অতীতের প্রচেষ্টা)* : অতীত বুদ্ধদের শাসনে শমথ-বিদর্শন ভাবনা করে সংস্কারোপেক্ষা জ্ঞান পর্যন্ত লাভ করা।

যারা অতীত বুদ্ধদের কাছ থেকে সুনির্দিষ্ট কোনো ভবিষ্যদ্বাণী পান নি, অথচ এই শাসনে ভাবনা করেও নির্বাণ লাভ করেন নি, এর কারণ হচ্ছে তাদের পারমী এখনো পরিপূর্ণ হয় নি। এটাও সম্ভব যে তারা আসলেই একটি সুনির্দিষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী পেয়েছেন, অথবা মনে মনে একটা আকাঙ্ক্ষা করেছেন যে ভবিষ্যৎ আর্যমৈত্রেয় বুদ্ধের শাসনে তারা সংসারচক্র থেকে মুক্ত হবেন। উদাহরণস্বরূপ, যশোধরার পরিনির্বাণের সাথে সাথে দুই হাজার ভিক্ষুণীও পরিনির্বাণ লাভ করেছিল একই দিনে। দীপঙ্কর বুদ্ধের সময়ে তারা মনে মনে আকাঙ্ক্ষা করেছিল যে শাক্যমুনি বুদ্ধের সময়ে এই সংসারচক্র থেকে মুক্ত হবে। এ কারণে তারা সংসারচক্রে ঘুরেছিল দীপঙ্কর বুদ্ধের সময় থেকে শাক্যমুনি বুদ্ধের সময় পর্যন্ত। তারা কোনো সুনির্দিষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী লাভ করেনি, কেবল আকাঙ্ক্ষা করেছিল মাত্র।

প্রশ্ন ৪.৩ : *কোনো ভাবনাকারী ভাবনা কোর্স সমাপ্ত করল, কিন্তু মার্গফল লাভ করল না। তাতে যদি তার ধ্যানশক্তি কমে যায়, বিদর্শন-জ্ঞানও কি কমবে? তার কি অপায়ে জন্ম নেওয়ার সম্ভাবনা আছে?*

উত্তর ৪.৩ : কমতে পারে, তবে এমনটা খুব কমই ঘটে। যদি সে দীর্ঘ সময় ধরে ভাবনা চর্চা না করে, তার শমথ-বিদর্শন ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে যেতে পারে। তবে কর্মের শক্তি কিন্তু সুপ্ত অবস্থায় থেকে যায়।

এ বিষয়ে একটি ঘটনা আছে। শ্রীলঙ্কায় কোনো একটা উপলক্ষে ষাটজন ভিক্ষু এবং শ্রামণ মিলে কোথাও যাচ্ছিল। পথে একজন উপাসকের সাথে তাদের দেখা হলো, যে কয়লা এবং আধপোড়া জ্বালানি কাঠ নিয়ে যাচ্ছিল। কিছু কিছু শ্রমণ একজন আরেকজনের সাথে হাসিঠাট্টা করছিল এই বলে, 'এ

হচ্ছে তোমার বাবা', 'এটি হচ্ছে তোমার চাচা' ইত্যাদি। এতে উপাসকটির মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। সে কয়লা ও জ্বালানি কাঠের বোঝা নামিয়ে রেখে মহাথেরোকে বন্দনা করল তাকে কিছুক্ষণ থামানোর জন্য। এরপর সে বলল, 'ভন্তে, আপনি মনে করেন আপনারা ভিক্ষু হয়েছেন কেবল আপনাদের রংবস্ত্রের জন্যই। আপনার যথেষ্ট শমথ ও বিদর্শন জ্ঞান নেই। আমিও একসময় ভিক্ষু ছিলাম। আমার ছিল প্রবল ধ্যানশক্তি এবং প্রচণ্ড অলৌকিক শক্তি।'

এর পরে সে একটি গাছ দেখিয়ে দিয়ে বলল, 'এই গাছের নিচে বসে আমি চন্দ্র-সূর্যকে নিজের হাত দিয়ে ধরতে পারতাম। আমি চন্দ্র-সূর্যকে দিয়ে আমার পা মালিশ করাতাম। কিন্তু শমথ-বিদর্শনের কুশলধর্মগুলোকে অবহেলা করার কারণে *(পমাদ)* আমার ধ্যানশক্তি কমে গেল। ক্লেশগুলো (মনের কলুষতা) আমার মনকে ভারাক্রান্ত করে তুলল। তাই এখন আমি এই কাজ করি। আমাকে উদাহরণ হিসেবে দেখুন, আর কখনই শমথ-বিদর্শনের কুশলধর্মকে অবহেলা *(পমাদ)* করবেন না। দয়া করে আমার মতো হওয়ার চেষ্টা করবেন না।'

তখন সেই ভিক্ষুদের মধ্যে সংবেগ উৎপন্ন হলো। সেখানে দাঁড়িয়েই তারা শমথ-বিদর্শন ভাবনা করে অর্হত্ত্ব লাভ করল। কাজেই শমথ-বিদর্শন হয়তো সাময়িকভাবে কমতে পারে প্রমাদবশত। কিন্তু কর্মশক্তি থেকে যায়, বিনষ্ট হয় না।

সংসারচক্রে তিনটি গতিপথ ধরে একজন ব্যক্তি নির্বাণ লাভ করতে পারে। (আমি এখানে পচ্চেক বুদ্ধদের নিয়ে আলোচনা করব না।) তিনটি গতিপথ হচ্ছে : (১) বোধিসত্ত্বদের গতিপথ, (২) অগ্রশ্রাবক ও মহাশ্রাবকদের গতিপথ, এবং (৩) সাধারণ শ্রাবকদের গতিপথ।

(১) আমাদের বোধিসত্ত্ব দীপঙ্কর বুদ্ধের সময়ে অষ্ট সমাপত্তি (আটটি ধ্যান স্তর) এবং পঞ্চাভিজ্ঞা (পাঁচ প্রকার অলৌকিক শক্তি) লাভী ছিলেন। এ ছাড়াও তিনি সংস্কারোপেক্ষা জ্ঞান পর্যন্ত বিদর্শন জ্ঞান চর্চা করেছিলেন। সেই সময় তিনি যদি সত্যিই নির্বাণ লাভ করতে চাইতেন, তাহলে দীপঙ্কর বুদ্ধের কাছ থেকে চার আর্যসত্যের একটি ছোট্ট গাথা শুনেই দ্রুত অর্হত্ত্ব লাভ করতে পারতেন। কিন্তু তিনি কেবল নির্বাণই লাভ করতে চান নি, তিনি ভবিষ্যতে একজন বুদ্ধ হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন এবং দীপঙ্কর বুদ্ধ থেকে এমন একটি সুনির্দিষ্ট ভবিষ্যদ্বাণীও লাভ করেছিলেন।

চার অসংখ্য এবং একলক্ষ কল্প ধরে, সেই দীপঙ্কর বুদ্ধের সময় থেকে

কাশ্যপ বুদ্ধের সময় পর্যন্ত, আমাদের বোধিসত্ত্ব নয়বার অন্যান্য বুদ্ধদের নিকটে ভিক্ষু হয়েছিলেন। ভিক্ষু হিসেবে তার শিক্ষার মধ্যে প্রত্যেকবারে অন্তর্ভুক্ত ছিল নিম্নোক্ত সাতটি অনুশীলনরীতি :

১. ত্রিপিটক শাস্ত্র আবৃত্তির মাধ্যমে অধ্যয়ন করা,
২. চারি পরিশুদ্ধি শীলে বিশুদ্ধ থাকা,
৩. তেরটি ধুতাঙ্গ অনুশীলন করা,
৪. সব সময় আরণ্যিক ধুতাঙ্গধারী হওয়া,
৫. অষ্ট সমাপত্তিলাভী হওয়া,
৬. পঞ্চ অভিজ্ঞালাভী হওয়া,
৭. সংস্কারোপেক্ষা জ্ঞান পর্যন্ত বিদর্শন ভাবনা করা।

বোধিসত্ত্বদের এটিই রীতি। সর্বজ্ঞতা জ্ঞান লাভের জন্য এই পারমীগুলো অবশ্যই পূর্ণ করতে হবে। কিন্তু তার পারমী পূর্ণ হওয়ার আগে, অর্থাৎ সেই বুদ্ধ হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণীর সময় থেকে রাজকুমার সিদ্ধার্থ হিসেবে জন্মের আগ পর্যন্ত আমাদের বোধিসত্ত্বকে মাঝে মাঝে তির্যক কুলে (পশুপাখির জগৎ) জন্ম নিতে হয়েছে অতীতের অকুশল কর্মের কারণে। ভিক্ষু হিসেবে জীবন কাটানো এবং পশুপাখি হিসেবে জীবন কাটানো, দুটোর মধ্যে বহু দূর ব্যবধান। কিন্তু এটিই বোধিসত্ত্বের গতিপথ।

(২) কয়েকজন প্রধান অর্হৎ শ্রাবক, যেমন সারিপুত্র ভন্তে ও মহামোগ্গল্লান ভন্তে, তারাও সুনির্দিষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী পেয়েছিলেন। তারা পেয়েছিলেন অনোমদর্শী বুদ্ধের কাছ থেকে। কিন্তু তখন থেকে আমাদের বুদ্ধের সময় পর্যন্ত তারাও মাঝে মাঝে পশুপাখির জগতে জন্ম নিয়েছেন অকুশল কর্মের কারণে, মাঝে মাঝে আমাদের বোধিসত্ত্বের সাথেও একত্রে জন্ম নিয়েছেন। আমাদের বুদ্ধের সময়ে তারা চারি প্রতিসম্ভিদাপ্রাপ্ত অর্হৎ হয়েছেন। এ ধরনের অর্হৎদের অবশ্যই শমথ-বিদর্শন ভাবনায় সংস্কারোপেক্ষা জ্ঞান পর্যন্ত দক্ষ হতে হয় অতীত বুদ্ধদের শাসনামলে। এটিই প্রকৃতির নিয়ম। কিন্তু যদিও তারা অনেক অতীত জন্মে শমথ-বিদর্শন ভাবনা করেছিলেন, মাঝেমধ্যে আমাদের বোধিসত্ত্বের সাথে তাদেরও পশুপাখির জগতে জন্ম নিতে হয়েছে। এটি হচ্ছে অগ্রশ্রাবক ও মহাশ্রাবকের গতিপথ।

(৩) সাধারণ শ্রাবকেরা, তারা যদি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে শমথ-বিদর্শন ভাবনার চর্চা করেন একেবারে প্রত্যয়-পরিগ্রহ-জ্ঞান (হেতু-প্রত্যয় সম্বন্ধে জ্ঞান) পর্যন্ত, অথবা উদয়-ব্যয়জ্ঞান পর্যন্ত, অথবা সংস্কারোপেক্ষা জ্ঞান পর্যন্ত, তখন তারা মৃত্যুর পরে আর অপায়ে জন্মগ্রহণ করেন না, যদিও তারা এ জীবনে মার্গফল

লাভ নাও করতে পারেন। তারা অবশ্য স্বর্গে জন্ম নিতে পারেন, যেমন : শ্রমণ দেবপুত্রের কথা ধরা যায়।

শ্রমণ দেবপুত্র ছিল একজন ভিক্ষু যে শমথ-বিদর্শন ভাবনা করেছিল খুব আন্তরিকতার সাথে। সে ভাবনা করতে করতে মারা গেল এবং দেবলোকে জন্ম নিল। সে জানত না যে সে মারা গেছে, তাই সে দেবলোকেও তার দেবপ্রাসাদে ধ্যান করতে লাগল। তার প্রাসাদের দেবীরা বুঝতে পারল যে সে নিশ্চয়ই পূর্বজন্মে ভিক্ষু ছিল। তাই তারা তার সামনে একটি আয়না রেখে দিল এবং শব্দ করল। শব্দ শুনে সে চোখ খুলে তাকাল ও আয়নায় তার চেহারা দেখল। সে খুব হতাশ হলো, কেননা সে দেবতা হতে চায় নি, সে চেয়েছিল কেবল নির্বাণ।

তাই সে তৎক্ষণাৎ বুদ্ধের কাছে গেল ধর্মদেশনা শুনতে। বুদ্ধ তখন চার আর্যসত্য সম্পর্কিত দেশনা দিচ্ছিলেন। দেশনা শোনার পরে সে স্রোতাপত্তি মার্গফল লাভ করল। অর্থকথায় এভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে : '*... লদ্ধস্সাসো লদ্ধপতিট্ঠো নিয়তগতিকো চূলসোতাপন্নো নাম হোতি।*' সে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। কারণ, সে এবার একটি নিরাপদ স্থান খুঁজে পেয়েছে, তার এখন নিশ্চিত সুগতি। তাই তাকে বলা হয় চূল-স্রোতাপন্ন।

যারা মানব জগতে থাকার সময়ে চূল স্রোতাপন্ন হয় তাদের ক্ষেত্রে চারটি জিনিস ঘটতে পারে। বুদ্ধ সোতানুগত সুত্তে বলেছেন সেই চারটির কথা :

১. দেবলোকে জন্ম নিলেও ধর্মকে ভাবার সাথে সাথে বিদর্শন জ্ঞান তার কাছে পরিষ্কার হয়ে ওঠে এবং সে দ্রুত নির্বাণ লাভ করতে পারে।

২. যদি সে বিদর্শন জ্ঞান নিয়ে ধর্মকে চিন্তা করেও নির্বাণ না পায়, তাহলে ঋদ্ধিমান কোনো ভিক্ষু দেবলোকে এসে ধর্মদেশনা করলে সেই দেশনা শোনার সময় সে নির্বাণ লাভ করতে পারে।

৩. যদি ভিক্ষু থেকে দেশনা শোনার সুযোগ না মেলে, তবে ধর্মকথিক দেবপুত্র যেমন সনৎকুমার ব্রহ্মা ইত্যাদিদের কাছ থেকে ধর্ম শোনার সুযোগ পেলে সেই দেশনা শুনে সে নির্বাণ লাভ করতে পারে।

৪. যদি ধর্মকথিক দেবপুত্রদের কাছ থেকেও ধর্মদেশনা শোনার সুযোগ না হয়, তাহলে হয়তো তার বন্ধুদের সাথে দেখা হতে পারে যারা অতীতে কোনো বুদ্ধের শাসনে তার সাথী ভিক্ষু ছিল। উদাহরণস্বরূপ, সেই বন্ধুরা তাকে বলতে পারে : 'আরে দোস্ত, ধর্মের এটি বা ওটি তোমার স্মরণ হয় কি, যেগুলো আমরা মানব জগতে ভিক্ষু হয়ে থাকার সময় চর্চা করেছিলাম?' সে তখন ধর্মকে স্মরণ করতে পারে, আর যদি বিদর্শন চর্চা করে তবে খুব দ্রুত নির্বাণ

লাভ করতে পারে।

তাই সাধারণ শ্রাবক হলে যদি সে এই জীবনে মার্গফল না পায়, তবুও নিশ্চিত সে ভবিষ্যতে নির্বাণ লাভ করতে পারবে।

মৃত্যুর সময়ে ভাবনাকারীর বিদর্শন বা শমথ হয়তো শক্তিশালী নাও থাকতে পারে, কিন্তু শমথ-বিদর্শনের শক্তিশালী কুশল কর্মের কারণে একটি ভালো নিমিত্ত মনোদ্বারে আবির্ভূত হয়। সেই ভালো নিমিত্তকে বিষয়বস্তু করে মৃত্যু হতে পারে, আর কুশল কর্মের কারণে নিশ্চিত সে একটি ভালো জায়গায় জন্ম নেবে এবং সেখানে সে নির্বাণ লাভ করতে পারবে।

তবে যদি সে মরণাসন্ন জবনচিত্ত পর্যন্ত বিদর্শন চর্চা করে থাকে, তাহলে সে হবে সোতানুগত সুত্তে উল্লিখিত প্রথম দলের ব্যক্তি। তা না হলে, আমি যেমনটা বলেছি, সে হতে পারে সোতানুগত সুত্তে উল্লিখিত দ্বিতীয়, তৃতীয় অথবা চতুর্থ দলের ব্যক্তি।

প্রশ্ন ৪.৪ : *কোনো ভাবনাকারী ভাবনা কোর্স শেষ করেও নির্বাণ লাভ করল না, সে কি ধর্মস্থিতি-জ্ঞান (ঘটনা-পরম্পরা জ্ঞান) লাভ করতে পারবে? যদি পারে, তো সেটা কি আবার কমে যেতে পারে?*

উত্তর ৪.৪ : হ্যাঁ, সে পারে। *'পুব্বে খো সুসীমা ধম্মটিঠতিঞাণং পচ্ছা নিব্বানে ঞাণং'*, অর্থাৎ ধর্মস্থিতিজ্ঞান আসে প্রথমে, নির্বাণকে বিষয়বস্তু করে মার্গজ্ঞান আসে এর পরে। এটি ছিল সুসীমের প্রতি বুদ্ধের নির্দেশ। সুসীম ছিল একজন পরিব্রাজক (ভবঘুরে সন্ন্যাসী), যে ধর্মকে 'চুরি' করে নিয়ে যাওয়ার জন্য ভিক্ষু হয়েছিল। কিন্তু, বুদ্ধ দেখেছিলেন যে সে কয়েকদিনের মধ্যে নির্বাণ লাভ করবে, তাই তিনি তাকে ভিক্ষুসংঘে গ্রহণ করেছিলেন।

সুসীম শুনেছিল যে অনেক অর্হৎ ভিক্ষু বুদ্ধের কাছে এসে তাদের অর্হত্ত্বের কথা জানিয়েছে। সুসীম তাদের জিজ্ঞেস করেছে তারা অষ্ট সমাপত্তি এবং পঞ্চ অভিজ্ঞা পেয়েছে কি না। তারা উত্তর দিয়েছিল, 'না'।

'তোমাদের যদি অষ্ট সমাপত্তি না থাকে, পঞ্চ অভিজ্ঞা না থাকে, তাহলে কীভাবে তোমরা অর্হত্ত্ব লাভ করলে?'

তারা উত্তর দিয়েছিল, *'পঞ্ঞাবিমুত্তা খো ময়ং আবুসো সুসীম।'* অর্থাৎ বন্ধু সুসীম, আমরা ক্লেশমুক্ত এবং শুদ্ধ-বিদর্শনের পথ *(সুদ্ধ-বিপস্সনা-য়ানিক)* ধরে অর্হত্ত্ব লাভ করেছি। সে এটি বুঝল না, তাই সে বুদ্ধকে একই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করল। বুদ্ধ বললেন, *'পুব্বে খো সুসীমা ধম্মটিঠতিঞাণং পচ্ছা নিব্বানেঞাণং'*, অর্থাৎ ঘটনা-পরম্পরা জ্ঞান আসে প্রথমে, নির্বাণকে বিষয়বস্তু করে মার্গজ্ঞান আসে এর পরে।

এর মানে কী? মার্গজ্ঞান কোনো অষ্ট সমাপত্তি এবং পঞ্চ অভিজ্ঞার ফল নয়, এটি হচ্ছে বিদর্শন জ্ঞানের ফল। তাই মার্গজ্ঞান আসে কেবল বিদর্শন জ্ঞানের পরেই। অষ্ট সমাপত্তি এবং পঞ্চ অভিজ্ঞার পরে নয়। এই সুসীম সুত্তে সকল বিদর্শন জ্ঞানগুলোকে ঘটনা-পরম্পরা জ্ঞান হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। ঘটনা-পরম্পরা জ্ঞান হচ্ছে সমস্ত সংস্কার ধর্মের অনিত্য, দুঃখময় এবং অনাত্ম স্বভাবের বিদর্শন জ্ঞান, যেখানে সংস্কার ধর্মগুলো হচ্ছে নাম, রূপ এবং তাদের হেতুসমূহ। এভাবেই ঘটনা-পরম্পরা জ্ঞান প্রথমে আসে, এর পরে নির্বাণকে বিষয়বস্তু করে মার্গজ্ঞান আসে।

এর পরে বুদ্ধ ত্রিপরিবর্ত-ধর্মের উপর ধর্মদেশনা দিলেন, যা অনেকটা অনাত্মলক্ষণ সুত্তের মতো। দেশনা শেষে সুসীম অর্হত্ত্ব লাভ করল, যদিও সে অষ্ট সমাপত্তি বা পঞ্চ অভিজ্ঞা লাভ করে নি। সেও শুদ্ধ-বিদর্শক হয়ে গেল। তখন সে পরিষ্কারভাবে বুদ্ধের দেশনা বুঝতে পারল।

যদি ভাবনাকারী এই ঘটনা-পরম্পরা জ্ঞান লাভ করতে পারে, তাহলে যদিও সে এই জীবনে নির্বাণলাভ করতে পারে নি, তার বিদর্শন জ্ঞান কমবে না। তার সুপ্ত বিদর্শন কর্মশক্তি এখনো শক্তিশালী। যদি সে সাধারণ শ্রাবক হয়, তাহলে আগামী জন্মেই সে নির্বাণ লাভ করতে পারে।

প্রশ্ন ৪.৫ : *উপচার ধ্যান নিয়েও কি লোকোত্তর অবস্থায় উপনীত হওয়া যায়?*

উত্তর ৪.৫ : হ্যাঁ, পারা যায়। উপচার ধ্যানেও উজ্জ্বল, দীপ্তিমান আলো আছে। সেই আলোয় একজন ব্যক্তি কলাপগুলোকে দেখতে পারে, পরমার্থ রূপকে দেখতে পারে, পরমার্থ নামকে দেখতে পারে, এবং তাদের কারণগুলোকেও উপলব্ধি করতে পারে। এরপর সে ধাপে ধাপে বিদর্শন ভাবনার পথে অগ্রসর হতে পারে।

প্রশ্ন ৪.৬ : *কেবল ক্ষণিক সমাধি দিয়েও কি বেদনানুস্মৃতি ভাবনার মাধ্যমে লোকোত্তর অবস্থা লাভ করা যায়?*

উত্তর ৪.৬ : এখানে আমাদের ক্ষণিক সমাধি কী তা বুঝা প্রয়োজন। দু ধরনের ক্ষণিক সমাধি আছে : শমথ ভাবনার ক্ষণিক সমাধি এবং বিদর্শন ভাবনার ক্ষণিক সমাধি। শমথ ভাবনায় তিন ধরনের সমাধি আছে : ক্ষণিক সমাধি (এক ধরনের পরিকর্ম সমাধি), উপচার সমাধি (অর্পণা সমাধির পূর্বধাপ বা প্রবেশকালীন সমাধি) এবং অর্পণা সমাধি (অর্পণা সমাধি)। ক্ষণিক সমাধি বলতে বিশেষ করে বুঝানো হয় সেই সমাধিকে যা প্রতিভাগ-নিমিত্তকে তার বিষয়বস্তু হিসেবে নেয়, যেমন, আনাপান প্রতিভাগ-নিমিত্ত। এটি হচ্ছে উপচার

সমাধির আগের সমাধি। এটি হচ্ছে শমথযানীর *(সমথ-য়ানিক)* জন্য।

শুদ্ধ-বিদর্শন যানীর জন্য অন্য এক ধরনের ক্ষণিক সমাধি রয়েছে। একজন শুদ্ধ-বিদর্শনযানী সচরাচর চার ধাতু ভাবনা দিয়ে শুরু করেন উপচার সমাধি অথবা ক্ষণিক সমাধি লাভের জন্য, এবং কলাপ ও কলাপের মধ্যকার চারটি ধাতুকে দেখার জন্য। *বিসুদ্ধিমগ্গ* এটিকে উপচার সমাধি বলে অভিহিত করে। কিন্তু বিসুদ্ধিমগ্গের টীকা বলে যে এটি সত্যিকারের উপচার সমাধি নয়, এটিকে উপচার সমাধি বলাটা রূপকীয় কথাবার্তা মাত্র। কারণ, সত্যিকারের উপচার সমাধি হচ্ছে অর্পণা সমাধির খুব কাছাকাছি।

যদি কোনো ভাবনাকারী চার ধাতু ভাবনা চর্চা করে, তাহলে সে ধ্যান লাভ করবে না, কারণ প্রত্যেক কলাপে চার ধাতুকে দেখাটা খুবই কঠিন। কোনো ব্যক্তি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে প্রত্যেক কলাপের চার ধাতুর উপর মনোযোগ দিতে পারে না, কারণ কলাপগুলো উৎপন্ন হওয়ামাত্রই বিলীন হয়ে যায়। তাই কোনো ব্যক্তিই গভীরভাবে মনোযোগ দিতে পারে না। প্রত্যেক কলাপের চার ধাতু হচ্ছে পরমার্থ রূপ। এটি গভীর এবং নিগূঢ়, এবং যথেষ্ট মনোযোগ না থাকলে সেগুলোকে সহজে পরিষ্কারভাবে দেখা যায় না। এ কারণে উপচার সমাধি, যেখানে বিষয়বস্তু হচ্ছে প্রত্যেক কলাপের চার ধাতু, সেটি সত্যিকারের উপচার সমাধি নয়। এটি আসলে ক্ষণিক সমাধি। বিদর্শনেও ক্ষণিক সমাধি আছে। বিসুদ্ধিমগ্গের আনাপান ভাবনার পরিচ্ছেদে তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। যখন কোনো প্রথম ধ্যানলাভী শমথযানী ব্যক্তি বিদর্শন ভাবনা করতে চায়, সে প্রথম ধ্যানে প্রবেশ করে। এটি হচ্ছে শমথ। এরপর সে এ থেকে বেরিয়ে আসে, এবং প্রথম ধ্যানের চৌত্রিশটি চৈতসিককে দেখে, এরপর এই ধ্যানজাত সংস্কারগুলোর *(ঝান-ধম্ম)* উদয়-ব্যয় স্বভাব দেখার মাধ্যমে সেগুলোর অনিত্য, দুঃখময় এবং অনাত্মকে দেখে। সে দ্বিতীয় এবং অন্যান্য ধ্যানগুলোতেও একইভাবে চর্চা করে।

সেগুলো দেখার সময়ে তখনো সমাধি বিদ্যমান থাকে। সে সেই ধ্যানজাত সংস্কারগুলোর অনিত্য, দুঃখ ও অনিত্য স্বভাবের প্রতি মনোযোগ দেয়। তার সেই সমাধি সেই সময়ে গভীর এবং ব্যাপক। সেটি অন্য কোনো বিষয়বস্তুর দিকে ধাবিত হয় না। এটি হচ্ছে ক্ষণিক সমাধি, কারণ সমাধির বিষয়বস্তুও ক্ষণিক; উৎপত্তি হওয়ামাত্রই বিলীন হয়ে যায়।

একইভাবে, যখন ভাবনাকারী বিদর্শন চর্চা করতে গিয়ে পরমার্থ নামরূপ ও তাদের কারণগুলোর অনিত্য, দুঃখময় ও অনাত্ম স্বভাবকে দেখেন, তখন সাধারণত তার মন বিষয়বস্তুর বাইরে যায় না। তার মন তখন যেকোনো

একটা স্বভাবে ডুবে থাকে। এটিকেও ক্ষণিক সমাধি বলা হয়। এখানে আপনার জেনে রাখা উচিত যে বিদর্শনের ক্ষণিক সমাধি হচ্ছে পরমার্থ নামরূপ ও তাদের কারণগুলোর অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম স্বভাবকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখা। পরমার্থ নামরূপ ও তাদের কারণগুলো না দেখলে কীভাবে সেটা বিদর্শনের ক্ষণিক সমাধি হবে? এটি অসম্ভব। অতএব, ভাবনাকারী যদি কোনো শমথ ধ্যান ছাড়াই পরমার্থ নামরূপ ও তাদের কারণগুলোকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপেও পরিষ্কারভাবে দেখে, তাহলে অবশ্যই শমথ ভাবনা করার তার দরকার নেই। কিন্তু যদি সে পরমার্থ নামরূপ ও তাদের কারণগুলোকে না দেখে, তাহলে তার যেকোনো একটি শমথ ভাবনা করা উচিত, যাতে করে যথেষ্ট সমাধি লাভ করে সেগুলো দেখতে সমর্থ হয়।

খন্ধ-সংযুক্ত এবং সত্য-সংযুক্ততে বুদ্ধ বলেছেন, *'সমাধিং ভিকখবে ভাবেথ, সমাহিতো ভিক্খু য়থাভূতং পজানাতি।'* অর্থাৎ ভিক্ষুগণ, তোমাদের সমাধি গড়ে তোলা উচিত। সমাধি যথেষ্ট পরিমাণে গড়ে উঠলে তোমরা পরমার্থ নামরূপ ও তাদের কারণগুলোকে যথাযথভাবে দেখতে সমর্থ হবে। তাহলে আপনি পঞ্চস্কন্ধ ও তাদের কারণগুলো দেখতে সমর্থ হবেন। আপনি তাদের অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম স্বভাব দেখতে সমর্থ হবেন। আপনি অর্হত্ত্বমার্গে ও পরিনির্বাণের সময় তাদের নিরোধ দেখতে সমর্থ হবেন।

তাই পঞ্চস্কন্ধ, তাদের কারণ এবং তাদের নিরোধকে জানতে হলে সমাধির চর্চা করা উচিত। একইভাবে চারি আর্যসত্যকে জানতে হলেও সমাধি অভ্যাস করা উচিত। সেটাই সত্য-সংযুক্তে বলা হয়েছে।

যদি ভাবনাকারী কেবল বেদনাগুলো দেখতে চায়, তাহলে তার নিম্নোক্ত বিষয়গুলো সম্পর্কে সচেতন থাকা উচিত : *'সব্বং ভিকখবে অনভিজানং অপরি-জানং অবিরাজয়ং অপ্পজহং অভব্বোদুকখকখয়ায়... (পে) ... সব্বঞ্চ খো ভিকখবে অভিজানং পরিজানং বিরাজয়ং পজহং ভব্বোদুকখকখয়ায়।'* অর্থাৎ ভিক্ষুগণ, যদি কোনো ভিক্ষু সকল নাম, রূপ ও তাদের কারণগুলো সম্বন্ধে তিন ধরনের পরিজ্ঞা (পূর্ণ উপলব্ধি) দ্বারা না জানে, তাহলে সে নির্বাণ লাভ করতে পারে না। এটি হচ্ছে সংযুক্তনিকায়ের ষড়ায়তন-বর্গের *অপরিজানন সুত্ত* থেকে।

একইভাবে, সত্য-বর্গের *কূটাগার সুত্তে* বলা হয়েছে যে চারি আর্যসত্যকে বিদর্শন জ্ঞান ও মার্গজ্ঞান দিয়ে না জানলে সংসারদুঃখ অতিক্রম করা যায় না। তাই যদি ভাবনাকারী নির্বাণ লাভ করতে চায়, তার অবশ্যই সকল নাম, রূপ এবং তাদের কারণগুলোকে তিন প্রকার পরিজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করতে হবে।

তিন প্রকার পরিজ্ঞা কী কী? সেগুলো হচ্ছে :

১. জ্ঞাত-পরিজ্ঞা (জ্ঞাত হিসেবে পরিপূর্ণ উপলব্ধি) : এটি হচ্ছে নামরূপ পরিচ্ছেদ জ্ঞান (নামরূপ বিশ্লেষণাত্মক জ্ঞান) এবং প্রত্যয়-পরিগ্রহ জ্ঞান (হেতু-প্রত্যয় দেখার জ্ঞান)। এগুলো হচ্ছে বিদর্শন জ্ঞান যা দিয়ে সকল পরমার্থ নামরূপ এবং তাদের কারণগুলো সম্পর্কে জানা যায়।

২. তীরণ-পরিজ্ঞা (অনুসন্ধানের দ্বারা পরিপূর্ণ উপলব্ধি) : এটি হচ্ছে সংমর্শন জ্ঞান (উপলব্ধির জ্ঞান) এবং উদয়-ব্যয় জ্ঞান। এই দুটি বিদর্শন জ্ঞান পরিষ্কারভাবে পরমার্থ নামরূপ ও তাদের কারণগুলোর অনিত্য, দুঃখ ও অনিত্য স্বভাবকে বুঝে নেয়।

৩. প্রহান-পরিজ্ঞা (পরিত্যাগের দ্বারা পরিপূর্ণ উপলব্ধি) : এটি হচ্ছে ভঙ্গ-জ্ঞান থেকে শুরু করে মার্গজ্ঞান পর্যন্ত উচ্চস্তরের বিদর্শন জ্ঞানগুলো।

অপরিজানন সুত্র এবং কূটাগার সূত্রের শিক্ষা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অতএব, কোনো ভাবনাকারী যদি বেদনানুদর্শন দিয়ে বিদর্শন ভাবনা শুরু করতে চায়, তাহলে তাকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো স্মরণ করতে হবে : তার অবশ্যই পরমার্থ রূপকে জানতে হবে; কেবল বেদনাকে চিনলেই হবে না। তার অবশ্যই আরও চিনতে হবে ছয়দ্বারের চিত্তবীথিগুলোর (চিন্তার প্রক্রিয়া) বেদনা সম্পর্কিত চৈতসিকগুলোকে।

কেন? কারণ, বুদ্ধ বলেছেন, যেকোনো ভিক্ষু যদি সকল নামরূপ ও তাদের কারণগুলোকে তিন প্রকার পরিজ্ঞা দ্বারা না জানে, সে নির্বাণ লাভ করতে পারে না। অতএব, ভাবনাকারীর পক্ষে কেবল বেদনা অনুভব করাই যথেষ্ট নয়, যেমন : পরমার্থ নামরূপকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে না চিনে কেবল দুঃখবেদনাকে চেনাটা যথেষ্ট নয়। এখানে 'যথেষ্ট নয়' মানে হচ্ছে সে নির্বাণ লাভ করতে পারবে না।

প্রশ্ন ৪.৭ : *বুদ্ধ মহান অর্হৎ ছিলেন। তার সাথে সাথে তাঁর শিষ্যরা, যেমন সারিপুত্র ভন্তে এবং মহামোগ্গল্লান ভন্তে, তাদের পার্থক্য কোথায়? তাঁরাও তো অর্হৎ ছিলেন।*

উত্তর ৪.৭ : বুদ্ধের অর্হত্ত্বের মার্গ সব সময় সর্বজ্ঞতা জ্ঞানের সাথে সম্পর্কযুক্ত, কিন্তু তাঁর শিষ্যদের অর্হত্ত্বের মার্গ তো তা নয়। অর্থাৎ, অগ্রশ্রাবক-বোধি, মহাশ্রাবক-বোধি বা সাধারণ শ্রাবক-বোধি, এগুলো মাঝে মাঝে চার প্রতিসম্ভিদা জ্ঞান (বিশ্লেষণ জ্ঞান), ছয় অভিজ্ঞা (ছয়টি সরাসরি জ্ঞান) এবং মাঝে মাঝে ত্রিবিদ্যা, অথবা মাঝে মাঝে শুদ্ধ অর্হত্ত্বমার্গের সাথে সম্পর্কযুক্ত হতে পারে, কিন্তু সর্বজ্ঞতা জ্ঞানের সাথে সম্পর্কযুক্ত নয়। উদাহরণস্বরূপ,

সারিপুত্র ভন্তে এবং মহামোগ্গল্লান ভন্তের অর্হত্ত্বের মার্গ সর্বজ্ঞতা জ্ঞানের সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিল না। অন্যদিকে বুদ্ধের অর্হত্ত্বমার্গ কেবল সর্বজ্ঞতা জ্ঞানের সাথেই সম্পর্কযুক্ত ছিল না, তা অন্যান্য জ্ঞান এবং অন্যান্য বুদ্ধগুণাবলীর সাথেও সম্পর্কযুক্ত ছিল।

আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে, বুদ্ধগণ পারমী পূর্ণ হওয়ার কারণে মার্গ, ফল ও সর্বজ্ঞতা জ্ঞান লাভ করেন নিজে নিজেই, কোনো গুরু ছাড়া। কিন্তু একজন শিষ্য কেবল বুদ্ধ, অথবা তার কোনো শিষ্য থেকে চারি আর্যসত্য সম্পর্কিত ধর্মদেশনা শুনে তবেই মার্গফল লাভ করতে পারেন। তারা সেগুলো গুরু ছাড়া নিজে নিজে ভাবনা করতে পারেন না। এই হচ্ছে পার্থক্য।

প্রশ্ন ৪.৮ : *অন্তর-ভব বা অন্তর্বর্তী জীবন কী?*

উত্তর ৪.৮ : থেরবাদী ত্রিপিটক অনুসারে অন্তর-ভব বা মধ্যবর্তী জীবন বলতে কোনো জিনিস নেই। চ্যুতিচিত্ত (মৃত্যুর শেষ মুহূর্তের চিত্ত) ও প্রতিসন্ধি চিত্তের মধ্যখানে কোনো চিত্তক্ষণ নেই, অথবা এমন কিছু নেই যেটাকে মধ্যবর্তী জীবন বলা যেতে পারে। কোনো ব্যক্তি মৃত্যুর পরে দেবলোকে জন্ম নিলে তার চ্যুতিচিত্ত ও দেবলোকে প্রতিসন্ধিচিত্তের মধ্যে কোনো চিত্তক্ষণ বা মধ্যবর্তী জীবনের মতো কোনো কিছু থাকবে না। যখনই মৃত্যু ঘটে, তখনই দেব-প্রতিসন্ধিচিত্তের জন্ম হয়। একইভাবে যদি কেউ মৃত্যুর পরে নরকে পৌঁছায়, তার চ্যুতিচিত্ত ও নরকের প্রতিসন্ধিচিত্তের মধ্যে মধ্যবর্তী জীবন বলতে কোনো কিছু থাকবে না। সে মৃত্যুর পরে সরাসরি নরকেই যাবে।

মধ্যবর্তী জীবনের ধারণাটা আসে সাধারণত যখন কেউ মরে যায়, কিছু সময়ের জন্য প্রেতলোকে জন্ম নেয় এবং আবার মানুষ হিসেবে জন্মগ্রহণ করে। তারা হয়তো তাদের প্রেতলোকের জীবনটাকে মধ্যবর্তী জীবনের মতো মনে করতে পারে। কিন্তু এটি প্রকৃতপক্ষে মধ্যবর্তী জীবনের মতো কিছু নয়। আসলে যা ঘটে তা হলো : মানবজন্মের চ্যুতিচিত্তের পরে প্রেতলোকের প্রতিসন্ধি চিত্ত আসে। প্রেতলোকের চ্যুতিচিত্তের পরে আবার মানবজন্মের প্রতিসন্ধিচিত্ত আসে। লোকটি তার অকুশলকর্মের কারণে কেবল সামান্য সময়ের জন্য প্রেতলোকে দুঃখ ভোগ করেছিল। যখন তার অকুশলকর্মের কর্মশক্তি ফুরিয়ে আসল, তখন কুশলকর্মের পরিপক্বতার কারণে সে আবার মানবজন্মের প্রতিসন্ধিচিত্ত গ্রহণ করল।

প্রেতলোকের এমন সংক্ষিপ্ত জীবনকে কেউ কেউ মধ্যবর্তী জীবন বলে ভুল করে, কারণ তারা সংসারচক্রের বাস্তবতাকে দেখে না অথবা প্রতীত্যসমুৎপাদ-নীতিকে দেখে না। যদি তারা বিদর্শন জ্ঞান দিয়ে প্রতীত্যসমুৎপাদ-নীতিকে

দেখত, তাহলে এমন মিথ্যা বিশ্বাস উবে যেত। তাই আমি পরামর্শ দেব যে আপনারা আপনাদের নিজ নিজ বিদর্শন জ্ঞান দিয়ে প্রতীত্যসমুৎপাদ-নীতিকে দর্শন করুন। তখন আপনার মন থেকে মধ্যবর্তী জীবন-বিষয়ক প্রশ্ন উধাও হয়ে যাবে।

প্রশ্ন ৪.৯ : *আনাপানস্মৃতি ও চার ধাতু ভাবনার পদ্ধতি কি একই? কেন আমাদের আনাপানস্মৃতির পরেই কেবল চার ধাতু ভাবনা চর্চা করতে হয়?*

উত্তর ৪.৯ : না, পদ্ধতিগুলো এক নয়। যদি আপনি বিদর্শন চর্চা করতে চান, আপনাকে অবশ্যই প্রথমে নামরূপকে চিনতে হবে। দ্বিতীয়ত, আপনাকে অবশ্যই তাদের কারণগুলোকে চিনতে হবে। রূপকে চিনতে হলে আপনাকে অবশ্যই চার ধাতু ভাবনা করতে হবে। বিদর্শনে দু ধরনের ভাবনা আছে : রূপানুদর্শন ভাবনা এবং নামানুদর্শন ভাবনা।

বুদ্ধ যখন রূপানুদর্শন ভাবনা শিক্ষা দিতেন, তিনি সব সময় চার ধাতু ভাবনা শিক্ষা দিতেন, সংক্ষেপে অথবা বিস্তারিতভাবে। তাই, আপনি যদি রূপকে চিনতে চান, আপনাকে অবশ্যই বুদ্ধের নির্দেশ অনুসারে ভাবনা করতে হবে। চার ধাতু ভাবনা সবচেয়ে ভালো হয় আনাপান ভাবনার চতুর্থ ধ্যানের গভীর মনোযোগের সহায়তায়, কারণ এটি আমাদের পরমার্থ রূপ, পরমার্থ নাম ও তাদের কারণগুলোকে পরিষ্কারভাবে দেখতে সাহায্য করে।

কিন্তু আপনি যদি আনাপান ভাবনার মতো কোনো শমথ ভাবনা করতে না চান, তাহলে আপনি সরাসরি চার ধাতু ভাবনা চর্চা করতে পারেন, কোনো সমস্যা নেই। আমরা সেটি নিয়ে আগের প্রশ্নে আলোচনা করেছি।

প্রশ্ন ৪.১০ : *সেয়াদ কি ভাবনার সময় দেখা আলোর ব্যাপারে বিজ্ঞানসম্মতভাবে একটু ব্যাখ্যা করতে পারবেন, প্লিজ?*

উত্তর ৪.১০ : ভাবনার সময় দেখা আলো কী? প্রত্যেকটি চিত্ত, যা হৃদয়বাস্তুর উপর নির্ভর করে উৎপন্ন হয়, তা চিত্তজ-রূপ (চিত্ত দ্বারা উৎপন্ন রূপ) উৎপন্ন করে, যেগুলোকে বলা হয় কলাপ। একটি চিত্ত অনেকগুলো চিত্তজ কলাপ উৎপন্ন করে। হৃদয়বাস্তু-নির্ভর চিত্তগুলো, শমথ-ভাবনার চিত্তগুলো এবং বিদর্শন-ভাবনার চিত্তগুলো খুবই প্রবল ও শক্তিশালী। তারা অনেক অনেক কলাপ উৎপন্ন করে। সেই কলাপগুলোকে বিশ্লেষণ করলে আমরা আট প্রকার রূপ দেখতে পাই। সেগুলো হচ্ছে : পৃথিবীধাতু, আপধাতু, তেজধাতু, বায়ুধাতু, বর্ণ, গন্ধ, রস এবং ওজ। বর্ণরূপটি হচ্ছে উজ্জ্বল। যদি শমথ এবং বিদর্শন ভাবনার চিত্তগুলো শক্তিশালী হয়, বর্ণও উজ্জ্বল হয়। যেহেতু কলাপগুলো একই সাথে এবং ক্রমান্বয়ে উৎপন্ন হয়, এক কলাপের বর্ণ

এবং আরেকটি কলাপের বর্ণ খুব কাছাকাছি একত্রে উৎপন্ন হয়, অনেকটা বৈদ্যুতিক বাল্বের মধ্যে যেমনটা হয়, যার কারণে আলোর উৎপত্তি হয়।

আবার, শমথ এবং বিদর্শন-ভাবনা চিত্তগুলো দ্বারা উৎপন্ন কলাপগুলোর প্রত্যেকটিতে থাকে তেজধাতু, সেটিও অনেক নতুন কলাপ উৎপন্ন করে। এগুলোকে বলা হয় ঋতুজ রূপ (তাপমাত্রা দ্বারা উৎপন্ন রূপ), কারণ তারা তেজধাতু দ্বারা সৃষ্ট, আর এই তেজধাতু হচ্ছে ঋতু বা তাপমাত্রা। এটি কেবল অভ্যন্তরীণভাবে ঘটে না, বাহ্যিকভাবেও ঘটে। যখন আমরা এই কলাপগুলোকে বিশ্লেষণ করি, তখন সেখানে সেই একই আট প্রকার রূপ থাকে : পৃথিবীধাতু, আপধাতু, তেজধাতু, বায়ুধাতু, বর্ণ, গন্ধ, রস এবং ওজ। এখানেও বর্ণ আছে। শমথ এবং বিদর্শন-ভাবনার চিত্তগুলোর শক্তির কারণে সেই বর্ণও উজ্জ্বল হয়। তাই একটি বর্ণের উজ্জ্বলতা এবং আরেকটি বর্ণের উজ্জ্বলতা খুব কাছাকাছি সময়ে একত্রে উৎপন্ন হয়, বৈদ্যুতিক বাল্বের মধ্যে আলোর উৎপত্তি হওয়ার মতো।

চিত্তজ রূপ এবং ঋতুজ রূপের আলো একসাথে আবির্ভূত হয়। চিত্তজ বর্ণরূপ কেবল অভ্যন্তরীণভাবে উৎপন্ন হয়, কিন্তু ঋতুজ বর্ণরূপ অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক উভয়ভাবে উৎপন্ন হয় এবং চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। শমথ ও বিদর্শন ভাবনা-চিত্তগুলোর শক্তির উপরে নির্ভর করে এই আলো পুরো চক্রবালকেও আলোকিত করতে পারে, অথবা তারও বেশি দূর যেতে পারে। একজন বুদ্ধের নামরূপ পরিচ্ছেদ জ্ঞান যে আলো উৎপন্ন করে, তাতে দশ হাজার চক্রবাল (মহাবিশ্ব) আলোকিত হয়। অনুরুদ্ধ ভন্তের দিব্যচক্ষু-চিত্তজাত আলো এক হাজার চক্রবালকে আলোকিত করেছিল। অন্যান্য শ্রাবকদের বিদর্শন জ্ঞানজাত আলো তাদের শমথ এবং বিদর্শন ভাবনা-চিত্তগুলোর শক্তির উপরে নির্ভর করে এক যোজন, দুই যোজন ইত্যাদি দূরত্ব অতিক্রম করে। সাধারণত অনেক ভাবনাকারী যখন উদয়-ব্যয় জ্ঞানে পৌঁছে যায়, তারা বুঝতে পারে যে এই আলো হচ্ছে একগুচ্ছ কলাপ মাত্র। শমথ ভাবনার সময় তারা তখনো বুঝতে পারে না যে এই আলো হচ্ছে কলাপের গুচ্ছ, কারণ কলাপগুলো খুব সূক্ষ্ম। কেবল শমথ ভাবনা করার সময়ে কলাপগুলোকে বুঝা এবং দেখা সহজ নয়। যদি আপনি নিশ্চিতভাবে জানতে চান, তাহলে আপনার উদয়-ব্যয়জ্ঞান অর্জনের চেষ্টা করা উচিত। সেটাই হচ্ছে ভাবনার সময় দেখা আলোকে বুঝার সবচেয়ে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি।

প্রশ্ন ৪.১১ : *যারা দেহের বত্রিশটি অংশের ভাবনা করেছে তারা কি অন্যজনের ভেতরের অংশগুলোও চোখ খোলা রেখে দেখতে পারে?*

উত্তর ৪.১১ : এটি অনেক কিছুর উপর নির্ভর করে। নবীনরা চোখ খোলা রেখে কেবল বাইরের অংশগুলো দেখতে পারে। তারা ভেতরের অংশগুলো দেখতে পারে কেবল তাদের বিদর্শন জ্ঞানচক্ষু দিয়ে। যদি আপনি এটিকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে জানতে চান, দয়া করে নিজের বিদর্শন জ্ঞান দিয়ে দেখার চেষ্টা করুন।

এক মহাথেরো অবশ্য তার আগের চর্চার কারণে চোখ খোলা রেখেই ভেতরের কঙ্কাল দেখতে পারতেন। এই মহাথেরো ছিলেন মহাতিষ্য ভন্তে, যিনি ছিলেন কঙ্কাল ভাবনায় সুদক্ষ। মহাতিষ্য ভন্তে সব সময় বিরূপতা-ভাবনা হিসেবে অভ্যন্তরীণ কঙ্কাল-ভাবনা করে প্রথম ধ্যান চর্চা করে এরপর বিদর্শন ভাবনা করতেন। তিনি নামরূপ, তাদের কারণ, তাদের অনিত্য, দুঃখ ও অনিত্য স্বভাবকে জানতেন। এটি ছিল তার সচরাচর ভাবনাচর্চার পদ্ধতি।

একদিন তিনি পিন্ডপাতে গেলেন, অনুরাধাপুর থেকে মহাগ্রাম নামের এক গ্রামে। পথে তিনি এক মহিলাকে দেখলেন যে জোরে জোরে হেসে হেসে তার মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করছিল। শব্দ শুনে তিনি যখন তার দিকে তাকালেন, তিনি দেখলেন কেবল তার দাঁত, এবং তিনি এগুলোকে তার ভাবনার বিষয়বস্তু করলেন। তার সব সময়ের ভাবনার কারণে তিনি তাকে দেখলেন একটি কঙ্কাল হিসেবে, মহিলা হিসেবে নয়। তিনি কেবল দেখলেন একটি কঙ্কালকে। এরপর তিনি নিজের কঙ্কালের উপর মনোযোগ দিলেন, প্রথম ধ্যান লাভ করলেন এবং দ্রুত বিদর্শন ভাবনা করলেন। তিনি সেই রাস্তার উপরে দাঁড়িয়ে অর্হত্ত্ব লাভ করলেন।

মহিলাটি তার স্বামীর সাথে ঝগড়া করে পালিয়ে তার বাপের বাড়ি যাচ্ছিল। তার স্বামী তাকে অনুসরণ করে মহাতিষ্য ভন্তের মুখোমুখি হলো। সে তাকে জিজ্ঞেস করল, 'ভন্তে, আপনি কি কোনো মহিলাকে এই পথে যেতে দেখেছেন?' মহাথেরো উত্তর দিলেন, 'হে দায়ক, আমি পুরুষ বা মহিলা কোনোটাই দেখি নি, আমি কেবল একটি কঙ্কালকে এই পথ দিয়ে যেতে দেখেছি।' এই গল্পটি আছে বিসুদ্ধিমগ্গের শীল অধ্যায়ে।

এটি হচ্ছে একটি উদাহরণ, কীভাবে একজন ভিক্ষু, যে মহাতিষ্য ভন্তের মতো কঙ্কাল ভাবনা করেছে পরিপূর্ণভাবে, সে তার চোখ খোলা রেখেই আরেকজনের কঙ্কালকে দেখতে পারে। ❑

[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[দেশনা ৫]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]

কীভাবে আপনি নামকে দেখবেন

গত দেশনাতে আমি ব্যাখ্যা করেছিলাম কীভাবে চার ধাতু ভাবনা করতে হয়, এবং কীভাবে রূপকলাপ নামক রূপের কণাগুলোকে বিশ্লেষণ করতে হয়। এই দেশনায় আমি একটু ব্যাখ্যা করতে চাই কীভাবে নাম-কর্মস্থান ভাবনা করতে হয়, যা হচ্ছে বিদর্শন ভাবনার পরবর্তী ধাপ।

শুরুতে নামকে বুঝার জন্য প্রয়োজনীয় অভিধর্মের মৌলিক কিছু কথা সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করা যাক।

অভিধর্মে বলা হয়েছে, মন গঠিত হয় একটি চিত্ত—যা বিষয়কে জানে এবং তার সহযোগী চৈতসিকগুলো, যেগুলো চিত্তের সাথে উৎপন্ন হয়, সেগুলো নিয়ে। এমন চৈতসিকের সংখ্যা বায়ান্নটি, উদাহরণস্বরূপ, স্পর্শ, বেদনা, সংজ্ঞা (উপলব্ধি), চেতনা (ঝোঁক), একাগ্রতা, জীবিতেন্দ্রিয় এবং মনস্কার (মনোযোগ)।

সর্বমোট ঊননব্বই প্রকার চিত্ত আছে যেগুলোকে ভাগ করা যায় কুশল, অকুশল অথবা অব্যাকৃত তথা অনির্দিষ্টরূপে; তাদের অবস্থানের জগৎ ভেদে কামাবচর (ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ), রূপাবচর (সূক্ষ্ম রূপভূমি) এবং অরূপাবচর (অরূপভূমি), অথবা লোকোত্তর হিসেবে। আমরা অবশ্য কেবল দু ধরনের মৌলিক চিত্ত নিয়ে বলব, বীথিচিত্ত (চিন্তার প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত চিত্তগুলো) এবং বীথিমুক্ত চিত্ত (চিন্তা-প্রক্রিয়ার বাইরের চিত্তগুলো), যেমন : প্রতিসন্ধিচিত্ত, ভবাঙ্গচিত্ত ও চ্যুতিচিত্ত।

ছয় ধরনের চিত্তবীথি বা চিন্তার প্রক্রিয়া আছে। প্রথম পাঁচটি হচ্ছে চক্ষুদ্বার, কর্ণদ্বার, ঘ্রাণদ্বার, জিহ্বাদ্বার, এবং কায়দ্বারের চিত্তবীথি যাদের বিষয়বস্তুগুলো হচ্ছে যথাক্রমে দৃশ্যমান রূপ, শব্দ, গন্ধ, স্বাদ ও স্পর্শ। এগুলোকে একত্রে বলা হয় পঞ্চদ্বারবীথি। ষষ্ঠ বীথিটি হচ্ছে মনোদ্বারবীথি। প্রত্যেকটি বীথিতে বিভিন্ন ধরনের চিত্তের একটি ধারাবাহিক ক্রম থাকে। যেকোনো বীথিতে চিত্তগুলো তাদের স্বাভাবিক ধারাবাহিক ক্রমে উৎপন্ন হয় চিত্ত-নিয়ম অনুসারে।

আপনি যদি নামকে দেখতে চান, তাহলে আপনাকে অবশ্যই সেই স্বাভাবিক ক্রমে চিত্তগুলো যখন উৎপন্ন হয়, তখন তাদের চিনতে হবে। সেটা করতে হলে আপনাকে অবশ্যই প্রথমে আনাপান স্মৃতির ভাবনায় অথবা চার-ধাতু ভাবনায় ধ্যান লাভ করতে হবে। যদি আপনি শুদ্ধ বিদর্শন ভাবনাকারী হন, তবে আপনাকে অবশ্যই রূপ-কর্মস্থান ভাবনা শেষ করতে হবে। কেবল তখনই আপনার নাম-কর্মস্থান ভাবনা করার চেষ্টায় নামা উচিত।

নামকে দেখতে হয় চারটি ধাপে। যেগুলো দেখতে হবে, সেগুলো হচ্ছে :

১. অভ্যন্তরীণভাবে উৎপন্ন হওয়া সকল ধরনের চিত্তকে চিনতে হবে।

২. সকল ধরনের চিত্তে প্রত্যেকটি চৈতসিকগুলোকে চিনতে হবে।

৩. চিত্তের ধারাবাহিক উৎপত্তির ক্রম অর্থাৎ ছয়দ্বারে ঘটে যাওয়া চিত্তবীথিগুলোকে চিনতে হবে।

৪. বাহ্যিক নামকে জানতে হবে।

ধ্যান-চিত্তবীথি

ধরা যাক, আপনি আনাপানস্মৃতির মাধ্যমে ধ্যান লাভ করেছেন। তাহলে নামকে জানার জন্য শুরু করার সবচেয়ে ভালো জায়গা হচ্ছে সেই ধ্যানের চিত্ত ও চৈতসিকগুলোকে জানা।

এর দুটি কারণ আছে। প্রথম কারণ হচ্ছে, ধ্যান গড়ে তোলার সময় আপনি পাঁচটি ধ্যানাঙ্গকে চিনেছেন, তার মানে হচ্ছে চৈতসিকগুলোকে চেনার ব্যাপারে ইতিমধ্যেই আপনার কিছুটা অভিজ্ঞতা হয়েছে। দ্বিতীয় কারণটা হচ্ছে, ধ্যান-জবনচিত্ত পর পর অনেকবার উৎপত্তি হয়, তাই সেটিকে চেনা সহজ। এটি হচ্ছে কামাবচর-বীথির বিপরীত, যেখানে জবনচিত্ত ঘটে কেবল সাতবার, এর পর পরই নতুন একটি চিত্তবীথি শুরু হয়।

অতএব, আনাপানস্মৃতির প্রথম ধ্যানে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করুন। এ থেকে বেরিয়ে এসে ভবাঙ্গ বা মনোদ্বার এবং আনাপান প্রতিভাগ-নিমিত্তকে একসাথে দেখুন। যখন ভবাঙ্গে নিমিত্ত হাজির হবে, পাঁচটি ধ্যানাঙ্গকে চিনে নিন।

১. বিতর্ক *(বিতক্ক)* : মনকে বিষয়বস্তুতে তথা আনাপান প্রতিভাগ-নিমিত্তে পরিচালনা করা ও সেখানে স্থাপন করা।

২. বিচার *(বিচার)* : মনকে বিষয়বস্তুতে তথা আনাপান প্রতিভাগ-নিমিত্তে ধরে রাখা।

৩. প্রীতি *(আনন্দ)* : আনাপান প্রতিভাগ-নিমিত্তকে নিয়ে একধরনের আনন্দের ভাব।

৪. সুখ : আনাপান প্রতিভাগ-নিমিত্তকে নিয়ে সুখী ভাব।

৫. একাগ্রতা : আনাপান প্রতিভাগ-নিমিত্তের উপরে একাগ্রতা।

চর্চা করতে থাকুন, যতক্ষণ না প্রত্যেকটি প্রথম ধ্যান-জবনচিত্তের সকল ধ্যানাঙ্গগুলোকে একবারেই চিনে নিতে পারেন। এরপর অন্যান্য চৈতসিকগুলোকেও দেখুন। শুরু করুন বিজ্ঞান, স্পর্শ অথবা বেদনা—যেটি সবচেয়ে সহজে ধরে নিতে পারেন সেটাকে দিয়ে। অবশিষ্ট চৈতসিকগুলোকেও একটি একটি করে যোগ করে দেখে নিন : প্রথমবারে এক শ্রেণির, দ্বিতীয়বারে দুই শ্রেণির, তৃতীয়বারে তিন শ্রেণির চিত্ত মিলিয়ে, ইত্যাদি। যতক্ষণ না প্রথম-ধ্যানের জবন-চিত্তের চৌত্রিশ প্রকার চৈতসিকের সবগুলোকে দেখতে না পান, ততক্ষণ চর্চা করে যান।

এরপরে মনোদ্বার-বীথির প্রত্যেকটি চিত্তের সকল চৈতসিকগুলোকে দেখে নিন প্রথম ধ্যানের মাধ্যমে।

প্রথম ধ্যানের মনোদ্বার-বীথিতে ছয় ধরনের চিত্ত থাকে। প্রথমটি হচ্ছে মনোদ্বারাবর্তন চিত্ত (মনের দরজা-অভিমুখী চিত্ত), যাতে বারোটি চৈতসিক থাকে। বাকি পাঁচ প্রকার চিত্তের প্রত্যেকটিতে চৌত্রিশটি করে চৈতসিক উৎপন্ন হয়, যথা : পরিকর্ম (পরিকর্ম চিত্ত), উপচার (উপচার চিত্ত), অনুলোম (অনুরূপ চিত্ত), এবং সবশেষে বিরামহীন ক্রমে উৎপন্ন হয় ধ্যান-জবনচিত্তগুলো।

এগুলোকে দেখতে হলে আপনাকে অবশ্যই প্রথম ধ্যানে প্রবেশ করতে হবে, যেমন আনাপান ভাবনার প্রথম ধ্যানে। সেখান থেকে বেরিয়ে এসে ভবাঙ্গ ও আনাপান প্রতিভাগ-নিমিত্তকে একত্রে দেখতে হবে। যখন ভবাঙ্গে নিমিত্ত আবির্ভূত হবে, তখন মনোদ্বার-চিত্তবীথিকে দেখুন। প্রথম ধ্যানের মনোদ্বারবীথির প্রত্যেকটি চিত্তকে তাদের বারোটি বা চৌত্রিশ শ্রেণির চৈতসিকগুলোসহ দেখে নিন।

সকল নাম *(নাম)* বা সকল চৌত্রিশ প্রকারের চৈতসিকগুলোর সাধারণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, তারা সব সময় বিষয়বস্তুর প্রতি নমিত ও সংশ্লিষ্ট থাকে। আপনি সকল নামের এই সাধারণ বৈশিষ্ট্যকে উপলব্ধি করুন। সেই সাথে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ আনাপান ধ্যানের নামকেও আপনার চেনা এবং বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। তা ছাড়াও অন্যান্য যেসব ভাবনায় আপনি ধ্যান লাভ

করতে পেরেছেন, যেমন অশুভ, সাদা কৃৎস্ন, মৈত্রী ইত্যাদি ভাবনায় প্রাপ্ত ধ্যানের নামকেও চেনা এবং বিশ্লেষণ করা দরকার।

তবে আপনি যদি কেবল চার ধাতু ভাবনায় উপচার ধ্যান লাভ করে থাকেন, তাহলে নামের বিশ্লেষণ অবশ্যই সেখান থেকে শুরু করতে হবে। ধ্যান লাভ না করলে আপনি কোনো ধ্যানচিত্তের নামকে চিনতে পারবেন না। সেক্ষেত্রে আপনাকে অবশ্যই চার ধাতু ভাবনার উপচার ধ্যানে প্রবেশ করতে হবে, যেখানে আপনার দেহের স্বচ্ছ রূপটি ঝিকমিক করে আলো ছড়ায়। সেখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে এবার বিদর্শনের দিকে মন দিন সতেজ ও পরিষ্কার মন নিয়ে এবং সেই ধ্যানের নামকে দেখে নিন। আগের সকল শমথ ভাবনার উপচার অথবা অর্পণা সমাধির চিত্তবীথিগুলো দেখে নিয়ে এবার আপনি কামাবচরবীথির বিভিন্ন চৈতসিকগুলোকে দেখার জন্য অগ্রসর হোন।

কামাবচর-বীথি

যোনিশ এবং অযোনিশ মনস্কার

কামাবচর-চিত্তবীথি হচ্ছে হয় কুশল অথবা অকুশল। এটি নির্ভর করে যোনিশ মনস্কার (দক্ষ মনোযোগ) এবং অযোনিশ মনস্কারের (অদক্ষ মনোযোগ) উপরে। কোনো কামাবচর চিত্ত কুশল কি অকুশল তা নির্ধারণের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে মনস্কার বা মনোযোগ। যদি আপনি কোনো বিষয়বস্তুর দিকে তাকান এবং এটিকে রূপ, নাম, কারণ অথবা ফল, অনিত্য, দুঃখ, অনাত্ম, অথবা অশুভ হিসেবে জানেন, তখন আপনার মনোযোগ হচ্ছে যোনিশ মনস্কার বা দক্ষ মনোযোগ। জবন চিত্ত তখন কুশল-জবনচিত্ত হয়।

যদি আপনি কোনো বিষয়বস্তুর দিকে তাকান এবং এটিকে ধারণা (concept) হিসেবে দেখেন, যেমন পুরুষ, নারী, সত্ত্ব, সোনা, রূপা, অথবা নিত্য, সুখ, অথবা আত্ম বা নিজ হিসেবে দেখেন, তখন আপনার মনোযোগ হচ্ছে অযোনিশ মনস্কার বা অদক্ষ মনোযোগ। জবনচিত্ত তখন অকুশল-জবনচিত্ত হয়।

কিছু ব্যতিক্রম আছে অবশ্য, যেখানে ধারণার সাথে সংশ্লিষ্ট কোনো জবনচিত্ত (impulsion consciousness) কুশল-জবনচিত্ত হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, মৈত্রী-ভাবনার সময়ে এবং দান করার সময়ে। চিত্তবীথিগুলো বুঝলে আপনি পার্থক্যটা ধরতে পারবেন।

মনোদ্বার-চিত্তবীথি

কামাবচর-চিত্তবীথিকে দেখতে হলে আপনার শুরু করা উচিত মনোদ্বার-চিত্তবীথি দিয়ে। কারণ, সেখানে বিভিন্ন ধরনের চিত্তের সংখ্যা কিছুটা কম।

কামাবচর কুশল মনোদ্বার-চিত্তবীথির সাথে সংশ্লিষ্ট নামকে চিনতে হলে আপনাকে প্রথমে মনোদ্বারটা চিনে নিতে হবে এবং চক্ষু-প্রসাদ-ধাতুকে দেখতে হবে। যখন এটি মনোদ্বারে আবির্ভূত হবে, তখন একটি চিত্তবীথির উৎপত্তি হবে।

কামাবচর কুশল মনোদ্বার-চিত্তবীথিতে তিন ধরনের চিত্ত থাকে। প্রথমে থাকে বারোটি চৈতসিকসহ মনোদ্বারাবর্তন চিত্ত, এরপরে থাকে চৌত্রিশ, তেত্রিশ অথবা বত্রিশটি চৈতসিকযুক্ত সাতটি জবনচিত্ত, এরপরে থাকে দুটি তদালম্বন-চিত্ত যেগুলোর প্রত্যেকটির সাথে চৌত্রিশটি, তেত্রিশটি, বত্রিশটি, বারোটি, অথবা এগারটি চৈতসিক থাকে।

আপনার সেই মনোদ্বার-চিত্তবীথির চিত্তগুলোর চৈতসিকগুলোকে বার বার দর্শন করা উচিত। ধ্যান-মনোদ্বার-চিত্তবীথিতে যেমনটা করেছেন, সেভাবেই চৈতসিক দেখা শুরু করুন বিজ্ঞান, বেদনা অথবা স্পর্শ দিয়ে। একবারে একটি একটি করে চৈতসিক যোগ করুন। প্রথমে এক শ্রেণির চৈতসিক, এর পরে দুই শ্রেণির, এরপরে তিন শ্রেণির, এভাবে। যতক্ষণ না আপনি কামাবচর কুশল মনোদ্বার-চিত্তবীথির প্রত্যেকটি চিত্তের চৌত্রিশ, তেত্রিশ, অথবা বত্রিশ প্রকারের চৈতসিকগুলোকে দেখতে সমর্থ হন ততক্ষণ পর্যন্ত চর্চা করুন।

রূপ-কর্মস্থান ভাবনার সময়ে আপনি যে সত্যিকারের আঠার প্রকার রূপ এবং দশ প্রকার কৃত্রিম রূপকে পরীক্ষা করেছেন, এগুলোর প্রত্যেকটি রূপকে দেখামাত্র যে সকল মনোদ্বার-চিত্তবীথি উৎপন্ন হয়, সেই চিত্তবীথিগুলোকেও আপনার জানা প্রয়োজন।

পঞ্চদ্বার-চিত্তবীথি

মনোদ্বার-চিত্তবীথিকে জানা শেষ হলে এবার আপনার পঞ্চদ্বার-চিত্তবীথিগুলোকে জানতে অগ্রসর হওয়া উচিত। শুরু করুন চক্ষুদ্বার-চিত্তবীথি দিয়ে। চক্ষুদ্বার-চিত্তবীথির প্রত্যেকটি চিত্তের চৈতসিকগুলোকে জানতে হলে আপনি প্রথমে দেখুন চক্ষুদ্বার, এরপরে মনোদ্বার, এরপরে দুটোকে একই সাথে দেখুন।

এবার উভয় দ্বারের সন্নিকটে কোনো একগুচ্ছ কলাপের বর্ণের উপরে মনোযোগ স্থাপন করুন। এই পর্যায়ে আপনি প্রথমে একটি চক্ষুদ্বার-চিত্তবীথি এবং পরে একটি মনোদ্বার-চিত্তবীথিকে উৎপন্ন হতে দেখবেন, দুটোরই বিষয়বস্তু একই।

চক্ষুদ্বার-চিত্তবীথিতে সাত প্রকার চিত্ত ক্রমান্বয়ে উৎপন্ন হয়। যথা :

১. এগারটি চৈতসিক সহকারে পঞ্চদ্বারাবর্তন চিত্ত,

২. আটটি চৈতসিকসহ চক্ষুবিজ্ঞান,

৩. এগারটি চৈতসিকসহ সম্প্রতীচ্ছ চিত্ত (গ্রহণকারী চিত্ত—receiving consciousness),

৪. এগার অথবা বারোটি চৈতসিক নিয়ে সন্তীরণ চিত্ত (অনুসন্ধানী চিত্ত—investigatingconsciousness),

৫. বারোটি চৈতসিকসহ ব্যবস্থাপন চিত্ত (নির্ধারক চিত্ত—determining consciousness),

৬. চৌত্রিশ, তেত্রিশ, অথবা বত্রিশটি চৈতসিকসহ সাতটি জবনচিত্ত (তাড়ন চিত্ত—impulsion consciousness),

৭. চৌত্রিশ, তেত্রিশ, বত্রিশ, বারো, অথবা এগারটি চৈতসিকসহ দুটি তদালম্বন চিত্ত (নিবন্ধন চিত্ত—registration consciousness)।

এরপরে ভবাঙ্গ চিত্তগুলো ক্রমান্বয়ে উৎপন্ন হয় এবং তার পরে মনোদ্বার বীথির তিন প্রকার চিত্তগুলো আগের উক্ত ক্রমে : মনোদ্বারাবর্তন, সাতটি জবন এবং দুটি তদালম্বন চিত্ত উৎপন্ন হয়।

উপর্যুক্ত দুটি ধারা দেখে নিয়ে এবার সকল চৈতসিকগুলোকে দেখুন। শুরু করুন বিজ্ঞান, স্পর্শ অথবা বেদনা দিয়ে। একবারে একটা করে যোগ করুন যতক্ষণ না প্রত্যেক চিত্তের সকল চৈতসিকগুলো দেখতে পান।

এরপর অন্যান্য চারটি দ্বার—কর্ণ, ঘ্রাণ, জিহ্বা এবং কায়দ্বারের চিত্তবীথিগুলোও দেখে নিন।

এই পর্যায়ে আপনি কুশলচিত্তগুলোর সাথে সংশ্লিষ্ট নামকে দেখার দক্ষতা অর্জন করে ফেলবেন। এখন অকুশল চিত্তগুলোর সাথে সংশ্লিষ্ট নামকে দেখা প্রয়োজন। এটি করতে হলে আপনি কুশল চিত্তগুলোর জন্য যে বিষয়বস্তু নিয়েছেন, সেটিকেই নিন, তবে এবার অযোনিশ মনস্কার স্থাপন করুন। এটি বিস্তারিত ব্যাখ্যা করে বলার সময় এখন নেই, তবে আমি আশা করি এখানে দেওয়া উদাহরণগুলো আপনার অভ্যন্তরীণ রূপকে দেখার জন্য কী কী করতে

হবে তা বুঝার জন্য যথেষ্ট হবে।

সবশেষে, আপনি এতক্ষণ পর্যন্ত নাম দেখার তিনটি পর্যায় সম্পূর্ণ করেছেন আর ক্রমান্বয়ে দেখে নিয়েছেন :

১. অভ্যন্তরীণভাবে যেসব চিত্ত উৎপন্ন হয়, সেসব চিত্তকে।

২. সকল প্রকার চিত্তের প্রত্যেকটি চৈতসিককে।

৩. ছয়দ্বারে উৎপন্ন চিত্তবীথিগুলোকে।

বাহ্যিক নামকে দেখা

চতুর্থ ধাপে এখন বাইরের নামকে দেখার পালা। শুরু করুন অভ্যন্তরীণ চার ধাতুকে দেখার মধ্য দিয়ে। এরপর বাহ্যিক ধাতুগুলোকে দেখুন, আপনি যে কাপড় পরে আছেন, সেই কাপড়ের মধ্যে। আপনি দেখবেন যে আপনার কাপড়চোপড় কলাপে রূপান্তরিত হয়েছে। প্রত্যেকটি কলাপের আট প্রকার রূপকে আপনি দেখতে পাবেন। এগুলো হচ্ছে ঋতুজ ওজ-অষ্টক-কলাপ এবং এগুলো প্রত্যেকটি বাহ্যিক কলাপের তেজধাতু থেকে উৎপন্ন হয়।

অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক রূপকে এভাবে পালাক্রমে তিন বা চারবার দেখুন, এরপরে ধ্যানের আলোয় আরেকটু দূরের জিনিস দেখুন, যেমন ঘরের মেঝে। সেখানেও আপনি প্রত্যেক কলাপের মধ্যে আট প্রকার রূপ দেখতে পাবেন এবং বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ রূপকে এক্ষেত্রেও পালাক্রমে তিন-চারবার দেখুন।

আস্তে আস্তে আপনার রূপ দেখার সীমা বাড়িয়ে নিতে থাকুন যে বিল্ডিংয়ে বা বাড়িতে আপনি বসে আছেন সেটি, তার আশেপাশে, গাছপালাসহ ইত্যাদি, যতক্ষণ না আপনি সকল বাহ্যিক নির্জীব রূপকে দেখতে পান।

আপনি নির্জীব বস্তুগুলোর মাঝে স্বচ্ছ রূপও দেখতে পাবেন। এগুলো হচ্ছে গাছপালা, বিল্ডিং প্রভৃতির মধ্যে থাকা পোকামাকড় এবং অন্যান্য ছোটখাট প্রাণী।

এবার আপনি সজীব সত্ত্বদের বাহ্যিক রূপকে দেখতে অগ্রসর হোন, অন্যান্য জীবিত প্রাণীদের রূপকে দেখতে এগিয়ে যান।

এভাবে আপনি কেবল তাদের রূপকে দেখছেন, কোনো পুরুষ, মহিলা, ব্যক্তি বা কোনো সত্ত্ব হিসেবে দেখছেন না। কেবল রূপকেই দেখছেন। এক নজরেই সকল বাহ্যিক রূপকে দেখে নিন, এরপর অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক বিভিন্ন প্রকার রূপকে দেখে নিন।

এটি করতে গিয়ে আপনার দেখা উচিত চোখের ছয়টি মৌলিক ধরনের

কলাপ, যথা : চক্ষু-দশক, কায়-দশক, ভাব-দশক এবং তিনটি ওজ-অষ্টক-কলাপ, অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক উভয় প্রকারে। আগে যেভাবে রূপকে দেখেছেন, সেভাবেই চুয়ান্ন প্রকার রূপকে দেখে নিন, তবে এখন অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক উভয় প্রকারে। অবশিষ্ট পাঁচটি আয়তন, অবশিষ্ট বিভিন্ন রূপকেও একইভাবে দেখুন। রূপকে সম্পূর্ণরূপে দেখে নিয়ে এবার আপনি নামকে অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিকভাবে দেখতে অগ্রসর হোন।

অভ্যন্তরীণ নামকে দেখার জন্য আপনি আবার মনোদ্বার এবং পঞ্চদ্বার-চিত্তবীথি দিয়ে শুরু করুন। তাদের সকল কুশল ও অকুশল চৈতসিকগুলোকে দেখুন।

বাহ্যিক নামকে দেখার জন্য আপনি এবার অন্য একজনের চোখ এবং মনোদ্বারকে দেখুন। যখন এই উভয় দ্বারের কাছাকাছি কোনো একগুচ্ছ কলাপের বর্ণ উভয়দ্বারে আবির্ভূত হয়, তখন তাদের উভয়দ্বারের চিত্তবীথিগুলোকে দেখুন। বার বার এভাবে অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিকভাবে দেখুন। অন্যান্য চারটি দ্বারেও একইভাবে দেখুন।

যদি আপনি ধ্যানলাভী হন, তাহলে বাহ্যিক মনোদ্বার-চিত্তবীথির ধ্যানচিত্তগুলোও আপনার জানা উচিত।

এভাবে আস্তে আস্তে আপনার দেখার পরিধিকে বাড়ান, যতক্ষণ না অসীম মহাবিশ্ব জুড়ে সকল রূপকে আপনি দেখতে পারেন। এভাবে নামকেও দেখা উচিত আপনার যতক্ষণ না অসীম মহাবিশ্ব জুড়ে সকল নামকে দেখতে পান। এরপরে এদের উভয়কে একত্রে অসীম মহাবিশ্ব জুড়ে দেখে নেওয়া উচিত।

সবশেষে, আপনি সেই সকল নামরূপকে প্রজ্ঞা দিয়ে বিচার করুন, দেখুন এই অসীম মহাবিশ্ব জুড়ে কোনো সত্ত্ব নেই, পুরুষ নেই, মহিলা নেই, আছে কেবল নাম আর রূপ। এখানেই নাম-কর্মস্থান ভাবনার সমাপ্তি।

আপনার ভাবনার এই ধাপে পৌঁছে আপনি ইতিমধ্যেই সমাধি লাভ করবেন, এই সমাধির সাহায্যে অসীম মহাবিশ্বের আটাশ প্রকার রূপ এবং তেপ্পান্ন প্রকার নামকে দেখে ফেলবেন। আমার পরবর্তী দেশনা হবে বিদর্শনের পরবর্তী ধাপ প্রতীত্যসমুৎপাদ-নীতি বিষয়ে।

প্রশ্নোত্তর পর্ব - ৫

প্রশ্ন ৫.১ : *অষ্ট সমাপত্তি লাভের ফলে নামরূপ পরিচ্ছেদ জ্ঞান লাভ করা সম্ভব হয় এবং তাদের সূক্ষ্ম উদয়-বিলয়ের ব্যাপারটা দেখা সম্ভব হয়, এতে করে তাদের প্রতি বিরূপ ভাবের উদয় হয় এবং মার্গজ্ঞান লাভ হয়। এগুলো বাদে*

অষ্ট সমাপত্তির কি অন্যান্য সুফল আছে?

উত্তর ৫.১ : ধ্যান লাভ করার পাঁচটি সুফল আছে :

১. দৃষ্টধর্ম সুখবিহার (এখানেই এবং এখনই সুখে বাস করা) : এই ইহজন্মেই ধ্যানসুখ উপভোগ করা। এটি বিশেষ করে শুদ্ধ-বিদর্শনযানী অর্হৎদের বেলায় প্রযোজ্য। ভিক্ষুর কর্তব্য হচ্ছে ত্রিপিটক শিক্ষা করা (পরিয়ত্তি), বিদর্শন ভাবনা চর্চা করা এবং চার মার্গ ও চার ফল লাভ করা। শুদ্ধ-বিদর্শনযানী অর্হৎগণ সেগুলো ইতিমধ্যেই করে ফেলেছেন, তাদের আর কোনো কর্তব্য অবশিষ্ট নেই। তারা ধ্যান-সমাধির চর্চা করেন কেবল এই জন্মে ধ্যানসুখ উপভোগের জন্য, আর কোনো কারণে নয়। এটি সমাধির প্রথম সুফল।

২. বিদর্শনজাত সুফল : বিদর্শন জ্ঞানের জন্য ধ্যান-সমাধি একটি বড় সহায়। এর সাহায্যে একজন ব্যক্তি পরমার্থ নামরূপ ও তাদের কারণগুলোকে পরিষ্কারভাবে দেখতে পারে, এবং তাদের অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম স্বভাবকে উপলব্ধি করতে পারে। এটি হচ্ছে সমাধির দ্বিতীয় সুফল।

৩. অলৌকিক শক্তি : যদি কেউ সাধারণ অলৌকিক শক্তিগুলোতে দক্ষতা অর্জন করতে চায়, যেমন—অতীত জন্মগুলোকে স্মরণ করতে পারা, দিব্যচক্ষু, দিব্যকর্ণ এবং অন্যান্য বিভিন্ন অলৌকিক শক্তি, যেমন—শূন্যে ওড়া, পানির উপরে হাঁটা ইত্যাদি, তাহলে তাকে অবশ্যই দশ কৃৎস্ন-ভাবনা করতে হবে এবং চৌদ্দ প্রকারে অষ্ট সমাপত্তি অর্জন করতে হবে। এটি হচ্ছে সমাধির তৃতীয় সুফল।

৪. নির্দিষ্ট গতি : যদি কেউ মৃত্যুর পরে ব্রহ্মলোকে জন্মগ্রহণ করতে চায়, তাহলে তাকে অবশ্যই দশ কৃৎস্ন, আনাপানস্মৃতি, মৈত্রী-ভাবনা প্রভৃতিতে সমাধি লাভ করতে হবে। তবে, ব্রহ্মলোকে জন্ম নিশ্চিত করতে হলে সমাধিকে অবশ্যই মৃত্যুর আগ মুহূর্ত পর্যন্ত বলবৎ থাকতে হবে। এটি হচ্ছে সমাধির চতুর্থ সুফল।

৫. নিরোধসমাপত্তি : নিরোধসমাপত্তি লাভ। এটি হচ্ছে সাময়িকভাবে চিত্ত, চৈতসিক এবং চিত্তজ-রূপের নিরোধ করা। 'সাময়িক' বলতে একজনের অধিষ্ঠানের উপর নির্ভর করে একদিন থেকে সাত দিন পর্যন্ত সময়কে বুঝায়।

কেবল অনাগামী এবং অর্হৎগণ নিরোধসমাপত্তি লাভ করতে পারেন। ঘুমানোর সময়টা বাদে অন্যান্য সময়ে অনাগামী ও অর্হতেরা কখনোই নামরূপ ও তাদের কারণগুলোর উদয়-বিলয় অথবা শুধুমাত্র বিলীন হয়ে যাওয়াটা দেখা থামান না। তাদের এই উদয়-বিলয় দেখার কাজ সারা দিন, সারা রাত, দিনের

পর দিন, রাতের পর রাত, বছরের পর বছর ধরে চলে। এভাবে দেখতে দেখতে মাঝে মাঝে তারা পুরো ব্যাপারটাতে এক ধরনের ক্লান্তি অনুভব করেন, তাদের মোহমুক্তি ঘটে, তারা আর এই বিলয়ের ঘটনা *(ভঙ্গ-ধম্ম)* দেখতে ইচ্ছে করেন না। কিন্তু তাদের পরিনির্বাণের সময় হয় নি তখনো, কারণ তাদের আয়ুষ্কাল এখনো শেষ হয় নি। তাই এই বিরক্তিকর জিনিসটি দেখা থামাতে তারা নিরোধসমাপত্তিতে প্রবেশ করেন।

কেন তাদের এমন উদয়-বিলয়ের ঘটনাগুলো দেখা থামে না? তারা তাদের ধ্যানাঙ্গগুলোর বিপরীতে যে প্রতিবন্ধকতা বা নীবরণগুলো বিদ্যমান, সেগুলোকে ধ্বংস করেছেন। তাদের সমাধি এখন সর্বোৎকৃষ্ট পর্যায়ে। একাগ্র মন পরমার্থ ধর্মগুলোকে যথাযথভাবে দেখে, তাই এটি সব সময় যথাযথ পরমার্থ নামরূপকে দেখে, যেটি হচ্ছে আসলে 'বিলয়ের ঘটনা'। যখন কেউ নিরোধসমাপত্তিতে প্রবেশ করে, ধরা যাক সে সাত দিনের জন্য প্রবেশ করেছে, সে তখন আর এই সাত দিনের মধ্যে এই বিলয়ের ঘটনাগুলোকে দেখে না, কারণ তার চিত্ত-চৈতসিকগুলো, যেগুলো এই বিলয়ের ঘটনাগুলোকে জানত, সেগুলো এখন নিরুদ্ধ, সাময়িকভাবে থেমে আছে।

নিরোধসমাপত্তিতে প্রবেশ করতে হলে তাকে অবশ্যই প্রথম ধ্যানে প্রবেশ করতে হবে, এটি থেকে বেরিয়ে এসে প্রথম ধ্যানের সংস্কারগুলোকে অনিত্য, দুঃখ ও অনিত্য হিসেবে দেখতে হবে। এভাবে ক্রমান্বয়ে তাকে দ্বিতীয় অরূপ ধ্যান, বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন পর্যন্ত যেতে হবে। এর পরে তাদের অবশ্যই তৃতীয় অরূপ ধ্যান, আকিঞ্চনায়তন ধ্যানে প্রবেশ করতে হবে। এ থেকে বেরিয়ে এসে তাকে চারটি অধিষ্ঠান করতে হবে :

১. নিরোধসমাপত্তি থেকে একটি নির্দিষ্ট সময় পরে, যেমন- সাত দিন পরে বেরিয়ে আসার অধিষ্ঠান করা।

২. বুদ্ধ চাইলে নিরোধসমাপত্তি থেকে বেরিয়ে আসার অধিষ্ঠান করা।

৩. সংঘ চাইলে নিরোধসমাপত্তি থেকে বেরিয়ে আসার অধিষ্ঠান করা।

৪. প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রগুলো যাতে কোনো কিছু দ্বারা বিনষ্ট না হয়, যেমন—আগুন ইত্যাদি দ্বারা যাতে বিনষ্ট না হয়, এমন অধিষ্ঠান করা।

এর পরে সে নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন ধ্যানে প্রবেশ করে, যা হচ্ছে চতুর্থ অরূপ ধ্যান। সেই ধ্যান লাভের কেবল এক অথবা দুই চিত্তক্ষণ বাদেই সে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য, যেমন—সাত দিনের জন্য নিরোধসমাপত্তিতে প্রবেশ করে। সমাপত্তিতে থাকাকালীন সে কিছুই দেখে না। কারণ, তার সকল চিত্ত-চৈতসিকগুলো থেমে গেছে। এটিই সমাপত্তির পঞ্চম সুফল।

অষ্ট সমাপত্তির সমাধি নামরূপ এবং তাদের কারণগুলোকে দেখতে সহায়ক হয়, এটা যেমন সত্য, তেমনি এই অষ্ট সমাপত্তিও আসলে এই অধ্যায়ে আলোচিত নাম মাত্র। তাই, যদি ভাবনাকারী নামরূপ এবং তাদের কারণগুলোকে, অষ্ট সমাপত্তিসহ সবগুলোকে অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্মরূপে দেখেন এবং সংস্কারোপেক্ষা জ্ঞান পর্যন্ত পৌঁছাতে পারেন, তখন তিনি তার ধ্যান সংস্কারগুলোর দর্শনকে অষ্ট সমাপত্তির যেকোনো একটিতে রাখতে পারেন। এটি হচ্ছে শমথ ও বিদর্শনকে নিয়ে জোয়াল বাঁধা, যেন দুটো বলদ মিলে একটি গাড়িকে টানছে। এটি হচ্ছে মার্গ, ফল ও নির্বাণ লাভের অন্যতম সহায়।

প্রশ্ন ৫.২ : *নির্বাণ লাভের সবচেয়ে সহজ ও দ্রুত পন্থা কোনটি? অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্মকে পড়ে পড়ে বুঝা, নাকি সমাধির মাধ্যমে পরমার্থ ধর্মকে উপলব্ধি করা?*

উত্তর ৫.২ : অনিত্যতা কী? অনিত্যতা হচ্ছে পঞ্চস্কন্ধ। এই সংজ্ঞা অনেক অর্থকথায় উল্লেখ করা আছে। যদি ভাবনাকারী পঞ্চস্কন্ধকে পরিষ্কারভাবে দেখেন, তিনি অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্মকে উপলব্ধি করতে পারেন। এতে কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু পঞ্চস্কন্ধ না দেখে তিনি কি অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্মকে উপলব্ধি করতে পারবেন? যদি পঞ্চস্কন্ধ না দেখেই তিনি সেই চেষ্টা করেন, তার বিদর্শন তখন কেবল বিদর্শন আবৃত্তি মাত্র হবে, সত্যিকারের বিদর্শন হবে না। কেবল সত্যিকারের বিদর্শনই মার্গফল উৎপন্ন করতে পারে।

এই পঞ্চস্কন্ধ কী? রূপস্কন্ধ, বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ, সংস্কারস্কন্ধ এবং বিজ্ঞানস্কন্ধ। রূপস্কন্ধ হচ্ছে আটাশ প্রকার রূপ। বেদনা, সংজ্ঞা এবং সংস্কারস্কন্ধ হচ্ছে বায়ান্ন প্রকার চৈতসিক। বিজ্ঞানস্কন্ধ হচ্ছে ঊননব্বই প্রকার চিত্ত। আটাশ প্রকার রূপকে বলা হয় 'রূপ' এবং বায়ান্ন প্রকার চৈতসিক ও ঊননব্বই প্রকার চিত্তকে বলা হয় 'নাম'। অতএব পঞ্চস্কন্ধ এবং নামরূপ একই জিনিস।

এগুলো সবই পরমার্থ নামরূপ। যদি ভাবনাকারী সেই পরমার্থ নামরূপকে দেখেন, তাহলে তিনি সেই নামরূপের অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্মকে দেখার চর্চা করতে পারেন। কিন্তু যদি তিনি পরমার্থ নামরূপকে না দেখেন, কীভাবে তিনি বিদর্শন চর্চা করবেন, কারণ বিদর্শন জ্ঞানের প্রয়োজনীয় বিষয়ই হচ্ছে নামরূপ ও তাদের কারণগুলো। এটিই সত্যিকারের বিদর্শন। একমাত্র সত্যিকারের বিদর্শনই মার্গফল উৎপন্ন করতে পারে।

মহাসতিপট্ঠান সুত্রে বুদ্ধ শিক্ষা দিয়েছেন যে নির্বাণ লাভের কেবল

একটাই পথ, অন্য কোনো পথ নেই। কী সেই পথ? বুদ্ধ প্রথমে সমাধির চর্চা করতে বলেছেন, কারণ একটি একাগ্র মন পরমার্থ নামরূপ ও তাদের কারণগুলোকে দেখার ক্ষমতা অর্জন করতে পারে। একইভাবে একটি একাগ্র মন পরমার্থ নামরূপ ও তাদের কারণগুলোর অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম স্বভাবকে দেখার ক্ষমতা অর্জন করতে পারে। কিন্তু কোনটি সবচেয়ে সহজ পথ হবে, আমরা তা বলতে পারি না। দ্রুত নির্বাণ লাভ করাটা পারমীর উপরে নির্ভর করে।

উদাহরণস্বরূপ, সারিপুত্র ভন্তে অর্হত্ত্বমার্গফল লাভ করার জন্য দু সপ্তাহ ধরে কঠোর পরিশ্রম করেছিলেন, যেখানে মহামোগ্গল্লান ভন্তে অর্হত্ত্বমার্গফল লাভ করার জন্য পরিশ্রম করেছিলেন মাত্র এক সপ্তাহ। আবার বাহিয় দারুচিরিয় অর্হত্ত্বমার্গফল লাভ করেছিলেন খুবই সংক্ষিপ্ত একটি দেশনা শুনে, '*দিট্‌ঠে দিট্‌ঠমত্তং...*', অর্থাৎ দেখলে কেবল দেখছি বলেই জানবে...। যে গতিতে তারা অর্হত্ত্বলাভ করেছিলেন তা তাদের পারমীর কারণেই। সারিপুত্র ভন্তে ও মহামোগ্গল্লান ভন্তে তাদের পারমীপূর্ণ করেছিলেন এক অসংখ্য এবং এক লক্ষ কল্প ধরে, যেখানে বাহিয় দারুচিরিয় তার পারমী পূর্ণ করে আসছিলেন প্রায় এক লক্ষ কল্প ধরে। সারিপুত্র ও মহামোগ্গল্লান ভন্তের অর্হত্ত্বমার্গ-সংশ্লিষ্ট ছিল অগ্রশ্রাবক-বোধিজ্ঞানের সাথে, যেখানে বাহিয় দারুচিরিয়ের অর্হত্ত্বমার্গ-সংশ্লিষ্ট ছিল কেবল মহাশ্রাবক-বোধিজ্ঞানের সাথে। অগ্রশ্রাবক-বোধিজ্ঞান মহাশ্রাবক-বোধিজ্ঞান থেকে উচ্চতর। তারা যে গতিতে অর্হত্ত্ব লাভ করেছিলেন তা তাদের আকাঙ্ক্ষার উপরে নির্ভর করে নি। কারণ, নির্বাণ লাভের একটিই পথ।

প্রশ্ন ৫.৩ : *সংসারচক্রের কোনো শুরু বা শেষ নেই। সত্ত্বদের সংখ্যাও অসীম, অতএব যারা অতীতে আমাদের মা ছিলেন, তাদের সংখ্যাও অসীম। সকল সত্ত্বই একসময় আমাদের মা ছিলেন এমন ধারণা নিয়ে কীভাবে আমরা মৈত্রী-ভাবনা করতে পারি? সকল সত্ত্বই আমাদের মা ছিলেন এমন ধারণা নিয়ে কি মৈত্রী-ধ্যান লাভ করা সম্ভব?*

উত্তর ৫.৩ : মৈত্রী-ভাবনা অতীত ও ভবিষ্যতের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়। এটির কাজ হচ্ছে কেবল বর্তমানকে নিয়ে। তাই আমরা যদি মৃতদের মৈত্রী দিই, আমরা তাতে ধ্যান লাভ করতে পারব না। সংসারচক্রে আমাদের বাবা অথবা মা হয় নি, এমন কোনো সত্ত্ব নাও থাকতে পারে; কিন্তু মৈত্রী-ভাবনা সংসারচক্রের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়। *করণীয় মৈত্রী সুত্তে* বুদ্ধ বলেছেন, '*মাতা যথা নিয়ংপুত্তমায়ুসা একপুত্তমনুরকেখ; এবম্পি সব্বভূতেসু, মানসং ভাবয়ে অপরিমাণং*'। এর মানে হচ্ছে যে, কোনো মা যেমন তার একমাত্র পুত্রের জন্য

জীবনও দিতে পারেন, সেভাবেই একজন ভিক্ষুর সকল প্রাণীর প্রতি মৈত্রী বিস্তার করা উচিত। এটি বুদ্ধের নির্দেশ। কেবল বর্তমানের কোনো বিষয়ই মৈত্রী-ধ্যান উৎপন্ন করতে পারে, অতীত কিংবা ভবিষ্যতের বিষয় সেটি পারে না। এ আমাদের মা ছিল, এ আমাদের বাবা ছিল—এভাবে ধরে নেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। যদি আমরা এই চিন্তার মাধ্যমে মৈত্রী বিস্তার করি, 'এই ব্যক্তি সুস্থ ও সুখী হোক'—এটিই ধ্যান উৎপন্ন করবে। কেবল পুত্র হওয়ার বা মা হওয়ার ধারণা ধ্যানে উপনীত করাতে পারবে না।

প্রশ্ন ৫.৪ : *(নিচের সবকটি প্রশ্ন একটি উত্তরের মাধ্যমে জবাব দেওয়া হয়েছে।)*

১. *বুদ্ধের সময়কালে কি কোনো বোধিসত্ত্ব ছিলেন? থাকলে তিনি কি কোনো মার্গফল লাভ করেছিলেন নাকি কেবল সাধারণ লোক বা পৃথকজনই ছিলেন?*

২. *কোনো আর্যপুদগল কেন বোধিসত্ত্ব হতে পারে না?*

৩. *কোনো শ্রাবক কি বোধিসত্ত্ব হওয়ার জন্য তার শ্রাবকত্ব বদলাতে পারে? না পারলে কেন পারে না?*

৪. *সেয়াদের নির্দেশনা অনুসরণ করে যে কেউ স্রোতাপত্তিমার্গফল লাভ করতে পারে। কিন্তু কেউ যদি বোধিসত্ত্বমার্গের কামনায় এবং বোধিসত্ত্বমার্গের অধিষ্ঠানের কারণে স্রোতাপত্তিমার্গফল লাভ করতে না চায়, সে কি তা বেছে নিতে পারে?*

উত্তর ৫.৪ : কোনো মার্গফল লাভ করার আগ পর্যন্ত যে কেউ তার সিদ্ধান্ত বদলাতে পারে। তবে মার্গফল লাভ করার পর আর কেউ তার সিদ্ধান্ত পাল্টাতে পারে না। কারণ, বুদ্ধ অনেক সূত্রে উল্লেখ করেছেন যে মার্গ লাভ করলে সে প্রকৃতির নিয়মের *(সম্মত-ধম্ম)* মধ্যে পড়ে যায়। এই নিয়ম বলে : স্রোতাপত্তিমার্গ স্রোতাপত্তিফলের জন্ম দেয়। এর পরে সে সকৃদাগামী ধাপে যেতে পারে; কিন্তু সাধারণ পৃথকজনের ধাপে ফিরতে পারে না। সকৃদাগামীরা অনাগামী ধাপে যেতে পারে; কিন্তু স্রোতাপত্তি বা পৃথকজনের ধাপে ফিরতে পারে না। অনাগামীরা অর্হত্ত্বের ধাপে যেতে পারে; কিন্তু সকৃদাগামী, স্রোতাপত্তি বা পৃথকজনের ধাপে ফিরতে পারে না। একজন অর্হৎ মৃত্যু হলে পরিনির্বাণ লাভ করে, সে আর কোনো হীন আর্য ধাপে, পৃথকজন ধাপে অথবা অন্য কোনো ধাপে ফিরতে পারে না। অর্হত্ত্ব হচ্ছে সমাপ্তি। এটি একটি প্রকৃতির নিয়ম *(সম্মত-ধম্ম)*। অর্হত্ত্বকে নির্দেশ করে বুদ্ধ অনেকবার বলেছেন, '*অয়মন্তিমা জাতি নত্থিদানি পুনব্ভবোতি*'—এটিই শেষ জন্ম, আর কোনো পুনর্জন্ম নেই।

এর মানে হচ্ছে যে মার্গফল লাভের পরে সে আর তার সিদ্ধান্ত পাল্টাতে পারে না, এবং বোধিসত্ত্ব হওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে পারে না।

তা ছাড়া, যে কেউ বুদ্ধ অথবা কোনো অর্হতের কাছ থেকে সুনির্দিষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী পেলে সে আর তার সিদ্ধান্তকে পাল্টাতে পারে না। কিন্তু তার আগে পারে। বিশুদ্ধিমার্গে একটি উদাহরণ আছে যেখানে এক মহাথেরো তার সিদ্ধান্তকে পাল্টিয়েছিলেন। তিনি চার স্মৃতি ভাবনায় সুদক্ষ ছিলেন, শমথ-বিদর্শন ভাবনা করেছিলেন সংস্কারোপেক্ষা জ্ঞান পর্যন্ত, কখনোই স্মৃতিহীন হয়ে কায়িক বা বাচনিক কর্ম সম্পাদন করেন নি। তার মৃত্যুর কাছাকাছি সময়ে প্রচুর লোকের সমাগম হয়েছিল। কারণ, লোকজন ভেবেছিল যে তিনি পরিনির্বাণ লাভ করতে যাচ্ছেন, কিন্তু তিনি ছিলেন তখনো একজন পৃথকজন। তার শিষ্যরা তাকে জানাল যে অনেক লোক জড়ো হয়েছে। কারণ, তারা ভেবেছে তিনি পরিনির্বাণ লাভ করতে যাচ্ছেন। তাই মহাথেরো বললেন, 'ও আচ্ছা, আমি তো আর্যমৈত্রেয় বুদ্ধকে দেখতে চেয়েছিলাম। কিন্তু প্রচুর লোকজন এসেছে যখন, তখন আমাকে একটু ধ্যান করতে দাও।' তিনি বিদর্শন ভাবনায় বসলেন। এখন যেহেতু তিনি সিদ্ধান্ত পাল্টিয়েছেন, তাই তিনি শীঘ্রই অর্হত্ত্ব লাভ করলেন।

বুদ্ধের সময়ে আর্যমৈত্রেয় বোধিসত্ত্ব বাদে অন্য কোনো বোধিসত্ত্বের প্রতি সুনির্দিষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে, এমন উল্লেখ নেই। আর্যমৈত্রেয় বোধিসত্ত্ব ছিলেন অজিত নামের একজন ভিক্ষু। আর্যমৈত্রেয় বুদ্ধ কখন উৎপন্ন হবেন, তাও ত্রিপিটকে উল্লেখ নেই, তাই আমরা বলতে পারব না বুদ্ধের সময়ে কতজন বোধিসত্ত্ব ছিলেন।

প্রশ্ন ৫.৫ : *বিমুক্তিমার্গ ও বোধিসত্ত্বমার্গ কি একই সাথে চর্চা করা যায়? করা গেলে, সেই পদ্ধতিটা কী?*

উত্তর ৫.৫ : বিমুক্তি মানে হচ্ছে ক্লেশগুলো থেকে মুক্তি, অথবা সংসারচক্র থেকে মুক্তি। তাই যখন একজন বোধিসত্ত্ব বুদ্ধ হন, তিনি পরিনির্বাণের সাথে সাথে সংসারচক্র থেকে মুক্ত হন। যদি আপনি অর্হত্ত্ব লাভ করতে চান এবং তাতে সফল হন, তখন শ্রাবক হিসেবে আপনিও পরিনির্বাণের সাথে সাথে সংসারচক্র থেকে মুক্ত হবেন।

অতএব একজন ব্যক্তি একইসাথে বুদ্ধ ও শ্রাবক হতে পারে না। তাকে অবশ্যই যেকোনো একটা পথ বেছে নিতে হবে। কিন্তু অর্হত্ত্ব লাভের সাথে সাথে তারা উভয়েই সংসারচক্র থেকে মুক্ত হন। অর্হত্ত্বমার্গ লাভ করার পথই হচ্ছে বিমুক্তিমার্গ।

প্রশ্ন ৫.৬ : *এই ভাবনা পদ্ধতি কি শুধু বিমুক্তিমার্গের জন্য, নাকি এটি বোধিসত্ত্বমার্গের জন্যও প্রযোজ্য?*

উত্তর ৫.৬ : এটি উভয়ের জন্য। আগের একটি দেশনায় আমি বলেছি যে শাক্যমুনি বুদ্ধ অতীত জন্মে নয়বার ভিক্ষু হয়েছিলেন। তার নয়টি জন্মে তিনি যেসব নিয়মের অনুশীলন করেছিলেন সেগুলো বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাই তিনি ত্রিশিক্ষার চর্চা করছিলেন : শীলশিক্ষা, সমাধিশিক্ষা এবং প্রজ্ঞাশিক্ষা। বোধিসত্ত্ব অষ্ট সমাপত্তি, পঞ্চ অভিজ্ঞা এবং সংস্কারোপেক্ষা জ্ঞান অর্জন করেছিলেন।

এখন আপনারা শীলের উপর ভিত্তি করে শমথ-বিদর্শন ভাবনা করছেন। যখন আপনারা এই তিনটি শিক্ষার চর্চা করবেন সংস্কারোপেক্ষা জ্ঞান পর্যন্ত, আপনি তখন দুটো পথের যেকোনো একটা বেছে নিতে পারেন। যদি আপনি বিমুক্তি চান, তাহলে আপনি নির্বাণে যাওয়াটা বেছে নিতে পারেন। আর যদি আপনি বোধিসত্ত্ব হতে চান, তাহলে আপনি বোধিসত্ত্বমার্গ বেছে নিতে পারেন। কোনো সমস্যা নেই।

প্রশ্ন ৫.৭ : *একজন অর্হতের সকল কুশল ও অকুশল কর্মই কি পরিনির্বাণের আগে ফল দেওয়ার জন্য পরিপক্ব হয়?*

উত্তর ৫.৭ : সবগুলো নয়। কিছু ভালো এবং খারাপ কর্ম পরিপক্ব হলে তারা তাদের ফল দিতে পারে। যদি সেগুলো পরিপক্ব না হয়, তাহলে ফল দিতে পারে না, বরং অহোসি কর্মে (নিষ্ফল কর্মে) পরিণত হয়। উদাহরণস্বরূপ, মহামোগ্গল্লান ভন্তের অতীত জন্মের একটি অকুশল কর্ম তার পরিনির্বাণের ঠিক আগে তার ফল দিয়েছিল। অতীত এক জন্মে তিনি তার অন্ধ পিতামাতাকে হত্যার চেষ্টা করেছিলেন। সেই অকুশল কর্মের কারণে তাকে নরকে অনেক হাজার বছর ধরে দুঃখ পেতে হয়েছিল। নরক থেকে ছাড়া পেয়েও প্রায় দুইশত জন্ম ধরে তাকে নিহত হতে হয়েছে। প্রত্যেকটি জন্মে তার মাথা চুর্ণবিচুর্ণ হয়ে গিয়েছিল। তার শেষ জন্মেও মাথাসহ তার শরীরের সব হাড়গোড় চুর্ণবিচুর্ণ হয়ে গিয়েছিল। কেন? কারণ, অকুশল কর্ম পরিপক্ব হয়ে ফল দিয়েছিল। অকুশল এবং কুশল কর্ম পরিপক্ব না হলে কোনো ফল দিতে পারে না। তারা তখন নামে মাত্র কর্ম হয়।

প্রশ্ন ৫.৮ : *বুদ্ধত্ব লাভের পরে বুদ্ধ কি সত্যিই বলেছিলেন, 'সকল সত্ত্বেরই তথাগতের প্রজ্ঞা এবং অন্যান্য গুণাবলী আছে?'*

উত্তর ৫.৮ : এখানে আপনি স্বীকার করেছেন যে শাক্যমুনি বুদ্ধ বুদ্ধত্ব লাভ করেছিলেন। আপনার এবার বিবেচনা করা উচিত, সকল সত্ত্বের মধ্যে

তথাগতের গুণাবলী বিদ্যমান কিনা, বিশেষ করে আপনার নিজের মধ্যে। তথাগতের কোনো গুণ কি আপনার মধ্যে আছে?

প্রশ্ন ৫.৯ : *অর্হতের নিজের পঞ্চস্কন্ধের প্রতি যে শূন্যতাবোধ, সেটা কি বাইরের জড়বস্তুগুলোর শূন্যতার মতো একই? নির্বাণ কি শূন্যতায় প্রবেশ করার মতো একই?*

উত্তর ৫.৯ : নিজের পঞ্চস্কন্ধের প্রতি যে শূন্যতাবোধ, তা বাইরের জড় বস্তুগুলোর শূন্যতাবোধের মতোই একই। নির্বাণকে শূন্যতা নাম দেওয়া হয়েছে তার মার্গের কারণে। যখন ভাবনাকারী সকল সংস্কার ধর্মকে অনাত্ম হিসেবে দেখেন এবং সেই সময় তিনি নির্বাণকে প্রত্যক্ষ করেন, তখন তার মার্গজ্ঞানকে বলা হয় শূন্যতা-বিমোক্ষ। মার্গকে যেভাবে শূন্যতা-বিমোক্ষ বলা হয়, ঠিক সেভাবে মার্গের বিষয়বস্তু নির্বাণকেও বলা হয় শূন্যতা। এখানে শূন্যতা-বিমোক্ষ হচ্ছে সংস্কারগুলোর অনাত্ম স্বভাব দেখে ক্লেশগুলো থেকে মুক্ত হওয়া।

প্রশ্ন ৫.১০ : *সকল সূত্রগুলো কি কেবল বুদ্ধই বলেছেন?*

উত্তর ৫.১০ : ত্রিপিটকের বেশির ভাগ সূত্র বুদ্ধের শিক্ষা দেওয়া। কয়েকটি সূত্র আছে সারিপুত্র ভন্তে, মহাকাচ্চায়ন ভন্তে এবং আনন্দ ভন্তের শিক্ষা দেওয়া। কিন্তু শ্রাবকদের বলা সূত্রগুলোর অর্থগুলোও বুদ্ধের শিক্ষাগুলোকেই বলে দেয়। এটি বিশেষভাবে দেখা যায় কয়েকটি সূত্রে যেখানে বুদ্ধ সাধুবাদের সাথে সেই সূত্রগুলোর অনুমোদন করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, মধ্যমনিকায়ের মহাকাচ্চায়ন ভদ্দেকরত্ত সূত্র (মহাকাচ্চায়ন এবং একটি সৌভাগ্যময় রাত)।

প্রশ্ন ৫.১১ : *ভাবনার সময় আমরা তো আর বুদ্ধকে দেখতে পাই না, তাই আমরা কি অলৌকিক শক্তির মাধ্যমে তাকে দেখে তার সাথে ধর্মালোচনা করতে পারি?*

উত্তর ৫.১১ : না, আপনি সেটা করতে পারবেন না। অলৌকিক শক্তিগুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে অতীত জন্মগুলো স্মরণ করতে পারা। যদি ভাবনাকারী এই অলৌকিক শক্তি অর্জন করে থাকেন, এবং অতীত জন্মে কোনো বুদ্ধের সাক্ষাৎ লাভ করেন, তাহলে তিনি কেবল সেই অতীত অভিজ্ঞতাই দেখবেন, কোনো নতুন অভিজ্ঞতা দেখবেন না। যদি ধর্ম আলোচনা করেন, তো কেবল পুরোনো প্রশ্ন এবং উত্তরই হবে, নতুন প্রশ্নোত্তর হবে না। এটি হচ্ছে অতীত জন্মগুলো স্মরণ করার অলৌকিক শক্তি। ❑

[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[দেশনা ৬]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]

প্রতীত্যসমুৎপাদ-নীতি

গত দেশনায় আমি ব্যাখ্যা করেছিলাম কীভাবে নামকে দেখতে হয় এবং তার আগের দেশনায় আমি ব্যাখ্যা করেছিলাম কীভাবে বিভিন্ন ধরনের রূপকে দেখতে হয়। আমি যেভাবে বলেছি, সেভাবে যদি আপনি নামরূপকে দেখতে সমর্থ হন, তাহলে নামরূপের কারণগুলোকেও দেখতে সমর্থ হবেন। তার মানে হচ্ছে প্রতীত্যসমুৎপাদ-নীতিকে দেখা। প্রতীত্যসমুৎপাদ-নীতি হচ্ছে কীভাবে কারণ এবং তার ফলগুলো অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জুড়ে কাজ করে সেই কার্যকারণ-নীতি।

প্রতীত্যসমুৎপাদ-নীতিকে বুঝার জন্য বুদ্ধ তার শ্রোতাদের স্বভাবভেদে চারটি পদ্ধতি শিখিয়েছেন। পঞ্চম আরেকটি পদ্ধতি আছে যেটি শিখিয়েছেন সারিপুত্র ভন্তে, এবং এটি *পটিসম্ভিদামগ্গে* লিখে রাখা হয়েছে। সবগুলো পদ্ধতি ব্যাখ্যা করা সময়ের ব্যাপার, তাই আমি কেবল দুটি পদ্ধতির কথা ব্যাখ্যা করব, যেগুলো আমি সচরাচর ভাবনাকারীদের শিখিয়ে থাকি। সেগুলো হচ্ছে সারিপুত্র ভন্তের পঞ্চম পদ্ধতি, এবং বুদ্ধের শেখানো প্রথম পদ্ধতি, যা আছে সংযুক্তনিকায়ের নিদান বর্গে, এবং দীর্ঘনিকায়ের *মহানিদান সুত্রে*।

উভয় পদ্ধতিতেই অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের[১] পঞ্চস্কন্ধকে দেখতে হয়, তাদের মধ্যে কোনটা কারণ এবং কোনটা ফল তা দেখতে হয়। যখন আপনি এভাবে দেখতে সক্ষম হবেন, তখন সূত্র ও অর্থকথায় উল্লিখিত অন্যান্য পদ্ধতিতেও প্রতীত্যসমুৎপাদ-নীতিকে দেখতে পারবেন।

---

[১]. অতীত জন্ম স্মরণ করার অলৌকিক শক্তির মাধ্যমে আপনি দেখতে পারবেন : ১) লোকোত্তর ধর্ম, চার মার্গ ও চার ফলচিত্ত; ২) পঞ্চস্কন্ধ; ৩) বংশ, চেহারা, খাদ্য, আনন্দ, বেদনা ইত্যাদি; ৪) নাম, জাতি ইত্যাদি। পা-অক সেয়াদ ভন্তে এখানে সেই অলৌকিক শক্তির কথা বলেননি। তিনি বিদর্শনশক্তির কথা বলেছেন যা দিয়ে আপনি পঞ্চস্কন্ধকে দেখতে পাবেন।

প্রতীত্যসমুৎপাদ-নীতির তিন বৃত্ত (ত্রিবর্ত)

প্রতীত্যসমুৎপাদ-নীতির বারোটি সংযোগ বা জোড়া তিনটি বৃত্ত গঠন করে :

১. ক্লেশবৃত্ত :

—অবিদ্যা

—তৃষ্ণা

—উপাদান বা আসক্তি

২. কর্মবৃত্ত :

—সংস্কার

—কর্মভব

৩. বিপাকবৃত্ত :

—বিজ্ঞান

—নামরূপ

—ষড়ায়তন

—স্পর্শ

—বেদনা

(সেয়াদ বলেন যে 'জন্ম, জরা এবং মৃত্যু' হচ্ছে 'বিজ্ঞান, নামরূপ, ষড়ায়তন, স্পর্শ ও বেদনা'।) কলুষতার বৃত্ত বা ক্লেশবৃত্ত হচ্ছে কর্মবৃত্তের কারণ। আর কর্মবৃত্তের কারণে সৃষ্টি হয় বিপাকবৃত্ত। প্রতীত্যসমুৎপাদ-নীতি হচ্ছে এই ক্রমকে দেখা। এর শুরু হয় অতীতকে দেখার মাধ্যমে।

অতীতকে দেখা

অতীতকে দেখতে হলে আপনি প্রথমে প্রদীপ জ্বালিয়ে, ফুল দিয়ে অথবা আগরবাতি দিয়ে বৌদ্ধ মন্দিরে পূজা করুন, অথবা কোনো বুদ্ধছবি বা মূর্তির সামনে পূজা করুন। এ সময় আপনি যেভাবে পুনঃ জন্মাতে ইচ্ছা করেন, যেমন ধরুন ভিক্ষু হতে ইচ্ছা করলে, অথবা ভিক্ষুণী, পুরুষ, নারী অথবা দেবতা হতে ইচ্ছে করলে সেটা প্রার্থনা করা উচিত।

এর পরে ভাবনায় বসুন, সমাধিস্থ হোন এবং অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক নামরূপকে দর্শন করুন। এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, বাহ্যিক নামরূপকে না দেখলে অতীতের নামরূপকে দেখতে পাওয়া কঠিন হবে। এর কারণ হচ্ছে, বাহ্যিক নামরূপকে দেখা অনেকটা অতীতের নামরূপকে দেখার মতো।

এবার আপনি যখন মন্দিরে বা বুদ্ধমূর্তির সামনে পূজা করেছেন, সেই সময়কার নামরূপকে দেখা উচিত, যেন তারা বাহ্যিক বিষয়বস্তু। এটি করার সময়ে পূজার সময়কার একটি প্রতিমূর্তি আবির্ভূত হবে। সেই প্রতিমূর্তির চারধাতুকে আপনার দর্শন করা উচিত।

যখন প্রতিমূর্তিটার কলাপগুলো দেখতে পাবেন, ষড়ায়তনের সকল প্রকার রূপকে দেখুন, বিশেষ করে মনোদ্বারের চুয়ান্ন প্রকার রূপকে। তাতে আপনি ভবাঙ্গচিত্তগুলোকে দেখতে সক্ষম হবেন এবং মনোদ্বার-চিত্তবীথিগুলোকেও চিনতে পারবেন। সেই মনোদ্বার-চিত্তবীথিগুলোকে একাদিক্রমে এবং বিপরীতক্রমে দেখা উচিত আপনার। সেখানে ক্লেশ বৃত্তের মনোদ্বার-চিত্তবীথিকে খুঁজুন বিশটি চৈতসিকসহ। তার সাথে খুঁজুন কর্মবৃত্তের মনোদ্বারবীথিকে চৌত্রিশটি চৈতসিকসহ।

আমি একটি বাস্তব উদাহরণের মাধ্যমে ব্যাপারটি ব্যাখ্যা করতে চাই। সেই পূজার কথাই ধরা যাক, যেখানে বুদ্ধমূর্তির সামনে বাতি জ্বালিয়ে, ফুল দিয়ে অথবা আগরবাতি দিয়ে পূজা করে ভিক্ষু হিসেবে জন্ম নেওয়ার প্রার্থনা করা হচ্ছে।

এক্ষেত্রে অজ্ঞানতা হচ্ছে বিভ্রান্তভাবে চিন্তা করা যে 'ভিক্ষু' হচ্ছে একটি পরমার্থ রূপ। তৃষ্ণা হচ্ছে ভিক্ষুজীবনের জন্য কামনা এবং আকাঙ্ক্ষা করা, এবং ভিক্ষুজীবনের প্রতি আসক্তি থাকা। এই তিনটি, অজ্ঞানতা, তৃষ্ণা এবং আসক্তি, এগুলোকে সেই চিত্তে খুঁজে পাওয়া যাবে, কারণ সেগুলো ক্লেশবৃত্তকে সম্পূর্ণ করে।

যদি ভিক্ষু হয়ে জন্ম নেওয়ার প্রার্থনা না করে আপনি মহিলা হয়ে জন্ম নেওয়ার প্রার্থনা করেন, সেক্ষেত্রে অজ্ঞানতা হচ্ছে এটি ভাবা যে 'মহিলা' একটি পরমার্থ রূপ; তৃষ্ণা হচ্ছে মহিলাজীবনের প্রতি কামনা ও আকাঙ্ক্ষা; আসক্তি হচ্ছে মহিলাজীবনের প্রতি আসক্ত থাকা।

এই উদাহরণগুলোতে সংস্কার হচ্ছে পূজার কুশল চেতনাগুলো এবং কর্ম হচ্ছে তাদের কর্মশক্তি। এই সংস্কার ও কর্ম উভয়কেই খুঁজে পাওয়া যাবে সেই চিত্তগুলোতে যেগুলো প্রতীত্যসমুৎপাদ-নীতির কর্মবৃত্তকে সম্পূর্ণ করে।

সাম্প্রতিক অতীতের ক্লেশবৃত্ত ও কর্মবৃত্তের নামরূপকে দেখতে সক্ষম হলে এবার একটু পিছনে গিয়ে সেই পূজার কিছুক্ষণ আগের সময়ের নামরূপকে একইভাবে দেখুন। এরপর সেই সময়ের আরেকটু পিছনে যান, তখনকার নামরূপকে দেখুন। এভাবে একদিন আগের, এক সপ্তাহ আগের, এক মাস আগের, এক বছর আগের, দু বছর আগের, তিন বছর আগের, এভাবে

ক্রমান্বয়ে আরও আগের নামরূপগুলোকে দেখুন। অবশেষে একসময় আপনি প্রতিসন্ধিচিত্তের (পুনর্জন্ম গ্রহণকারী চিত্ত) সময়কার নামরূপকে দেখতে সমর্থ হবেন যা মাতৃগর্ভে এই জীবনের সূচনা করেছিল।

মাতৃগর্ভে জন্মের কারণ খুঁজতে গিয়ে আপনি আরও পিছনে ফিরে যান, দেখুন অতীত জন্মের মরণাসন্নকালের নামরূপকে, অথবা মরণাসন্ন-জবন চিত্তের বিষয়বস্তুকে।

মরণাসন্ন-জবনের বিষয়বস্তু তিন ধরনের হতে পারে :

১. কর্ম : অতীতের কোনো ভালো বা খারাপ কাজের চিন্তা, যেমন, পূজা।

২. কর্মনিমিত্ত : উদাহরণস্বরূপ পূজার সাথে সংশ্লিষ্ট বৌদ্ধ মন্দির, ভিক্ষু, ফুল অথবা আপনি যে উপকরণ দিয়ে পূজা করেছিলেন সেগুলোর নিমিত্ত (ছবি)।

৩. গতিনিমিত্ত : আপনি যেখানে জন্মগ্রহণ করবেন সেই জায়গার নিমিত্ত। মানবজন্ম গ্রহণের জায়গা হচ্ছে ভবিষ্যৎ মায়ের গর্ভ, যা সাধারণত লাল কার্পেটের মতো দেখায়।

যদি আপনি মরণাসন্নকালের নামরূপকে দেখেন, আপনি সেই সাথে দেখবেন মরণাসন্ন-জবনের বিষয়বস্তুকে। সেটা হয় কর্ম, অথবা কর্মনিমিত্ত, অথবা গতিনিমিত্ত। এই বিষয়বস্তু আবির্ভূত হয় কর্মশক্তির কারণে, যা প্রতিসন্ধিচিত্তের জন্ম দেয়। যখন আপনি এটি দেখবেন, তার সাথে সাথে আপনি তখনকার সেই সংস্কারগুলো এবং কর্মকেও দেখতে সমর্থ হবেন যাদের ফল হিসেবে এই জন্মের পঞ্চস্কন্ধ উৎপন্ন হয়েছে। তার সাথে সাথে এর পূর্ববর্তী যে অজ্ঞানতা, তৃষ্ণা ও আসক্তি সেগুলোকেও দেখতে পাবেন। এরপর আপনার সেই কর্মবৃত্ত ও ক্লেশবৃত্তের অন্যান্য সংস্কারগুলোকেও দেখা উচিত।

বাস্তব উদাহরণ

বিষয়টিকে আরও ভালো করে বুঝার সুবিধার্থে আমি একটি উদাহরণ দেব যা একজন মহিলা ভাবনাকারী দেখতে সমর্থ হয়েছিল। যখন সে তার মরণাসন্নকালের নামরূপকে দেখল, সে তার কর্মকে দেখল যেখানে একজন মহিলা একজন বৌদ্ধ ভিক্ষুকে ফলমূল দান করছে। এরপর চার ধাতু-ভাবনা দিয়ে শুরু করে সে সেই মহিলার নামরূপকে বিশ্লেষণ করল, এবং দেখল যে মহিলাটি আসলে খুব গরিব এবং অশিক্ষিত এক গ্রামবাসী, যে তার গরিব

অবস্থার কথা চিন্তা করেছিল এবং ভিক্ষুটিকে দান দিয়ে প্রার্থনা করেছিল যেন ভবিষ্যৎ জন্মে কোনো বড় শহরের শিক্ষিত মহিলার জীবন লাভ করে।

এক্ষেত্রে অজ্ঞানতা হচ্ছে বিভ্রান্তভাবে চিন্তা করা যে 'কোনো বড় শহরের শিক্ষিত মহিলা' হচ্ছে পরমার্থ রূপ, সেই শিক্ষিত মহিলার জীবনকে কামনা ও আকাঙ্ক্ষা করা হচ্ছে তৃষ্ণা, সেই শিক্ষিত মহিলার জীবনের প্রতি যে আসক্তি, তাই আসক্তি বা উপাদান। বৌদ্ধ ভিক্ষুকে ফলমূল দান করার কুশল চেতনাগুলো হচ্ছে সংস্কারপুঞ্জ, আর কর্মটি হচ্ছে সংস্কারগুলোর কর্মশক্তি।

এই জীবনে মহিলা ভাবনাকারীটি হচ্ছে মায়ানমারের বড় একটি শহরের শিক্ষিত এক মহিলা। সে তার সম্যকদৃষ্টি দিয়ে সরাসরি দেখতে পেয়েছিল কীভাবে তার অতীত জন্মের ফলদানের কর্মশক্তি এই জন্মের পঞ্চস্কন্ধকে উৎপন্ন করেছে।

এভাবে কারণ এবং ফলাফলকে দেখার ক্ষমতাকে বলা হয় প্রত্যয়-পরিগ্রহ-জ্ঞান (কারণ এবং উপাদানগুলো দেখার জ্ঞান)।

এবার একটি ভিন্ন উদাহরণ দেব। এক লোক দেখল যে মরণাসন্ন জবনচিত্তের সময়ে চারটি প্রতিযোগী কর্ম হাজির হয়েছে। একটি হচ্ছে ত্রিপিটক শিক্ষা দেওয়া, আরেকটি হচ্ছে ধর্মশিক্ষা দেওয়া (ধর্মদেশনা করা), আরেকটি হচ্ছে ভাবনা করা, এবং সবশেষে আরেকটি হচ্ছে ভাবনা শিক্ষা দেওয়া। সে যখন অনুসন্ধান করল যে চারটি কর্মের মধ্যে কোনটি তার এই জন্মের পঞ্চস্কন্ধকে উৎপন্ন করেছে, সে দেখল যে এটি হচ্ছে ভাবনার চর্চা। সে আরও অনুসন্ধান করল, কোন ভাবনা চর্চা করেছে। সে দেখল যে এটি হচ্ছে বিদর্শন ভাবনা, নামরূপের মধ্যে তিনটি স্বভাব—অনিত্য, দুঃখ এবং অনাত্মকে দেখা। আরও অনুসন্ধান করে সে দেখল যে প্রত্যেকবার ভাবনায় বসার আগে ও পরে সে প্রার্থনা করেছে মানবজন্মে যেন পুরুষ হয়ে জন্মায়, ভিক্ষু হয় এবং বুদ্ধের শিক্ষাগুলোকে চারদিকে ছড়িয়ে দেয়।

এক্ষেত্রে অজ্ঞানতা হচ্ছে বিভ্রান্তভাবে চিন্তা করা যে 'একজন লোক', 'একজন ভিক্ষু' অথবা 'একজন ভিক্ষু যে বুদ্ধের শিক্ষাগুলো প্রচার করছে' হচ্ছে একটি পরমার্থ রূপ। তৃষ্ণা হচ্ছে এটির প্রতি কামনা ও আকাঙ্ক্ষা এবং উপাদান হচ্ছে এর প্রতি দৃঢ় আসক্তি। সংস্কারগুলো হচ্ছে বিদর্শন ভাবনার কাজগুলো এবং কর্ম হচ্ছে সেই সংস্কারগুলোর কর্মশক্তি।

যখন আপনি এভাবে আপনার ঠিক আগের জন্মকে দেখতে সমর্থ হবেন, এবং অতীতের পাঁচটি কারণ, যথা : অজ্ঞানতা, তৃষ্ণা, আসক্তি, সংস্কার ও কর্ম এবং বর্তমান জন্মে তাদের ফলস্বরূপ প্রতিসন্ধিচিত্ত, নামরূপ, ষড়ায়তন, স্পর্শ

ও বেদনাকে দেখতে সমর্থ হবেন, তখন একইভাবে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, ক্রমান্বয়ে যত জন্ম পারেন, তত জন্মকে দেখার প্রয়োজন। অতীত অথবা ভবিষ্যতের কোনো জন্মে যদি ব্রহ্মলোকে উৎপত্তি দেখতে পান, তাহলে আপনি মানবজগতের এবং দেবলোকের ষড়ায়তনের বদলে সেখানে কেবল দেখবেন ত্রি-আয়তন, যথা : কর্ণ, চক্ষু এবং মনকে।

ভবিষ্যৎকে দেখা

অতীত জন্মের কারণ ও ফলাফলগুলো দেখে দেখে এই বিদর্শন জ্ঞানের শক্তিটা সুদৃঢ় হয়ে উঠলে এবার আপনি একইভাবে ভবিষ্যতের জন্মগুলোর কারণ এবং ফলাফলগুলোও দেখতে পারবেন। আপনি যে ভবিষ্যৎকে দেখবেন, যেটি এখনো পাল্টে যেতে পারে, সেটি হচ্ছে অতীত ও বর্তমান কারণগুলোর সমষ্টি, যার একটা কারণ হচ্ছে এই ভাবনা, যেটি আপনি করছেন। ভবিষ্যৎকে দেখতে হলে শুরু করুন বর্তমান নামরূপকে দেখার মধ্য দিয়ে। এবার ভবিষ্যতের দিকে অগ্রসর হোন যতক্ষণ না এই জীবনে মৃত্যুর আগের মুহূর্তে পৌঁছান। এই জন্মের কোনো নির্দিষ্ট কর্মের কর্মশক্তির কারণে এরপর কর্ম, অথবা কর্মনিমিত্ত, অথবা গতিনিমিত্ত আসবে। তখন আপনি ভবিষ্যৎ জন্মের প্রতিসন্ধির সময় উৎপন্ন নামরূপকে দেখতে পাবেন।

আপনাকে অবশ্যই এভাবে ভবিষ্যৎ জন্মগুলোকে দেখে যেতে হবে যতক্ষণ না কোনো জন্মে অজ্ঞানতা নিঃশেষে দূরীভূত হয়। এটি হয় অর্হত্ত্বমার্গ লাভের ফলে, অর্থাৎ আপনার নিজের অর্হত্ত্ব লাভ করার কারণে। এরপর আপনার আরও ভবিষ্যতে যাওয়া উচিত যতক্ষণ না পঞ্চস্কন্ধ, নামরূপ নিঃশেষে বিলুপ্ত হয়, অর্থাৎ অর্হত্ত্ব জীবনের শেষে আপনার নিজের পরিনির্বাণ পর্যন্ত। এভাবে আপনি ভবিষ্যৎকে দেখে ফেলবেন এবং ঘটনাবলীর (ধম্ম) নিরোধকে দেখবেন।

অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের পঞ্চস্কন্ধকে এবং তাদের কার্যকারণ সম্বন্ধকে এভাবে দেখাটাকে আমি বলি পঞ্চম পদ্ধতি। পঞ্চম পদ্ধতি শেষ করে এবার আপনি শিখতে পারবেন প্রথম পদ্ধতিটা, যা বুদ্ধ কর্তৃক দেশিত।

প্রতীত্যসমুৎপাদ-নীতি দেখার প্রথম পদ্ধতিটা তিনটি জন্ম ধরে বিস্তৃত, এবং এতে অগ্রসর হতে হয় সামনের দিকে। এটি শুরু হয় অতীত জন্মের সময়কালীন কারণগুলো দিয়ে, অর্থাৎ অতীত জন্মের অজ্ঞানতা ও সংস্কার। এগুলো বর্তমান জন্মের ফল, যথা : প্রতিসন্ধিচিত্ত, নামরূপ, ষড়ায়তন, স্পর্শ ও

বেদনার কারণ হয়। এরপর এই জীবনের সময়কালীন কারণগুলো, যথা : তৃষ্ণা, উপাদান এবং ভব (হওয়া), এগুলো ভবিষ্যৎ জন্মের ফল, যথা : জন্ম, জরা, মৃত্যু, এবং সকল ধরনের দুঃখের কারণ হয়।

আপনাকে খুঁজতে হবে ক্লেশবৃত্তের অজ্ঞানতা, তৃষ্ণা ও উপাদানকে। এগুলো কীভাবে কর্মবৃত্তের কারণ হয়, সেটাও আপনার দেখতে হবে। কর্মবৃত্তের কর্মশক্তি কীভাবে গর্ভাবস্থার পঞ্চস্কন্ধের কারণ হয় সেটাও দেখতে হবে।

পঞ্চম ও প্রথম পদ্ধতিতে কীভাবে প্রতীত্যসমুৎপাদ-নীতিকে দেখা যায়, তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এখানে শেষ হলো। কোনো যোগ্য গুরুর সাথে ভাবনা চর্চা করে আপনারা আরও বিস্তারিত শিখতে পারবেন।

প্রশ্নোত্তর পর্ব - ৬

প্রশ্ন ৬.১ : *কোনো ভাবনাকারী আনাপান ভাবনার সময়ে যদি নিমিত্ত না দেখে, তাহলে শারীরিক ও মানসিক কোন কোন বিষয়গুলোর প্রতি সতর্ক হওয়া দরকার যাতে করে সে উন্নতি করতে পারে এবং ধ্যান লাভ করতে পারে? অন্য কথায়, নিমিত্ত পাওয়ার জন্য কী কী পূর্বশর্ত লাগে?*

উত্তর ৬.১ : সব ধরনের ভাবনায় প্রতিনিয়ত চর্চা করাটা জরুরি। আনাপান ভাবনায় প্রত্যেকটি ইর্যাপথে, দেহের প্রত্যেক ভঙ্গিতে শ্বাসপ্রশ্বাসের প্রতি সচেতন থাকা উচিত এবং সেটি করা উচিত শ্রদ্ধার সাথে। হাঁটার সময়, দাঁড়ানোর সময়, অথবা বসে থাকার সময় শ্বাসপ্রশ্বাস ভিন্ন অন্য কোনো বিষয়বস্তু নিয়ে চিন্তা করবেন না; অর্থাৎ আপনি কেবল শ্বাসপ্রশ্বাসের প্রতি নজর রাখবেন। চিন্তা করাটা বন্ধ করার চেষ্টা করুন, কথা বলা বন্ধ করার চেষ্টা করুন। যদি এভাবে অবিরাম চেষ্টা করেন, তাহলে আপনার মনোযোগ ধীরে ধীরে গভীর হবে। কেবল গভীর, প্রবল ও শক্তিশালী মনোযোগই নিমিত্ত উৎপন্ন করতে পারে। নিমিত্ত ছাড়া, বিশেষ করে প্রতিভাগ-নিমিত্ত ছাড়া, কেউ ধ্যান লাভ করতে পারে না, কারণ আনাপান ধ্যানের বিষয়বস্তু বা আলম্বন হচ্ছে আনাপান প্রতিভাগ-নিমিত্ত।

প্রশ্ন ৬.২ : *বসার ভঙ্গি কি নবীন ভাবনাকারীদের মনোযোগের ক্ষমতা এবং ধ্যানে প্রবেশের ক্ষমতাকে প্রভাবিত করে? অনেক ভাবনাকারী আছে যারা ছোট্ট কোনো টুলে বসে ধ্যান করে। তারা কি ধ্যানে প্রবেশ করতে পারে?*

উত্তর ৬.২ : বসে ভাবনা করাটাই নবীনদের জন্য সবচেয়ে ভালো। যাদের আনাপান ভাবনায় যথেষ্ট পারমী আছে, তারা যে কোনো ইর্যাপথেই ধ্যানে

প্রবেশ করতে পারে। একজন সুদক্ষ ভাবনাকারীও যেকোনো ইর্যাপথে ধ্যানে প্রবেশ করতে পারে। তাই তারা টুল বা চেয়ারে বসে ধ্যানে প্রবেশ করতে পারে।

সারিপুত্র ভন্তে এবং সুভূতি ভন্তে এর ভালো উদাহরণ। সারিপুত্র ভন্তে নিরোধসমাপত্তিতে সুদক্ষ ছিলেন। পিন্ডচারণের জন্য গ্রামে গিয়ে তিনি প্রত্যেক বাড়িতে দান গ্রহণের আগে সব সময় নিরোধসমাপত্তিতে সমাধিস্থ হতেন। সেখান থেকে বেরিয়ে এসে তবেই তিনি সেই দান গ্রহণ করতেন। এটিই ছিল তার স্বভাব।

সুভূতি ভন্তে ছিলেন মৈত্রী-ভাবনায় সুদক্ষ। তিনিও প্রত্যেক ঘরে দান গ্রহণের আগে মৈত্রী-ধ্যানে প্রবেশ করতেন। মৈত্রী-ধ্যান থেকে বেরিয়ে এসে তিনি দান গ্রহণ করতেন। তারা কেন এটি করতেন? তারা চাইতেন যেন দাতা তার দানের সর্বোচ্চ সুবিধা পায়। তারা জানতেন যে, এটি করলে দাতার মনে অপরিমেয় এবং উৎকৃষ্ট কুশলকর্মজাত চেতনা সঞ্চিত হবে। দাতাদের প্রতি তাদের এমনই মৈত্রীভাব ছিল। এভাবে তারা দাঁড়ানো অবস্থাতেই সমাপত্তিতে প্রবেশ করতে সমর্থ ছিলেন।

প্রশ্ন ৬.৩ : *চতুর্থ আনাপান ধ্যানের বিষয়বস্তু কী? যদি সেখানে কোনো শ্বাসপ্রশ্বাস না থাকে, তাহলে নিমিত্ত আসে কীভাবে?*

উত্তর ৬.৩ : শ্বাসপ্রশ্বাস না থাকলেও চতুর্থ আনাপান ধ্যানে তখনো প্রতিভাগ-নিমিত্ত থাকে। সেই আনাপান প্রতিভাগ-নিমিত্ত উৎপন্ন হয়েছিল স্বাভাবিক শ্বাসপ্রশ্বাস থেকে। এ কারণে বিষয়বস্তু তখনো শ্বাসপ্রশ্বাস থাকে। এটি *পটিসম্ভিদামগ্গ অর্থকথা* এবং *বিশুদ্ধিমার্গ টীকাতে* ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

প্রশ্ন ৬.৪ : *কেউ কি আনাপান ভাবনা থেকে সরাসরি অরূপ ধ্যানে প্রবেশ করতে পারে? অথবা মৈত্রী-ভাবনা করতে পারে?*

উত্তর ৬.৪ : চতুর্থ আনাপান ধ্যান থেকে সরাসরি অরূপ ধ্যানে প্রবেশ করা যায় না। কেন? অরূপ ধ্যানগুলো, বিশেষ করে আকাশ-অনন্ত-আয়তন ধ্যান লাভ করা হয় কৃৎস্নকে সরিয়ে ফেলার মাধ্যমে। কৃৎস্ন বিষয়কে না সরিয়ে আকাশ-অনন্ত-আয়তন ধ্যান লাভ করা যায় না। কৃৎস্ন বিষয়বস্তুকে সরিয়ে ফেলে এবং আকাশের উপরে মনোযোগ দিলে তবেই আকাশ-অনন্ত-আয়তন ধ্যান উৎপন্ন হবে। যখন ভাবনাকারী আকাশ দেখবে, তখন তাকে অবশ্যই সেটাকে ধীরে ধীরে বাড়াতে হবে। যখন এটি সকল দিকে বিস্তৃত হয়ে ছড়িয়ে পড়বে, তখন কৃৎস্ন বস্তু অদৃশ্য হয়ে যাবে। এই আকাশকে অবশ্যই অসীম মহাবিশ্ব পর্যন্ত বাড়াতে হবে। এটিই আকাশ-অনন্ত-আয়তন ধ্যানের বিষয়বস্তু,

যা এরপরে বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন ধ্যানের বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়ায়। আকাশ-অনন্ত-আয়তন ধ্যানের অনুপস্থিতিই আকিঞ্চনায়তন ধ্যানের বিষয়বস্তু। এই আকিঞ্চনায়তন ধ্যান সবশেষে নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন ধ্যানের বিষয়বস্তু হয়। অতএব চারটি অরূপ ধ্যানের ভিত্তি হচ্ছে কোনো একটি চতুর্থ কৃৎস্ন ধ্যান এবং এর বিষয়বস্তু। কৃৎস্নকে না সরিয়ে কেউ অরূপ ধ্যান লাভ করতে পারে না। তাই ভাবনাকারী যদি আনাপান ভাবনায় চতুর্থ ধ্যান পর্যন্ত যায়, এবং অরূপ ধ্যানে যেতে চায়, তাহলে তার প্রথমে দশ কৃৎস্ন-ভাবনা করা উচিত চতুর্থ ধ্যান পর্যন্ত। এর পরই কেবল সে অরূপ ধ্যানে যেতে পারে।

যদি কেউ চতুর্থ আনাপান ধ্যানের পরে মৈত্রী-ভাবনা করতে চায়, সে তা করতে পারে, তাতে কোনো সমস্যা নেই। তাকে অবশ্যই চতুর্থ আনাপান ধ্যানের আলোয় তার মৈত্রীর বিষয়বস্তু ব্যক্তিকে দেখতে হবে। ধ্যানের আলো প্রবল না হলে এতে একটু সমস্যা হয়। কিন্তু সেটা ব্যতিক্রম। যদি চতুর্থ কৃৎস্ন ধ্যান, বিশেষ করে চতুর্থ সাদা কৃৎস্ন ধ্যান করে এরপর মৈত্রী-ভাবনা করে, তাহলে সে তাড়াতাড়ি সফল হতে পারে। এ কারণেই আমরা মৈত্রী-ভাবনার আগে সাদা কৃৎস্ন-ভাবনা শিক্ষা দিই।

প্রশ্ন ৬.৫ : *কীভাবে কোনো একজন নির্ধারণ করে কখন মরবে, অর্থাৎ নিজের মৃত্যুর সময়টা কীভাবে বেছে নেয়?*

উত্তর ৬.৫ : যদি আপনি আনাপান ভাবনা চর্চা করে থাকেন অর্হত্ত্বমার্গ পর্যন্ত, তাহলে আপনি একদম নিখুঁতভাবে আপনার পরিনির্বাণের সময়টা জানতে পারবেন। বিশুদ্ধিমার্গে এক মহাথেরোর কথা উল্লেখ আছে যিনি হাঁটতে হাঁটতে পরিনির্বাণ লাভ করেছিলেন। প্রথমে তিনি তার চংক্রমণের পথে একটা দাগ টানলেন, এর পর তার সতীর্থ ভাবনাকারীদের বললেন যে এই দাগে পৌঁছলে তিনি পরিনির্বাণ লাভ করবেন। তিনি যেমনটা বলেছিলেন সেভাবেই পরিনির্বাপিত হয়েছিলেন। যারা অর্হৎ নয়, যদি তারা প্রতীত্যসমুৎপাদ-নীতি, বা অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের মধ্যকার কার্যকারণ সম্বন্ধীয় নীতির চর্চা করে, তাহলেও তারা তাদের আয়ুষ্কাল জানতে পারে, কিন্তু উপর্যুক্ত মহাথেরোর মতো এত নিখুঁতভাবে নয়। তারা সঠিক সময়টা জানে না, কখন মৃত্যু হবে তার একটা সময়সীমা জানতে পারে মাত্র।

কিন্তু, তারা মরে এবং পরিনির্বাণ লাভ করে কর্মনিয়মে, তাদের আপন ইচ্ছা অনুসারে নয়। সারিপুত্র ভন্তের একটি উদান আছে :

'নাভিনন্দামি জীবিতং নাভিনন্দামি মরণং; কালঞ্চ পটিকণখামি, নিব্বিসং ভতকো যথা।'—আমি জীবনকেও ভালোবাসি না, মরণকেও ভালোবাসি না।

কেবল পরিনির্বাণের সময়ের জন্য অপেক্ষা করি, ঠিক যেন কোনো সরকারি চাকুরিজীবী তার বেতনের সময়ের অপেক্ষায় থাকে।'

ইচ্ছে করে মরে যাওয়াকে বলা হয় 'ইচ্ছামৃত্যু' (অধিমুক্তি-মরণ)। এটি সাধারণত কেবল পরিপূর্ণ বোধিসত্ত্বদের বেলায় হয়। তারা কেন ইচ্ছামৃত্যু বরণ করে? যখন তারা দেবলোকে জন্মগ্রহণ করে, সেখানে তাদের পারমী পূর্ণ করার সুযোগ থাকে না, তারা সেখানে সময় নষ্ট করতে চায় না, তাই মাঝে মাঝে তারা মরার সিদ্ধান্ত নেয় এবং মানবজগতে জন্ম নেয় তাদের পারমী পূর্ণ করার জন্য।

প্রশ্ন ৬.৬ : *যদি আমরা কোনো একদিন দুর্ঘটনায় মারা যাই, যেমন ধরুন বিমান দুর্ঘটনায়, আমাদের মনকে কি তখন সেই সময়ের জন্য ত্যাগ করা সম্ভব যাতে শারীরিক ব্যথা অনুভূত না হয়? কীভাবে সম্ভব? ধ্যানশক্তির উপর নির্ভর করে তখন কি কেউ নির্ভয়ে থাকতে পারে এবং বিমুক্তি লাভ করতে পারে? কোন মাত্রার সমাধি এখানে প্রয়োজন?*

উত্তর ৬.৬ : সমাধির মাত্রা বলতে এখানে লাগবে অলৌকিক শক্তি পেতে যে সমাধি লাগে তা। এসব অলৌকিক শক্তি দ্বারা আপনি বিপদ থেকে মুক্ত হতে পারবেন, কিন্তু অকুশল কর্ম পরিপক্ব হয়ে ফল দেওয়ার সময় হলে তখন আর পারবেন না।

মহামোগ্গল্লান ভন্তের ব্যাপারটা আপনার স্মরণ করা উচিত। তিনি ছিলেন অলৌকিক শক্তিতে সুদক্ষ, কিন্তু একদিন তার অকুশল কর্মগুলো পরিপক্ব হওয়ায় তিনি ধ্যানে প্রবেশ করতে পারলেন না। এটি কোনো ক্লেশ বা প্রতিবন্ধকতার কারণে নয়, এর কারণ ছিল কেবল তার পরিপক্ব অকুশল কর্ম। এ কারণে ডাকাতরা তার হাড়গোড়গুলো চালের গুঁড়োর সমান করে চূর্ণবিচূর্ণ করে ফেলতে সক্ষম হয়েছিল। তাকে মৃত ভেবে ডাকাতরা চলে গেলে তিনি আবার ধ্যানে প্রবেশ করতে সক্ষম হলেন এবং অলৌকিক শক্তি ফিরে পেলেন। তিনি অধিষ্ঠান করলেন তার দেহ পুনরায় একত্রিত হোক। এরপর তিনি বুদ্ধের কাছে গিয়ে পরিনির্বাণ লাভের অনুমতি প্রার্থনা করলেন এবং কালশিলা বৌদ্ধবিহারে ফিরে গিয়ে সেখানে পরিনির্বাণ লাভ করলেন। তার পরিপক্ব অকুশল কর্মগুলো প্রথমে তাদের ফল দিল, এরপরে তারা তাদের শক্তি হারিয়ে ফেলল, এবং কেবল তখনি তিনি তার অলৌকিক শক্তিগুলো ফিরে পেলেন।

কাজেই আপনার যদি কোনো পরিপক্ব হওয়ার মতো অকুশল কর্ম না থাকে এবং অলৌকিক শক্তি থাকে, তবে আপনি বিমান দুর্ঘটনা থেকে পালাতে

পারেন। কিন্তু সাধারণ ধ্যান সমাধি এবং বিদর্শন জ্ঞান আপনাকে এমন বিপদ থেকে বাঁচাতে পারবে না। প্রকৃতপক্ষে আমরা বলতে পারি যে এ ধরনের বিপদের সম্মুখীন হওয়ার প্রথম কারণটাই হতে পারে যে, আপনার কোনো অকুশল কর্ম পরিপক্ব হতে যাচ্ছে।

মন দেহকে ত্যাগ করে যেতে পারে না, কারণ ষড়ায়তনের যেকোনো একটির উপর মন উৎপন্ন হয়। ছয়টি আয়তন হচ্ছে চক্ষু-প্রসাদ-ধাতু, চক্ষু-আয়তন; কর্ণ-প্রসাদ-ধাতু, কর্ণ-আয়তন; ঘ্রাণ-প্রসাদ-ধাতু, ঘ্রাণ-আয়তন; জিহ্বা-প্রসাদ-ধাতু, জিহ্বা-আয়তন; কায়-প্রসাদ-ধাতু, কায়-আয়তন; ভবাঙ্গ মনোদ্বার, মন-আয়তন। এগুলো হচ্ছে আমাদের দেহের ছয় আয়তন। মানবজগতের মন আয়তনহীন হয়ে উৎপন্ন হতে পারে না। এ কারণেই মন দেহকে ত্যাগ করতে পারে না।

আমরা অবশ্য পরামর্শ দিই যে আপনার যদি ধ্যান লাভ হয়ে থাকে, তাহলে বিপদের সময় তাড়াতাড়ি সেই ধ্যানে প্রবেশ করা উচিত। তার মানে আপনার ধ্যানে প্রবেশের দক্ষতাগুলোতে পরিপূর্ণভাবে দক্ষ হতে হবে। যদি আপনি বিপদের মুহূর্তে ধ্যানে প্রবেশ করেন, তাহলে সেই কুশলকর্ম আপনাকে বাঁচাতে পারে, কিন্তু আমরা তা নিশ্চিত করে বলতে পারি না। যদি আপনি ধ্যানে থাকাকালীন মারা যান, যদি মৃত্যুর সময়ে আপনি ধ্যানের মধ্যে থাকেন, তাহলে হয়তো কোনো একটা ব্রহ্মলোকে পৌঁছে যেতে পারেন।

যদি আপনি বিদর্শনে দক্ষ হন, তাহলে বিপদের সময় আপনার এটি চর্চা করা উচিত। সংস্কার ধর্মগুলোর অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম স্বভাবকে আপনার উপলব্ধি করা উচিত। মৃত্যুর আগ মুহূর্ত পর্যন্ত যদি যথাযথভাবে বিদর্শন ভাবনা করতে পারেন, তাহলে আপনি হয়তো মার্গফল লাভ করতে পারেন এবং মৃত্যুর পরে কোনো সুখময় জন্ম লাভ করতে পারেন। কিন্তু যদি অর্হত্ত্ব লাভ করতে পারেন, তো পরিনির্বাণ লাভ করবেন। তবে আপনার যদি অলৌকিক শক্তি না থাকে, ধ্যান না থাকে, অথবা বিদর্শনচর্চা করতে সক্ষম না হন, তাহলেও আপনি বাঁচতে পারেন, কেবল সুকৃত কর্মের দ্বারা। যদি আপনার যথেষ্ট ভালো কর্ম থাকে, যা দীর্ঘ জীবন নিশ্চিত করে, তাহলে সেই বিপদ থেকে রক্ষা পাবারও একটা উপায় হতে পারে, মহাজনক বোধিসত্ত্বের মতো।

প্রশ্ন ৬.৭ : *মার্গফল লাভ করার পরে একজন আর্য ব্যক্তি আর সাধারণ পৃথকজন অবস্থায় ফিরে যেতে পারে না, এটি প্রকৃতির নিয়ম (সম্মত-নিয়ম)। একইভাবে সুনির্দিষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী লাভ করা কোনো বোধিসত্ত্বও তার কর্তব্য পরিত্যাগ করতে পারেন না। এটিও প্রকৃতির নিয়ম। কিন্তু বুদ্ধ ঘোষণা*

করেছিলেন যে সবকিছু অনিত্য[১]*। এই প্রকৃতির নিয়মগুলো কি অনিত্যতার নিয়মের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ?*

উত্তর ৬.৭ : এখানে আপনার বুঝা উচিত কোনটা নিত্য এবং কোনটা অনিত্য। কর্মনিয়ম বলে, অকুশল কর্মগুলো খারাপ ফল দেয়, আর কুশল কর্মগুলো ভালো ফল দেয়। এটি একটি স্থায়ী নিয়ম, প্রকৃতির চিরন্তন নীতি। তার মানে কি এই যে, কুশল ও অকুশল কর্মগুলো নিত্য, স্থায়ী? দয়া করে এটি ভাবুন।

যদি কুশল কর্মগুলো স্থায়ী হতো, স্থায়ী হতো, তাহলে এটি বিবেচনা করুন : এখন আপনি বুদ্ধের অভিধর্ম বিষয়ে ধর্মদেশনা শুনছেন। এটিকে বলা হয় ধর্মশ্রবণ-কুশলকর্ম। এটি কি স্থায়ী? দয়া করে ভাবুন তো।

যদি এটি স্থায়ী হতো, তাহলে আপনার সারাটা জীবনে কেবল এই কর্মটাই থাকত, আর কোনো কিছু থাকত না। কুশল কর্মগুলো ভালো ফল দেয়, অকুশলকর্মগুলো খারাপ ফল দেয়। এটি একটি স্থায়ী নিয়ম, কিন্তু তার মানে এই নয় যে কর্মগুলো স্থায়ী। কুশল চেতনা এবং অকুশল চেতনাগুলো কর্ম। উৎপন্ন হওয়া মাত্রই তারা বিলীন হয়ে যায়। এটি তাদের অনিত্য স্বভাব। এটি তাদের স্বভাব। কিন্তু কর্মশক্তি, কর্মের ফল দেওয়ার যে ক্ষমতা, তা তখনো নামরূপের প্রবাহে বর্তমান থাকে।

একটি আমগাছের কথা ধরা যাক। সেখানে এখন কোনো ফল না থাকলেও এটা নিশ্চিত যে একদিন গাছটাতে ফল ধরবে। এটি হচ্ছে স্থায়ী নিয়ম, প্রকৃতির চিরন্তন নীতি। আপনি বলতে পারেন, গাছটাতে ফল ধরার ক্ষমতা আছে। সেই ক্ষমতাটা কী? যদি আমরা পাতা, ডালপালা, বাকল ও কান্ডের সবখানে দেখি, আমরা সেটা দেখতে পাই না। কিন্তু তার মানে এই নয় যে গাছটির ফল ধরার ক্ষমতা নেই। কারণ, একদিন গাছটি সত্যিই ফল উৎপন্ন করবে। একইভাবে আমরা বলি না যে কুশল এবং অকুশল কর্মগুলো স্থায়ী। আমরা বলি কর্মশক্তি আছে আমাদের নামরূপের প্রবাহে একটি ক্ষমতা হিসেবে, এবং একদিন যখন কর্মশক্তি পরিপক্ব হবে, তখন এটি তার ফল দেবে।

আসুন এবার স্থায়ী নিয়মগুলো (সম্মত-নিয়ম) সম্বন্ধে আলোচনা করি। আমরা বলি, মার্গফল ধর্মগুলো হচ্ছে একটি স্থায়ী আইনের অধীন ধর্ম। কিন্তু

---

[১]. সম্পাদকের উক্তি : বুদ্ধ বলেন নি, 'সবকিছুই অনিত্য।' বুদ্ধ বলেছেন, 'সকল সংস্কার অনিত্য।' (ধম্মপদ, ২৭৭)

আমরা বলি না যে তারা নিত্য। তারাও অনিত্য, কিন্তু যারা মার্গফল ও নির্বাণ লাভ করেছে, তাদের মার্গজ্ঞানের শক্তি নামরূপের প্রবাহে বর্তমান থাকে। এই শক্তির উপস্থিতিকে বলা হয় স্থায়ী নিয়ম। এই শক্তি উচ্চ থেকে উচ্চতর ফল দিতে পারে, কিন্তু হীনফল দিতে পারে না। এটিও একটি স্থায়ী নিয়ম। এখানে আপনার এটি একবার ভাবা উচিত : অর্হত্ত্ব লাভ করা সহজ নয়। আপনাকে প্রচন্ড প্রচেষ্টা চালাতে হবে, প্রবল অধ্যবসায়ের প্রয়োজন হবে। উদাহরণস্বরূপ, আমাদের শাক্যমুনি বোধিসত্ত্ব তার শেষ জন্মে ছয় বছর ধরে খুব কঠোর চেষ্টা করেছিলেন সর্বজ্ঞতা জ্ঞানসহ অর্হত্ত্ব লাভের জন্য। আপনি কল্পনা করতে পারেন কেমন কঠিন ছিল এটি। তাই এমন কষ্ট করে অর্হত্ত্ব লাভ করার পরে যদি তিনি আবার পৃথকজন হয়ে যান, তাহলে এমন চর্চার কী ফল হবে? আপনি এটি একটু মন দিয়ে ভাবুন তো।

এ প্রসঙ্গে আমি একটু ব্যাখ্যা করতে চাই, কখন একজন বোধিসত্ত্ব একটি সুনির্দিষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী লাভ করতে পারেন।

'মনুস্সত্তং লিঙ্গসম্পত্তি, হেতু সত্থারদস্সনং;পব্বজ্জা গুণসম্পত্তি, অধিকারো চ ছন্দতা; অট্ঠধম্মসমোধানা অভিনীহারো সমিজ্ঝতি।'

তিনি একটি সুনির্দিষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী লাভ করতে পারেন যখন তার নিম্নোক্ত আটটি শর্ত পরিপূর্ণ থাকে :

১. *মনুস্সত্তং* : তিনি একজন মানুষ।

২. *লিঙ্গসম্পত্তি* : তিনি একজন পুরুষ।

৩. *হেতু* : তার অর্হত্ত্ব লাভের যথেষ্ট পারমী আছে। অর্থাৎ বুদ্ধের কাছ থেকে চারি আর্যসত্য-সম্বলিত একটি গাথা শুনেই অর্হত্ত্ব লাভ করতে পারার মতো পারমী আছে। তার মানে সে অবশ্যই আগে বিদর্শন জ্ঞান ভাবনা করেছে যথাযথভাবে একেবারে সংস্কারোপেক্ষা জ্ঞান পর্যন্ত।

৪. *সত্থারদস্সনং* (শাস্তার দেখা পাওয়া) : তিনি বুদ্ধের সাক্ষাৎ লাভ করেন।

৫. *পব্বজ্জা* (সন্ন্যাস) : তিনি সংসার ত্যাগ করে ঋষি অথবা ভিক্ষু হন।

৬. *গুণসম্পত্তি* (গুণসম্পন্ন) : তিনি অষ্ট সমাপত্তি এবং পঞ্চ অভিজ্ঞালাভী।

৭. *অধিকারো* (চরম উৎসর্গ) : সুনির্দিষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী লাভ করার জন্য তার যথেষ্ট পারমী আছে। তার মানে হচ্ছে যে তাকে অবশ্যই অতীত জন্মগুলোতে সর্বজ্ঞতা জ্ঞান লাভ করতে প্রয়োজনীয় পারমীর চর্চা করতে হবে। অন্য কথায় তার অবশ্যই সর্বজ্ঞতা জ্ঞানের জন্য বিদ্যা ও আচরণের বীজ বোনা থাকতে হবে অতীত বুদ্ধদের শাসনে। যশোধরা অপদান অনুসারে, ভাবী রাজকুমার

সিদ্ধার্থ অনেক শত কোটি বুদ্ধের সামনে সর্বজ্ঞতা জ্ঞান লাভের প্রার্থনা করেছিলেন এবং ভাবী রাজকুমারী যশোধরাও অনেক শতকোটি বুদ্ধের সামনে তাকে বুদ্ধত্ব লাভে সাহায্য করার প্রার্থনা করেছিলেন। তারা এভাবে অতীত অসংখ্য বুদ্ধদের দিকনির্দেশনা নিয়ে তাদের সকল পারমী পূরণ করেছিলেন।

৮. *ছন্দ* (প্রবল ইচ্ছা) : তার অবশ্যই সর্বজ্ঞতাজ্ঞান লাভের প্রবল ইচ্ছা থাকতে হবে। কেমন প্রবল সেই ইচ্ছা? ধরুন সারা বিশ্ব হচ্ছে জ্বলন্ত কয়লা। কেউ যদি তাকে বলত যে সারা বিশ্বের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত সেই জ্বলন্ত কয়লাকে অতিক্রম করতে পারলে সে সর্বজ্ঞতা জ্ঞান লাভ করতে পারবে, তাহলে সে ইতস্তত না করেই সেই জ্বলন্ত কয়লাকে অতিক্রম করতে এগিয়ে যাবে। এখানে আমি একটু প্রশ্ন করি : আপনি কি সেই জ্বলন্ত কয়লার উপর দিয়ে যাবেন? যদি সারা বিশ্ব না হয়, তাহলে কেবল তাইওয়ান থেকে এই পা-অক পর্যন্ত জ্বলন্ত কয়লা, আপনি কি তা অতিক্রম করতে যাবেন? যদি এটি নিশ্চিত হওয়া যায় যে এভাবেই সর্বজ্ঞতা জ্ঞান লাভ করা যাবে, তাহলে বোধিসত্ত্ব সেই জ্বলন্ত কয়লা অতিক্রম করতে যাবেন। সর্বজ্ঞতা জ্ঞান লাভের জন্য এমনই তার ইচ্ছা শক্তি।

যদি এই আটটি শর্ত কোনো বোধিসত্ত্বের মধ্যে পরিপূর্ণ থাকে, তাহলে তিনি বুদ্ধের কাছ থেকে নিশ্চিতভাবে একটি সুনির্দিষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী পাবেন। এই আটটি গুণ ছিল আমাদের শাক্যমুনি বোধিসত্ত্বের মধ্যে, যখন তিনি দীপঙ্কর বুদ্ধের আমলে সুমেধ নামে এক সন্ন্যাসী ছিলেন। এ কারণেই তিনি দীপঙ্কর বুদ্ধের কাছ থেকে এই সুনির্দিষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী লাভ করেছিলেন : 'তুমি চার অসংখ্য ও এক লক্ষ কল্প পরে সর্বজ্ঞতা জ্ঞান লাভ করবে এবং তোমার নাম হবে গৌতম।'

এখন, ভবিষ্যদ্বাণী 'সুনির্দিষ্ট' বলতে কি বুঝায়? এটি সুনির্দিষ্ট, কারণ এটিকে আর পাল্টানো যাবে না। তার মানে এই নয় যে এটি নিত্য। দীপঙ্কর বুদ্ধের নামরূপ অনিত্য। সুমেধ সন্ন্যাসীর নামরূপও অনিত্য। এটি তো জানা কথা। কিন্তু কর্মশক্তি, বিশেষ করে তার পারমীর শক্তি ধ্বংস হবে না যতক্ষণ না তিনি সর্বজ্ঞতা জ্ঞান লাভ করতে পারেন। দীপঙ্কর বুদ্ধের কথা, অর্থাৎ সুনির্দিষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী, সেটাকেও বদলানো যাবে না, আর সেটা মিথ্যাও হতে পারে না। যদি সেই কথাগুলো বদলে যেতো যাতে করে সুনির্দিষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী সত্যি না হয়, তাহলে সেখানে আরেকটা সমস্যা হতো। তখন বলা হতো যে বুদ্ধ মিথ্যাবাক্য বলেছেন। একজন বুদ্ধ একটি সুনির্দিষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী করেন কেবল তখনই যখন তিনি দেখেন যে উপর্যুক্ত আটটি শর্ত পরিপূর্ণ আছে।

উদাহরণস্বরূপ, যদি কৃষিকাজে দক্ষ কোনো ব্যক্তি উপযুক্ত পরিবেশে কোনো একটি কলাগাছকে দেখেন, তিনি বলে দিতে পারবেন যে এই গাছে চার মাস পরে ফল ধরবে। একইভাবে যখন কেউ আটটি শর্ত পূর্ণকারী হয়, তখন বুদ্ধ দেখতে পান যে সে তার সর্বজ্ঞতা জ্ঞানের ফল লাভ করবে, সেজন্যই তিনি একটি সুনির্দিষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারেন।

দীপঙ্কর বুদ্ধের আমলে আমাদের শাক্যমুনি বোধিসত্ত্ব ছিলেন সুমেধ সন্ন্যাসী এবং পৃথকজন। রাজকুমার সিদ্ধার্থ হয়েও বুদ্ধত্ব লাভের আগ পর্যন্ত তিনি তখনো পৃথকজন। কেবল বুদ্ধত্ব লাভের পরই তিনি শাক্যমুনি বুদ্ধ হলেন। সর্বজ্ঞতা জ্ঞানের সাথে সংশ্লিষ্ট অর্হত্ত্বমার্গ লাভের পরে তিনি আর তার অর্হত্ত্বমার্গকে বদলাতে পারেন নি, এটিই প্রকৃতির নিয়ম। এখানে প্রকৃতির নিয়ম মানে হচ্ছে যে অর্হত্ত্বমার্গের ফলটা বদলানো যাবে না। এর মানে এই নয় যে অর্হত্ত্বমার্গ নিত্য। এর মানে হচ্ছে এর ফল আসে একটি কর্মশক্তির কারণে, যে কর্মকে বদলানো যায় না। সেটা কী রকম?

এর মানে হচ্ছে যে অর্হত্ত্বমার্গ নিশ্চিতভাবেই অর্হত্ত্বফল উৎপন্ন করবে, এবং নিশ্চিতভাবেই এটি সকল ক্লেশকে ধ্বংস করবে, সকল অকুশল ও কুশলকর্মকে ধ্বংস করবে, অন্যথায় এগুলো তার পরিনির্বাণের পরেও ফল দিতো। এই কর্মনিয়মকে বলা হয় প্রকৃতির নিয়ম এবং এটিকে বদলানো যায় না। তাই প্রকৃতির নিয়ম এবং সুনির্দিষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী অনিত্যতার নীতির বিপরীত নয়।

এখানে আমি আরেকটু মন্তব্য করতে চাই। কেবল আকাঙ্ক্ষা বা প্রার্থনা সর্বজ্ঞতা জ্ঞান লাভের জন্য যথেষ্ট নয়। যখন বোধিসত্ত্বরা কোনো সুনির্দিষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী লাভ করেন, তাদের আটটি শর্ত অবশ্যই পরিপূর্ণ হতে হয়। তা ছাড়া, একটি সুনির্দিষ্ট ভবিষ্যদ্বাণীও বুদ্ধত্ব লাভ করাতে পারে না। সেই সুনির্দিষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী ছাড়াও তাদের অবশ্যই দশ পারমী পূর্ণ করতে হয় তিনটি স্তরে : দশটি মূল পারমী, নিজের পুত্র, কন্যা, স্ত্রী ও স্থাবর অস্থাবর যাবতীয় ধনসম্পত্তি ত্যাগ করা; দশটি উপপারমী, নিজেদের হাত-পা-চোখ ইত্যাদি অঙ্গ ত্যাগ করা; এবং দশ পরমার্থ পারমী, নিজেদের জীবন ত্যাগ করা, সবগুলো একত্রে মিলে ত্রিশটি পারমী। যদি আমরা এগুলোকে সংক্ষেপে বলতে চাই, তাহলে কেবল থাকে : দান, শীল এবং শমথ ও বিদর্শন ভাবনা। এগুলো হচ্ছে সর্বোৎকৃষ্ট কুশলকর্ম। বোধিসত্ত্বদের জড়-অজড় সম্পত্তি, তাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এবং তাদের জীবন দিয়েও এগুলো অবশ্যই পরিপূর্ণ করতে হয়। যদি আপনি মনে করেন যে আপনি একজন বোধিসত্ত্ব, আপনি কি এই পারমীগুলো পূরণ করবেন? যদি আপনি পারেন, এবং যদি কোনো বুদ্ধের কাছ থেকে সুনির্দিষ্ট

ভবিষ্যদ্বাণী লাভ করে থাকেন, তাহলে একদিন আপনি সর্বজ্ঞতা জ্ঞান লাভ করবেন। কিন্তু থেরবাদী শিক্ষাগুলো অনুসারে একবারে কেবল একজন বুদ্ধই উৎপন্ন হতে পারেন। আর কত সময় ধরে তাদের পারমী পূর্ণ করতে হয়? আমাদের শাক্যমুনি বুদ্ধ তার সুনির্দিষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী লাভ করার পরে চার অসংখ্য এবং একলক্ষ কল্প ধরে পারমী পূর্ণ করেছিলেন। এটি হচ্ছে সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত সময়। কিন্তু আমরা বলতে পারি না, সুনির্দিষ্ট ভবিষ্যদ্বাণীর আগে আরও ঠিক কত সময় লেগেছিল তার। তাই আপনাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, কেবল আকাঙ্ক্ষা বা প্রার্থনা বুদ্ধ হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়।

প্রশ্ন ৬.৮ : *যখন সাধারণ কোনো শ্রাবক শমথ-বিদর্শন ভাবনা করে, প্রত্যয়-পরিগ্রহ জ্ঞান, উদয়-ব্যয়জ্ঞান অথবা সংস্কারোপেক্ষা জ্ঞান পর্যন্ত, সে চার অপায়ে জন্মগ্রহণ করবে না। এমনকি সে যদি অবহেলার কারণে শমথ-বিদর্শন হারিয়েও ফেলে, তবুও তার শমথ-বিদর্শন ভাবনার কর্ম তখনো বর্তমান থাকে। সোতানুগত সূত্র আরও বলে যে সে দ্রুত নির্বাণ লাভ করবে। তাহলে, সেয়াদ কেন, জুনের ২ তারিখের প্রশ্নোত্তর পর্বের সময় বললেন যে, একজন বোধিসত্ত্ব, যে বুদ্ধের কাছ থেকে কোনো সুনির্দিষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী লাভ করেছে, যদিও সে সংস্কারোপেক্ষা জ্ঞান পর্যন্ত ভাবনা চর্চা করেছে, তবুও সে অপায়ে পড়তে পারে? কোন সূত্রে এটি বলা হয়েছে?*

উত্তর ৬.৮ : এর কারণ হচ্ছে বোধিসত্ত্বমার্গ এবং শ্রাবকমার্গ এক নয়। আপনি এটি বুদ্ধবংশ এবং চরিয়াপিটকের পালি শাস্ত্রগুলোতে খুঁজে পেতে পারেন।

কীভাবে ভিন্ন তারা? বোধিসত্ত্ব যদিও একজন বুদ্ধের কাছ থেকে সুনির্দিষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী লাভ করেছেন, তার পারমী তখনো সর্বজ্ঞতা জ্ঞান লাভের জন্য যথেষ্ট পরিপক্ব হয় নি। তাকে আরও পারমী পূর্ণ করতে হবে। এক্ষেত্রে যেমন ধরুন, আমাদের শাক্যমুনি বোধিসত্ত্বের কথা। দীপঙ্কর বুদ্ধের কাছ থেকে সুনির্দিষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী লাভের পরেও তাকে পারমী পূর্ণ করতে হয়েছিল চার অসংখ্য এবং এক লক্ষ কল্প ধরে। সুনির্দিষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী ও সর্বশেষ জন্ম, এ দুয়ের মাঝখানের সময়ে বোধিসত্ত্বকে মাঝে মাঝে পশু হিসেবে জন্ম নিতে হয়েছে তার অতীতের অকুশল কর্মের কারণে। এই সময়ে সে তার অকুশল কর্মকে পুরোপুরি ধ্বংস করতে অসমর্থ ছিল। কাজেই যখন অকুশল কর্মগুলো পরিপক্ব হয়েছে, তখন সে আর তাদের ফলকে এড়াতে পারে নি। এটি হচ্ছে প্রকৃতির নিয়ম।

কিন্তু সাধারণ শ্রাবকেরা, যারা প্রত্যয়-পরিগ্রহ জ্ঞান, উদয়-ব্যয় জ্ঞান অথবা সংস্কারোপেক্ষা জ্ঞান লাভ করেছে, তাদের মার্গফল লাভ করার মতো যথেষ্ট

পারমী হয়ে গেছে। এ কারণে তারা মার্গফল লাভ করে, অর্থাৎ নির্বাণকে দেখে, ইহজন্মে অথবা তার পরবর্তী জন্মে। এটিও চিরন্তন নিয়ম।

প্রশ্ন ৬.৯ : *একজন অর্হৎও সুনির্দিষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারে; সেই সুনির্দিষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী কী? কোন সূত্রে বা কোন উৎস থেকে এই তথ্য পাওয়া যেতে পারে?*

উত্তর ৬.৯ : তার জন্য আপনারা দয়া করে বুদ্ধবংশ পালি এবং অপদান পালি দেখুন। তবে বিশেষ করে যেসব অর্হতের কাছে অনাগত-বংশ জ্ঞান আছে, যা দিব্যচক্ষুর চেয়ে গৌণ, তারাই কেবল কোনো সুনির্দিষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারে। তারা কেবল সীমিত সংখ্যক ভবিষ্যৎ জন্মকে দেখতে পারে, বুদ্ধের মতো অনেক অসংখ্য বা কল্প জন্মকে দেখতে পারে না।

প্রশ্ন ৬.১০ : *নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন সমাপত্তিতে থাকার সময়ে কি বিদর্শন ভাবনা করা যায়? কোন সূত্রে বা কোন উৎস থেকে এর উত্তর জানা যাবে?*

উত্তর ৬.১০ : ধ্যান-সমাপত্তিতে থাকাকালীন কেউই বিদর্শন ভাবনা করতে পারে না। নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন সমাপত্তি হচ্ছে এমন একটি ধ্যান-সমাপত্তি। ধ্যান থেকে বেরিয়ে আসলে তবেই বিদর্শন ভাবনা করা যায়। উদাহরণস্বরূপ, ধ্যানচিত্ত এবং তার চৈতসিকগুলো, এক্ষেত্রে একত্রিশটি চৈতসিক। মধ্যমনিকায়ের *অনুপাদ সূত্রে* এর উল্লেখ আছে। এখানে বুদ্ধ সারিপুত্র ভন্তের স্রোতাপত্তিফল লাভের পনেরতম দিনে বিস্তারিতভাবে ধ্যান সম্বন্ধে দেশনা করেছেন।

উদাহরণ হিসেবে, সারিপুত্র ভন্তে প্রথম ধ্যানে প্রবেশ করলেন। তিনি সেখান থেকে বেরিয়ে এসে চৌত্রিশটি সংস্কারকে একটি একটি করে তাদের উদয়, স্থিতি ও বিলয়ের ধাপগুলো দেখে দেখে তাদের অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম হিসেবে উপলব্ধি করলেন। এভাবে তিনি আকিঞ্চনায়তন ধ্যান পর্যন্ত গেলেন। এটিই অনুপদ-ধর্ম বিদর্শন (মৌলিক ধর্মগুলোর বিদর্শন), যেখানে সংস্কারগুলো একটি একটি করে দেখা হয়। কিন্তু যখন তিনি নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন সমাপত্তিতে পৌঁছলেন, তিনি সংস্কারগুলোকে কেবল গুচ্ছ হিসেবে দেখতে পারলেন। এটি হচ্ছে কলাপ-সংমর্শন জ্ঞান (গুচ্ছ হিসেবে দেখার বিদর্শন)। কেবল বুদ্ধই নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তনের ধ্যানধর্মগুলোকে একটি একটি করে দেখতে পারেন। কারণ, এই ধাপে সংস্কারগুলো খুবই সূক্ষ্ম হয়, যা সারিপুত্র ভন্তের মতো শ্রাবকও একটি একটি করে উপলব্ধি করতে পারে না, পারেন কেবল বুদ্ধ।

প্রশ্ন ৬.১১ : *কোনো একজন যদি মানসিকভাবে অসুস্থ হয়, আজগুবি কণ্ঠ শোনে, স্কিজোফ্রেনিয়ায় ভুগছে, কোনো মস্তিষ্কের রোগ আছে, স্ট্রোক করেছে, অথবা মস্তিষ্কের এবং স্নায়ু-বৈকল্য দেখা দিয়েছে, সে কি এ ধরনের ভাবনা করতে পারে? যদি পারে, তাহলে কী ধরনের সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত তার?*

উত্তর ৬.১১ : এমন লোকজন এ ধরনের ভাবনা করতে পারে, কিন্তু তারা সাধারণত সফল হয় না। কারণ, তারা যথেষ্ট দীর্ঘ সময় ধরে ভাবনা করতে পারে না। 'দীর্ঘ সময়' বলতে আমি বুঝাচ্ছি যে যখন সমাধি শক্তিশালী হয় তখন এটিকে অবশ্যই অনেক ঘণ্টা পর্যন্ত ধরে রাখতে হয়, এবং অনেকবার এমনভাবে ধ্যানে বসতে হয়। সাধারণত, এমন লোকজনের সমাধি অস্থির। এটি একটি সমস্যা। তারা হয়তো সফল হতে পারে যদি তারা তাদের সমাধিকে পর পর অনেকবার ভাবনায় বসে ধরে রাখতে সক্ষম হয়, অথবা অনেক দিন ধরে, অনেক মাস ধরে ধরে রাখতে সক্ষম হয়।

এর বিখ্যাত একটি উদাহরণ হচ্ছে পটাচারা। তার স্বামী, দুই সন্তান, বাবা-মা, ভাইয়েরা সবাই একই দিনে মারা যায়। সে শোকে পাগল হয়ে যায় এবং কাপড়চোপড় ছাড়াই ঘুরে বেড়াতে থাকে। একদিন সে শ্রাবস্তীতে জেতবন বিহারে আসে, যেখানে বুদ্ধ ধর্মদেশনা করছিলেন। তার অতীতের পারমীগুলো পরিপক্ব হয়েছিল। এ কারণে, এবং বুদ্ধের মৈত্রী ও করুণার কারণে, সে শ্রদ্ধার সাথে ধর্মদেশনা শুনতে সক্ষম হয়েছিল।

ধীরে ধীরে তার মন শান্ত হলো এবং সে ধর্মকে উপলব্ধি করল। শীঘ্রই সে স্রোতাপন্ন হলো। সে ভিক্ষুণী হিসেবে প্রব্রজ্যা নিল এবং তার ধ্যান চালিয়ে গেল। সে তার সমাধি এবং বিদর্শনকে ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছিল এবং একদিন তার সমাধি পরিপক্ব হয়ে উঠল। সে পঞ্চ অভিজ্ঞা এবং চারি প্রতিসম্ভিদাসহ অর্হত্ত্ব লাভ করল। বিনয়নীতি সম্বন্ধে যেসব ভিক্ষুণী দক্ষ ছিল, সে ছিল তাদের মধ্যে অগ্রগণ্য। সে বিনয়নীতিগুলোকে খুব কড়াকড়িভাবে পালন করত এবং এগুলোকে অর্থকথাসহ মুখস্থ করে নিত।

সে তার পারমী পূর্ণ করেছিল পদুমুত্তর বুদ্ধের শাসন থেকে শুরু করে কাশ্যপ বুদ্ধের শাসনকাল পর্যন্ত, বিশেষ করে কাশ্যপ বুদ্ধের শাসনকালে। সেই সময়ে সে ছিল কিকি রাজার কন্যা। সে কুমারি-ব্রহ্মচর্য পালন করেছিল কুড়ি হাজার বছর। কুমারি-ব্রহ্মচর্য হচ্ছে পঞ্চশীল পালন করা, তবে সাধারণ শীলের ক্ষেত্রে যেখানে কেবল অবৈধ যৌন সম্পর্ক থেকে বিরত থাকতে হয়, সেখানে এটি হচ্ছে যেকোনো ধরনের যৌন-কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকা।

সে গৃহী অবস্থায়ও ত্রিশিক্ষা, যথা : শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞার চর্চা করেছিল কুড়ি হাজার বছর ধরে। সেই পারমী এই গৌতম বুদ্ধের শাসনে এসে পরিপূর্ণতা লাভ করল। তাই, যদিও সে পাগল হয়ে গিয়েছিল, সে ত্রিশিক্ষা চর্চা করতে সমর্থ হয়েছিল এবং অর্হৎ হয়েছিল।

এমন লোকজন যখন ভাবনা করে, তখন তাদের প্রয়োজন কল্যাণমিত্র, যারা হচ্ছে তার ভালো গুরু, ভালো বন্ধু এবং আধ্যাত্মিক বন্ধু। যথাযথ ওষুধ এবং খাদ্যও সাহায্য করে। আমার অভিজ্ঞতা থেকে আমি জানি যে তাদের বেশির ভাগই দীর্ঘ সময় পর্যন্ত ভাবনা ধরে রাখতে পারে না। সাধারণত তারা সফল হয় না।

প্রশ্ন ৬.১২ : *কোনো ব্যক্তি, যার অন্যান্যদের সাথে পারস্পরিক সম্পর্ক ভালো নয়, কিন্তু সে চতুর্থ ধ্যান লাভ করতে পেরেছে, এতে কি তার লোকজনের সাথে যোগাযোগের দক্ষতা (Communication skill) বাড়বে? ধ্যান লাভ করলে কি এ ধরনের সমস্যার সমাধান করা যায়?*

উত্তর ৬.১২ : এই সমস্যাগুলো সাধারণত হয় দ্বেষ বা ঘৃণার কারণে। এটি নীবরণগুলোর মধ্যে একটি। যতক্ষণ না সে তার এই দৃষ্টিভঙ্গি সরিয়ে ফেলতে সক্ষম না হবে, ততক্ষণ সে ধ্যান লাভ করতে পারবে না। কিন্তু এমন দৃষ্টিভঙ্গি ত্যাগ করতে পারলে সে কেবল ধ্যান লাভ নয়, মার্গফল থেকে শুরু করে অর্হত্ত্ব পর্যন্ত পেতে পারে। এর বিখ্যাত একটি উদাহরণ হচ্ছে ছন্ন স্থবির। তার জন্ম হয়েছিল আমাদের বোধিসত্ত্বের সাথে একই দিনে, কপিলাবস্তুতে রাজা শুদ্ধোধনের প্রাসাদে। সে ছিল রাজা শুদ্ধোধনের এক চাকরানির ছেলে। পরে সে রাজকুমার সিদ্ধার্থের খেলার সাথী হয়ে উঠল। এটি পরে তার মনে বেশ আত্ম-অহংকার এনে দিল। সে পরে এমন চিন্তা করল : 'এ আমার রাজা; বুদ্ধ ছিলেন আমার খেলার সাথী; ধর্ম হচ্ছে আমাদেরই ধর্ম; যখন তিনি গৃহত্যাগ করেছিলেন, আমিই তাকে অনোমা নদীর তীর পর্যন্ত অনুসরণ করেছিলাম; অন্য কেউ তো করেনি। সারিপুত্র ও মহামোগ্গল্লান তারা তো পরে ফোটা ফুলের মতো, ইত্যাদি।' এ কারণে সে সব সময় রূঢ় ভাষায় কথা বলত। সে সারিপুত্র, মহামোগ্গল্লান প্রভৃতি মহাথেরোকে সম্মান দেখাত না। তাই তার সাথে কারোরই ভালো সম্পর্ক ছিল না। সে বুদ্ধের জীবদ্দশায় কোনো ধ্যান, অথবা মার্গফল লাভ করতে পারে নি। কারণ, সে তার অহংকার ও বিদ্বেষ পরিত্যাগ করতে পারে নি।

পরিনির্বাণের রাতে, বুদ্ধ আনন্দ ভন্তেকে বললেন যাতে ছন্নকে ব্রহ্মদণ্ড দেওয়া হয়। এর মানে হচ্ছে ছন্ন ভন্তের সাথে কেউ কথা বলবে না, এমনকি

সে যদি কথা বলতে চায়, তবুও নয়। যখন কেউ ছন্ন ভন্তের সাথে কথা বলল না, তার অহংকার ও বিদ্বেষ উধাও হয়ে গেল। এই সংঘকর্ম অনুষ্ঠিত হয়েছিল কৌসাম্বিতে ঘোষিতারাম বিহারে, বুদ্ধের পরিনির্বাণের পাঁচ মাস পরে।

ছন্ন ভন্তে ঘোষিতারাম ছেড়ে বেনারসের কাছে মৃগ উদ্যানের ঋষিপতন বিহারে চলে গেলেন। তিনি কঠোর ভাবনায় আত্মনিয়োগ করলেন, কিন্তু প্রবল চেষ্টা সত্ত্বেও সফল হলেন না। তাই একদিন তিনি আনন্দ ভন্তের কাছে গেলেন এবং তাকে সাহায্য করতে বললেন। কেন তিনি সফল হচ্ছেন না? তিনি পঞ্চস্কন্ধের অনিত্য, দুঃখ, অনাত্ম স্বভাবকে দেখেছিলেন, কিন্তু প্রতীত্যসমুৎপাদ-নীতিকে উপলব্ধি করেন নি। তাই আনন্দ ভন্তে তাকে দেখিয়ে দিলেন কীভাবে প্রতীত্যসমুৎপাদ-নীতিকে দেখতে হয়, এবং তাকে কচ্চানগোত্ত সুত্র দেশনা করলেন। আনন্দ ভন্তের ধর্মদেশনা শোনার পরে তিনি স্রোতাপন্ন হলেন। তিনি তার ধ্যান-সাধনা চালিয়ে গেলেন এবং অচিরেই অর্হৎ হলেন। কাজেই, কেউ যদি তার খারাপ স্বভাবকে পাল্টাতে পারে, এবং সঠিকভাবে শমথ-বিদর্শন চর্চা করতে পারে, তাহলে সে ধ্যান, মার্গ এবং ফল লাভ করতে পারবে। ❑

[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[দেশনা ৭]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]

বিদর্শন জ্ঞান ও নির্বাণ

গত দেশনায় আমি সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করেছিলাম কীভাবে পঞ্চম এবং প্রথম পদ্ধতির মাধ্যমে প্রতীত্যসমুৎপাদ-নীতিকে উপলব্ধি করা যায়। আজ আমি সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করব নির্বাণকে দেখতে হলে কীভাবে বিদর্শন জ্ঞানগুলো গড়ে তুলতে হয়।

নির্বাণকে দেখতে হলে ষোলটি বিদর্শন জ্ঞানকে ক্রমান্বয়ে গড়ে তুলতে হয়।

প্রথম জ্ঞানটা হচ্ছে নামরূপ পরিচ্ছেদ জ্ঞান (নামরূপের বিশ্লেষণাত্মক জ্ঞান)। আমি আগের দেশনাগুলোতে নামরূপকে কীভাবে দেখতে হয়, তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এই জ্ঞানকে ব্যাখ্যা করেছি।

দ্বিতীয় জ্ঞানটা হচ্ছে প্রত্যয়-পরিগ্রহ জ্ঞান (কার্যকারণকে দেখার জ্ঞান)। আমি গত দেশনায় নামরূপ এবং তাদের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কারণগুলোকে কীভাবে দেখতে হয় এবং কীভাবে প্রতীত্যসমুৎপাদ-নীতিকে উপলব্ধি করতে হয়, তা ব্যাখ্যা করার সময় এই জ্ঞানকে ব্যাখ্যা করেছি।

এই দুটো জ্ঞান গড়ে তোলার পরে আপনাকে আবার এগুলো সম্পূর্ণ করতে হবে, সকল নাম, রূপ, প্রতীত্যসমুৎপাদ-নীতির সকল উপাদানকে, তাদের স্বভাব, কাজ, প্রকাশ এবং কাছাকাছি কারণগুলোকে আবার দেখতে হবে। সংক্ষিপ্ত আকারে আসলে এভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়, তাই যদি বিস্তারিত জানতে চান, সবচেয়ে ভালো হয় বাস্তবে ভাবনা করার সময় শিখলে।

এখন আমি সংক্ষেপে বাদবাকি জ্ঞানগুলো সম্পর্কে আলোচনা করব।

সংমর্শন জ্ঞান (বুঝার বা উপলব্ধির জ্ঞান)

তৃতীয় বিদর্শন জ্ঞান হচ্ছে সংমর্শন জ্ঞান যা সংস্কারগুলোকে ভাগ ভাগ করে উপলব্ধি করে। এই জ্ঞান অর্জনের জন্য সংস্কারগুলোকে ভাগ ভাগ করুন : দু-ভাগে, যেমন—নাম ও রূপ হিসেবে; পাঁচ ভাগে, যেমন—পঞ্চস্কন্ধ হিসেবে;

বারটি ভাগে, যেমন—বারোটি আয়তন হিসেবে, অথবা প্রতীত্যসমুৎপাদ-নীতির বারোটি অঙ্গ হিসেবে; এবং আঠারটি ভাগে, যেমন—আঠারটি ধাতু হিসেবে। আপনি এই ভাগগুলোকে দেখুন এবং প্রত্যেকটি ভাগের মধ্যে অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম এই তিনটি স্বভাবকে উপলব্ধি করুন।

উদাহরণস্বরূপ, অনাত্মলক্ষণ সূত্রে বুদ্ধ পঞ্চস্কন্ধকে সম্যক দৃষ্টি নিয়ে দেখার শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি সকল রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞানকে 'আমি নয়', 'আমার নয়', এবং 'আত্ম বা নিজ নয়' হিসেবে দেখতে বলেছেন। তিনি ব্যাখ্যা করেছেন, 'সকল' বলতে এখানে 'অতীত, ভবিষ্যৎ এবং বর্তমান; অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক; স্থূল ও সূক্ষ্ম; হীন ও উত্তম; দূরে ও কাছের সবকিছুকে।'

আপনার শুরু করা উচিত চতুর্থ ধ্যানের মাধ্যমে। যদি আপনি শুদ্ধ বিদর্শনযানী হন, কেবল চার ধাতু ভাবনা করে থাকেন, তাহলে আবার সেই চার ধাতু ধ্যানে মনোযোগ দেওয়া উচিত যতক্ষণ না আলো উজ্জ্বল ও শক্তিশালী হয়। এরপর ষড়ায়তনের প্রত্যেকটি আয়তনের আসল রূপকে দেখুন। ('আসল' বলা হয়েছে, কারণ নকল রূপগুলো বিদর্শন ভাবনার বিষয়বস্তু নয়।)

আপনি সেই রূপকে একটি গ্রুপ হিসেবে দেখুন (সেয়াদ সাধারণত ভাবনাকারীদের দেখতে বলেন, নামরূপের দুটি ভাগ, পঞ্চস্কন্ধের পাঁচটি ভাগ, প্রতীত্যসমুৎপাদ-নীতির বারোটি ভাগ, এভাবে বার বার, অনেক অনেক বার দেখতে বলেন), এটির উদয়-বিলয়কে দেখুন এবং এটিকে অনিত্য হিসেবে জানুন। আপনার এভাবে অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিকভাবে দেখা প্রয়োজন, পালাক্রমে এবং বারে বারে দেখা প্রয়োজন। বাহ্যিকভাবে দেখার সময় আপনার দেখার পরিধিকে ক্রমান্বয়ে বাড়ানো উচিত কাছ থেকে দূরে, আরও দূরে, অসীম মহাবিশ্ব পর্যন্ত।

এরপরে একই পদ্ধতিতে দেখুন সেই রূপের উদয়-বিলয়ের কারণে কোনো ব্যক্তিকে সব সময় ব্যথা ও দুঃখকষ্ট ভোগ করতে হচ্ছে। এটিকে দুঃখ হিসেবে জানুন।

অবশেষে রূপকে কোনো স্থায়ী আত্মশূন্য হিসেবে দেখুন এবং এটিকে অনাত্ম হিসেবে জানুন।

নামের ক্ষেত্রেও আপনার এই তিনটি স্বভাবকে দেখতে হবে। প্রথমে ছয়দ্বারের প্রত্যেকটি দ্বারের সকল নামকে দেখুন। এতে আছে প্রত্যেক চিত্তক্ষণে প্রত্যেক দ্বারিক-চিত্তবীথির চিত্ত এবং চৈতসিকগুলো ও তাদের

মধ্যকার ভবাঙ্গ চিত্তগুলো। পদ্ধতিটাও রূপের মতোই।

নামকে একটি ভাগ হিসেবে নিন, তার উদয়-বিলয়কে দেখুন এবং এটিকে অনিত্য হিসেবে জানুন। অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিকভাবে নামকে দেখুন, পালাক্রমে দেখুন, বার বার দেখুন। এবং বাহ্যিকভাবে দেখার সময় আপনার দেখার পরিধিকে ক্রমান্বয়ে বাড়িয়ে নিন কাছে থেকে দূরে, অসীম মহাবিশ্ব পর্যন্ত। এরপরে নামকে দুঃখ ও অনাত্ম হিসেবে দেখুন।

ছয় আয়তনের নামরূপকে দেখে নিয়ে এখন আপনার সারা জীবনের নামরূপের তিনটি স্বভাবকে উপলব্ধি করতে হবে, প্রতিসন্ধিচিত্ত থেকে শুরু করে একেবারে চ্যুতিচিত্ত পর্যন্ত। এখানেও সেই একইভাবে তিনটি স্বভাবকে দেখুন, প্রত্যেকবার একটি একটি করে, বার বার এবং অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিকভাবে।

এই জন্ম নিয়ে এভাবে দেখার পরে, এরপর অতীত ও ভবিষ্যৎ জন্মগুলোকেও একইভাবে দেখতে হবে। এখানেও সেই তিনটি স্বভাবকে একটি একটি করে দেখুন, বার বার দেখুন, বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণভাবে দেখুন, অতীত, (বর্তমান) ও ভবিষ্যতের সকল নামরূপে।

এভাবে করার সময় আপনি হয়তো দেখতে পাবেন যে উচ্চতর বিদর্শন জ্ঞানগুলো দ্রুত আয়ত্ব হচ্ছে, ধাপে ধাপে, একেবারে অর্হত্ত্ব লাভ করা পর্যন্ত। যদি তা না হয়, তাহলে আপনার বিদর্শনকে বাড়ানোর জন্য কয়েকটা অনুশীলন রয়েছে।

চল্লিশ প্রকার অনুদর্শন (চত্তারীসাকার-অনুপস্সনা) প্রথম অনুশীলন হচ্ছে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের নামরূপের অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্মকে দেখা, অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিকভাবে, চল্লিশ প্রকার অনুদর্শন অনুসারে। পালিতে এদের সবার শেষে 'তো' বিভক্তি যুক্ত হয়েছে, তাই আমরা সেগুলোকে বলি চল্লিশটি 'তো'।

অনিত্যতার দশ প্রকার অনুদর্শন :

১. অনিত্য	অনিচ্চতো
২. ক্ষণিকের	পলোকতো
৩. চঞ্চল	চলতো
৪. ধ্বংসশীল	পভঙ্গুতো
৫. টেকসই নয়	অধুবতো
৬. পরিবর্তনশীল	বিপরিণামধম্মতো
৭. অসার	অসারকতো

৮. নিশ্চিহ্ন হওয়ার বিষয়	বিভবতো
৯. মরণের বিষয়	মরণধম্মতো
১০. সংস্কার থেকে উৎপন্ন	সঙ্খততো

দুঃখের পঁচিশ প্রকার অনুদর্শন :

১. দুঃখ	দুঃখতো
২. রোগ	রোগতো
৩. দুর্যোগ	অঘতো
৪. ফোড়া	গণ্ডতো
৫. শেল	সল্লতো
৬. যন্ত্রণা	আবাধতো
৭. উপদ্রব	উপদ্দবতো
৮. ভয়	ভয়তো
৯. মহামারী	ঈতিতো
১০. উপসর্গ	উপসগ্গতো
১১. ত্রাণহীন	অতাণতো
১২. আশ্রয়হীন	অলেণতো
১৩. শরণহীন	অসরণতো
১৪. বধকারী	বধকতো
১৫. দুর্যোগের মূল	অঘমূলতো
১৬. বিপদ	আদীনবতো
১৭. কলুষতার অধীন	সাসবতো
১৮. মারের টোপ	মারামিসতো
১৯. জন্মের অধীন	জাতিধম্মতো
২০. জরার অধীন	জরাধম্মতো
২১. ব্যাধির অধীন	ব্যাধিধম্মতো
২২. শোকের অধীন	সোকধম্মতো
২৩. বিলাপের অধীন	পরিদেবধম্মতো
২৪. হতাশার অধীন	উপায়াসধম্মতো
২৫. ক্লেশের অধীন	সংকিলেসিকধম্মতো

অনাত্মের পাঁচটি অনুদর্শন :

১. অনাত্ম	অনত্ততো
২. শূন্য	সুঞ্ঞতো

৩. পরের পরতো
৪. রিক্ত রিত্ততো
৫. তুচ্ছ তুচ্ছতো

এভাবে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক নামরূপকে চল্লিশ প্রকারে অনুদর্শন করার সময় কারো কারো বিদর্শন অর্হত্ত্বে উপনীত হয়।

যদি না হয়, তাহলে আরও আছে রূপ এবং অরূপের সাতটি করে অনুশীলন পদ্ধতি।

সপ্ত রূপ-পদ্ধতি

রূপকে দেখার জন্য সাতটি পদ্ধতি হচ্ছে :

১. এই জন্মের প্রতিসন্ধিচিত্ত থেকে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত সম্পূর্ণ জীবনে রূপের ত্রিলক্ষণকে অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিকভাবে দেখা।

২. এই জীবনের বিভিন্ন সময়ের রূপের ত্রিলক্ষণকে দেখা, অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিকভাবে। এই জীবনকে একশ বছর ধরে নিয়ে এটিকে তেত্রিশ বছরের তিনটি ভাগে ভাগ করুন। এবার প্রত্যেকটি ভাগে তিনটি স্বভাবকে দেখুন। সেটা এভাবে দেখুন যে একটি ভাগের রূপ উৎপন্ন হয় এবং বিলীন হয়ে যায়, এটি আর পরবর্তী ভাগে যায় না।

এরপর আপনি এই জীবনকালকে ক্রমান্বয়ে আরও ছোট ছোট ভাগে ভাগ করুন এবং একই প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি করুন। একশ বছরের জীবনকালকে ভাগ করুন, দশ বছর করে দশ ভাগে, পাঁচ বছর করে বিশ ভাগে, চার বছর করে পঁচিশ ভাগে, তিন বছর করে তেত্রিশ ভাগে, দুই বছর করে পঞ্চাশ ভাগে, এবং এক বছর করে একশ ভাগে, চার মাস করে তিনশ ভাগে, দুই মাস করে ছয়শ ভাগে, পনের দিন করে দুই হাজার চারশ ভাগে; প্রত্যেকটি দিন দুটো ভাগে, এরপর ছয় ভাগে। প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে দেখুন যে এক ভাগের রূপ উৎপন্ন হয় এবং সেখানেই বিলীন হয়ে যায়, সেটি পরবর্তী ভাগের রূপে স্থানান্তরিত হয় না, এবং তাই অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম।

আপনি সেই ভাগগুলোকে এবার ভাগ করে নিন দেহের নড়াচড়ার সময় অনুযায়ী : চংক্রমণকালে সামনে যেতে ও পিছনে আসতে, সামনে ও দূরে তাকাতে, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সংকোচন প্রসারণে। আপনি প্রত্যেকটি পদক্ষেপকে ছয় ভাগে ভাগ করুন : পা তোলা, উঁচু করা, সামনে নেওয়া, নিচু করা, পা রাখা এবং ভার রাখা। এই একশ বছরের জীবনের প্রত্যেক দিনের প্রত্যেক

ভাগের ত্রিলক্ষণকে এভাবে আবার দেখুন।

৩. আহার দ্বারা উৎপন্ন রূপের ত্রিলক্ষণকে দেখা। তার মানে হচ্ছে ক্ষুধার সময়, এবং আপনি যখন খেয়েদেয়ে সন্তুষ্ট হন, সেই সময়গুলোতে শত বছরের জীবনের প্রত্যেক দিনকে দেখা।

৪. ঋতু বা তাপমাত্রা দ্বারা উৎপন্ন রূপের ত্রিলক্ষণকে দেখা। অর্থাৎ গরমের সময় এবং শীতের সময়, শত বছরের জীবনের প্রত্যেকটি দিনকে দেখা।

৫. কর্ম দ্বারা উৎপন্ন রূপের ত্রিলক্ষণকে দেখা। অর্থাৎ শত বছর জীবনের প্রত্যেক দিনের ছয়টি ইন্দ্রিয়দ্বারে উৎপন্ন কর্মগুলোকে দেখা। প্রত্যেক দ্বারে রূপ উৎপন্ন হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে, সেগুলো অন্য দ্বারে চলে যাচ্ছে না, এভাবে ত্রিলক্ষণকে জানা।

৬. চিত্ত দ্বারা উৎপন্ন রূপের ত্রিলক্ষণকে দেখা। অর্থাৎ যে সময়ে আপনি সুখী ও আনন্দিত, যে সময়ে অসুখী ও বিষণ্ণ, এভাবে প্রত্যেক দিন, শত বছর ধরে।

৭. বর্তমান নির্জীব রূপের ত্রিবিধ লক্ষণকে দেখা। অর্থাৎ যেসব রূপ ছয়টি অভ্যন্তরীণ ইন্দ্রিয় দ্বারের বহির্ভূত, সেগুলোকে দেখা, যেমন- প্লাস্টিক, স্টিল, লোহা, তামা, সোনা, রূপা, মুক্তা, রত্ন, খোলস, মার্বেল, প্রবাল, চুনি, মাটি, পাথর, ও উদ্ভিদ। এ ধরনের রূপকে কেবল বাহ্যিকভাবে পাওয়া যায়।

এগুলোই সপ্ত রূপ-পদ্ধতি।

সপ্ত অরূপ-পদ্ধতি (অরূপ-সত্তক)

এই সপ্ত অরূপ-পদ্ধতিতে আপনি দেখবেন আপনার বিদর্শন-মনের ত্রিলক্ষণকে, যে বিদর্শন মন উপর্যুক্ত সপ্ত রূপ-পদ্ধতিতে ত্রিলক্ষণকে দেখেছে। তার মানে হচ্ছে এখানে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে আপনার বিষয়বস্তু হবে এক একটি বিদর্শন-মন। আপনি এটি দেখবেন পরবর্তী বিদর্শন-মন দিয়ে। এই সপ্ত অরূপ-পদ্ধতি হচ্ছে :

১. সেই সপ্ত রূপ-পদ্ধতির রূপের ত্রিলক্ষণকে দেখুন, তবে এখানে রূপকে দেখতে হবে গ্রুপ হিসেবে। এবার এই রূপকে যে নামটি দেখেছে, সেই নামের ত্রিলক্ষণকে দেখুন। অর্থাৎ, আপনি সেই রূপের গ্রুপকে অনিত্য হিসেবে দেখেছেন, এরপর আপনি সেই বিদর্শন-মনের ত্রিলক্ষণকে দেখুন এর পরবর্তী বিদর্শন-মন দিয়ে। এভাবে সেই রূপের গ্রুপকে দুঃখ এবং অনাত্মরূপে দেখার ক্ষেত্রেও একইভাবে দেখুন।

২. সপ্ত রূপ-পদ্ধতির প্রত্যেকটি পদ্ধতিতে দেখা রূপের জন্য উৎপন্ন নামের ত্রিলক্ষণকে দেখা। অর্থাৎ আপনি সপ্ত-রূপ পদ্ধতির প্রত্যেকটি পদ্ধতিতে রূপকে অনিত্য হিসেবে দেখবেন এবং এরপর সেই বিদর্শন-মনের ত্রিলক্ষণকে পরবর্তী বিদর্শন-মন দিয়ে দেখবেন। এভাবেই আপনি দুঃখ এবং অনাত্ম হিসেবে দেখা রূপের ক্ষেত্রেও একইভাবে দেখুন। শত বছরের জীবনের প্রত্যেক দিনের প্রত্যেক ভাগের প্রত্যেকটি বিদর্শন-মনকে একইভাবে দেখুন।

৩. আবার সপ্ত রূপ-পদ্ধতির প্রত্যেকটি পদ্ধতিতে নামের ত্রিলক্ষণকে দেখুন, কিন্তু এবার সেটা করুন পর পর চারবার। অর্থাৎ সপ্ত রূপ-পদ্ধতির প্রত্যেক পদ্ধতিতে রূপকে অনিত্য হিসেবে দেখুন, এরপর প্রথম বিদর্শন-মনের ত্রিলক্ষণকে দেখুন এর পরবর্তী দ্বিতীয় বিদর্শন-মন দিয়ে, সেটাকে দেখুন তৃতীয় বিদর্শন-মন দিয়ে এভাবে ক্রমান্বয়ে দেখতে থাকুন যতক্ষণ না পঞ্চম বিদর্শন মন দিয়ে চতুর্থ বিদর্শন-মনের ত্রিলক্ষণকে দেখতে পান।

৪. আগের মতোই করে যান, তবে এখানে দেখতে হবে যতক্ষণ না এগারতম বিদর্শন-মন দিয়ে দশম বিদর্শন-মনের ত্রিলক্ষণকে দেখতে পান।

৫. মিথ্যাদৃষ্টি পরিত্যাগের জন্য নামের ত্রিলক্ষণকে দেখা। অর্থাৎ এখানেও আবার বিদর্শন-মনগুলোকে দেখুন যেগুলো সপ্ত রূপ-পদ্ধতিতে রূপকে দেখেছে, কিন্তু এখানে অনাত্মসংজ্ঞার উপর জোর দিন, যাতে করে মিথ্যাদৃষ্টি দূরীভূত করতে পারেন, বিশেষ করে আত্মবাদকে।

৬. অহংকারকে দূরীভূত করার জন্য নামের ত্রিলক্ষণকে দেখা। এখানেও আবার আগের মতোই বিদর্শন-মনগুলোকে দেখুন যেগুলো সপ্ত রূপ-পদ্ধতিতে রূপকে দেখেছে, কিন্তু এখানে জোর দিন অনিত্যসংজ্ঞার উপর, যাতে করে অহংকার বা গর্বকে দূরীভূত করতে পারেন।

৭. আসক্তিকে (উপাদান) দূরীভূত করার জন্য নামের ত্রিলক্ষণকে দেখা। আপনি আবার সেই বিদর্শন-মনগুলোকে দেখুন যেগুলো সপ্ত রূপ-পদ্ধতিতে রূপকে দেখেছে, কিন্তু এখানে জোর দিন দুঃখসংজ্ঞার উপর, যাতে করে আসক্তি দূরীভূত হয়।

এই অনুশীলনগুলো বর্তমানের নামরূপ দিয়ে করা ভালো [অতীত ও ভবিষ্যতের নয়], এবং অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিকভাবে। অনুশীলনগুলো শেষ হলে নামরূপ আপনার কাছে খুব পরিষ্কার হয়ে যাবে।

আমি এখন ব্যাখ্যা করলাম কীভাবে সংস্কারগুলোকে ভাগ ভাগ করে দর্শন করতে হয়। এখন আমি ব্যাখ্যা করব কীভাবে সংস্কারগুলোর উদয়-ব্যয়জ্ঞানকে অর্জন করা যায়।

উদয়-ব্যয় জ্ঞান

সংস্কারগুলোর উদয়-ব্যয় জ্ঞান দুভাগে বিভক্ত : সংস্কারগুলোর কার্যকারণসম্ভূত উদয়-ব্যয় এবং ক্ষণিক উদয়-ব্যয়। অর্থাৎ নামরূপের, পঞ্চস্কন্ধের, বারোটি আয়তনের, আঠারটি ধাতুর, চার আর্যসত্যের, প্রতীত্যসমুৎপাদ-নীতির, অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক, বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যতের।

কার্যকারণ স্বভাবকে দেখা মানে হচ্ছে প্রতীত্যসমুৎপাদ-নীতির যেকোনো একটি পদ্ধতি, যেমন, পঞ্চম পদ্ধতি অনুসারে দেখা, যা আমি আগের একটি দেশনায় বলেছি। এটি হচ্ছে পাঁচটি কারণকে দেখা, যেগুলো আপনার অতীত জীবনে ঘটে গেছে, উদাহরণস্বরূপ অজ্ঞানতা, যা বর্তমান জন্মের পঞ্চস্কন্ধকে উৎপন্ন করেছে। এতে আরও দেখতে হয় ভবিষ্যতে সেই কারণগুলোর নিরোধকে, যখন আপনি অর্হত্ত্ব লাভ করবেন তখন, এবং এতে আরও দেখতে হয় আপনার পরিনির্বাণের সময় পঞ্চস্কন্ধের সম্পূর্ণ নিরোধকে।

সংস্কারগুলোর ক্ষণস্থায়ী স্বভাব দেখা মানে হচ্ছে প্রতি চিত্তক্ষণে [প্রতিসন্ধিচিত্ত থেকে চ্যুতিচিত্ত পর্যন্ত সময়ের মধ্যে] পঞ্চস্কন্ধ কীভাবে উৎপন্ন ও বিলীন হয়ে যায় তা দেখা। এটি হচ্ছে প্রতিসন্ধিচিত্তের উৎপত্তি ও বিলয়ের সময়ে যে পঞ্চস্কন্ধ ছিল তা দেখা, ভবাঙ্গচিত্ত ও চ্যুতিচিত্তের উৎপত্তি ও বিলয়ের সময়ে যে পঞ্চস্কন্ধ ছিল তা দেখা, যে চিত্তগুলো হচ্ছে বীথিমুক্ত চিত্ত। ছয়টি দ্বারের চিত্তবীথির যেকোনো একটি বীথির প্রত্যেকটি চিত্তক্ষণে উৎপন্ন পঞ্চস্কন্ধও ক্ষণস্থায়ী। এই উদয়-ব্যয়জ্ঞান লাভের দুটো উপায় আছে, সংক্ষিপ্ত ও বিস্তারিত উপায়।

সংক্ষিপ্ত উপায়

সংক্ষিপ্ত উপায়ে, আপনার দেখা উচিত কেবল সংস্কারগুলোর ক্ষণস্থায়ী স্বভাবকে। অর্থাৎ নামরূপ, পঞ্চস্কন্ধ, দ্বাদশ আয়তন, আঠারটি ধাতু, চারটি আর্যসত্য, প্রতীত্যসমুৎপাদ-নীতি, অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক, বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ। আপনি তাদের ক্ষণিকের উৎপত্তি ও বিলীন হওয়াকে দেখুন এবং এরপর তাদের মধ্যেকার ত্রিলক্ষণকে দেখুন।

বিস্তারিত উপায়

বিস্তারিত উপায়ে তিনটি ধাপে এই জ্ঞান গড়ে তুলতে হয়। প্রথমে আপনি কেবল সংস্কারগুলোর উৎপত্তিকে দর্শন করুন, কার্যকারণরূপে এবং

ক্ষণস্থায়ীরূপে। এরপর কেবল বিলীন হওয়াকে দর্শন করুন, এরপর তাদের উৎপত্তি ও বিলয় উভয়কে দর্শন করুন।

উৎপত্তি স্বভাবকে দেখা (সমুদয়ধম্মানুপস্সি)

বিস্তারিত উপায়ে শুরু করতে হলে আপনার বার বার কেবল সংস্কারগুলোর ক্ষণিক উৎপত্তি এবং তাদের উৎপত্তির কারণকে দর্শন করা উচিত।

উদাহরণস্বরূপ, রূপের ক্ষেত্রে, আপনি রূপের উৎপত্তির কার্যকারণকে প্রতীত্যসমুৎপাদ-নীতির পঞ্চম পদ্ধতি অনুসারে দেখুন, আগের দেশনায় আমি যেভাবে বলেছি সেভাবে। এর মানে হচ্ছে আপনি আবার আপনার অতীত জন্মের মরণাসন্ন সময়টাতে দেখুন, অতীতের পাঁচটি কারণ দেখার জন্য, যা এই জন্মের কর্মজাত রূপের উৎপত্তির কারণ হয়েছে। একটি একটি করে দেখুন অজ্ঞানতার উৎপত্তি, তৃষ্ণার উৎপত্তি, আসক্তির উৎপত্তি, সংস্কারগুলোর উৎপত্তি এবং কর্মের উৎপত্তি, যাদের প্রত্যেকেই কর্মজাত রূপের উৎপত্তির কারণ হয়।

এরপর আপনি কেবল কর্মজাত রূপের ক্ষণিক উৎপত্তিকে দেখুন।

এরপর আপনার দেখতে হবে চিত্তজ, ঋতুজ, আহারজ রূপের উৎপত্তিকে, কার্যকারণসম্ভূত এবং ক্ষণিক উভয় পদ্ধতিতে, একটার পর একটা দেখতে হবে। আপনি দেখুন যে, মন চিত্তজ রূপের উৎপত্তির কারণ হয়, ঋতু (তাপমাত্রা) ঋতুজ রূপের উৎপত্তির কারণ হয়, আহার আহারজ রূপের উৎপত্তির কারণ হয়। প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে আপনি সেই নির্দিষ্ট প্রকার রূপের ক্ষণিক উৎপত্তিকেও দেখুন।

এরপর একইভাবে নামের কার্যকারণজাত এবং ক্ষণিক উৎপত্তিকেও দেখতে হবে। বিস্তারিত বলতে গেলে অনেক সময় লেগে যাবে, তাই আমি সেগুলো বাদ দেব, এবং প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে কেবল রূপের ক্ষেত্রে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করব।

বিলয় স্বভাবকে দেখা (বয়ধম্মানুপস্সি)

নামরূপের কার্যকারণজাত এবং ক্ষণিক উৎপত্তিকে দেখে এবার আপনি বার বার দেখুন কেবল তাদের বিলয়কে।

রূপের ক্ষেত্রে আপনি আবার সেই প্রতীত্যসমুৎপাদ-নীতির পঞ্চম পদ্ধতি অনুসারে রূপের কার্যকারণজাত নিরোধকে দেখুন। এর মানে হচ্ছে আপনি

ভবিষ্যৎ জন্মকে দেখুন যখন আপনি অর্হৎ হবেন। যখন অর্হত্ত্বমার্গফল লাভ করবেন, তখন দেখুন সব ক্লেশ থেমে গেছে [কোনো ক্লেশ আর উৎপন্ন ও বিলীন হচ্ছে না], এবং দেখুন সেই জীবনের শেষে সকল সংস্কার থেমে গেছে [কোনো সংস্কারও উৎপন্ন হচ্ছে না এবং বিলীন হচ্ছে না] : এটি হচ্ছে সরাসরি আপনার পরিনির্বাণকে দেখা, যার পরে কোনো নতুন নামরূপ উৎপন্ন হবে না। একটির পর একটি করে আপনি দেখুন অজ্ঞানতার নিরোধ, তৃষ্ণার নিরোধ, আসক্তির নিরোধ, সংস্কারগুলোর নিরোধ এবং কর্মের নিরোধ, এগুলোর প্রত্যেকটিই কর্মজ রূপের উৎপত্তির নিরোধের কারণ হয়।

এভাবে কর্মজ রূপের কার্যকারণজাত নিরোধকে দেখে আপনি এবার কেবল ক্ষণিক বিলয়কে দেখুন।

আপনার একটার পর একটা করে চিত্তজ, ঋতুজ এবং আহারজ রূপের কার্যকারণজাত এবং ক্ষণিক উভয় ধরনের বিলয়কে দেখা দরকার। আপনি দেখুন যে, চিত্তের নিরোধ চিত্তজ রূপের নিরোধের কারণ হয়, ঋতুর নিরোধ ঋতুজ রূপের নিরোধের কারণ হয়, আহারের নিরোধ আহারজ রূপের নিরোধের কারণ হয় [এটি পরিনির্বাণের পরে হয়]। প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে কোনো নির্দিষ্ট ধরনের রূপের জন্য ক্ষণিক নিরোধকেও দেখুন [এটি হয় পরিনির্বাণের আগে]।

এরপর আপনার নামের কার্যকারণজাত এবং ক্ষণিক নিরোধকে দেখা দরকার।

উৎপত্তি-বিলয় স্বভাবকে দেখা (সমুদয়বয়ধম্মানুপস্সি)

যখন আপনি নাম ও রূপের কার্যকারণজাত এবং ক্ষণিক নিরোধকে দেখে ফেলবেন, এবার আপনি তাদের উৎপত্তি ও বিলয়কে বার বার দেখুন। এতে প্রথমে কার্যকারণজাত উৎপত্তি ও বিলয়কে দেখুন এবং এরপরে দেখুন তাদের ক্ষণিক উৎপত্তি ও বিলয়কে। প্রত্যেকটিকে ক্রমান্বয়ে তিনভাবে দেখুন : কারণের উৎপত্তি ও তার ফল, তাদের নিরোধ, এবং তাদের উভয়ের অনিত্য স্বভাবকে।

রূপের ক্ষেত্রে আপনি দেখুন একটির পর একটি করে : প্রত্যেকটি কারণের উৎপত্তি, যথা : অবিদ্যার উৎপত্তি, তৃষ্ণার উৎপত্তি, আসক্তির উৎপত্তি, সংস্কারের উৎপত্তি এবং কর্মের উৎপত্তি কর্মজ রূপের উৎপত্তির কারণ হয়; সেই একই কারণগুলোর নিরোধ রূপের উৎপত্তিকেও নিরোধ করে [সেয়াদ

বলেন যে, এটি 'উৎপন্ন' রূপের নিরোধ নয়, কারণ পরিনির্বাণের পরে সেখানে কোনো কর্মজ রূপ থাকে না]; এবং প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে সেই সাথে উৎপন্ন রূপ যে অনিত্য, সেটাও দেখুন।

একইভাবে কারণগুলো (চিত্ত, ঋতু, এবং আহার, যেগুলোর প্রত্যেকটিই রূপের উৎপত্তির কারণ হয়), এবং তাদের কারণে উৎপন্ন রূপ, উভয়ই অনিত্য।

এভাবে আপনি রূপের কার্যকারণজাত এবং ক্ষণিক উৎপত্তি ও বিলয়কে দেখুন। এরপরে নামের কার্যকারণজাত এবং ক্ষণিক উৎপত্তি ও বিলয়কেও আপনার দেখা প্রয়োজন।

কাজেই, আমি যেভাবে বলে দিলাম, সেভাবে পঞ্চস্কন্ধের কার্যকারণজাত ও ক্ষণিক উৎপত্তি ও বিলয়কে দর্শন করুন, এবং তাদের মধ্যেকার অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম এই ত্রিলক্ষণকে দেখুন। অভ্যন্তরীণ পঞ্চস্কন্ধ, বাহ্যিক পঞ্চস্কন্ধ এবং অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের পঞ্চস্কন্ধকেও আপনার এভাবে দেখা উচিত।

পঞ্চস্কন্ধকে এভাবে দেখে নিয়ে এই বিদর্শনকে প্রতীত্যসমুৎপাদ-নীতির প্রথম পদ্ধতিতেও ভাবনা করা উচিত। সেক্ষেত্রে যখন আপনি সংস্কারগুলোর কার্যকারণজাত উৎপত্তিকে দেখবেন, প্রতীত্যসমুৎপাদ-নীতির প্রত্যেকটি অঙ্গকে দেখুন একাদিক্রমে, এভাবে :

'অজ্ঞানতা সংস্কারের কারণ হয়, সংস্কার বিজ্ঞানের কারণ হয়, বিজ্ঞান নামরূপের কারণ হয়, নামরূপ ছয়টি আয়তনের কারণ হয়, ছয় আয়তন স্পর্শের কারণ হয়, স্পর্শ বেদনার কারণ হয়, বেদনা তৃষ্ণার কারণ হয়, তৃষ্ণা আসক্তির কারণ হয়, আসক্তি ভবের কারণ হয়, ভব জন্মের কারণ হয়, জন্ম জরা, মৃত্যু, শোক, বিলাপ, দৈহিক ব্যথা, মানসিক ব্যথা, এবং হতাশার কারণ হয়।'

(মধ্যমনিকায়, ৩৮)

অর্হত্ত্ব লাভের ফলে সংস্কারগুলোর কার্যকারণজাত নিরোধ এবং পরিনির্বাণকে দেখতে হলে প্রতীত্যসমুৎপাদ-নীতির প্রত্যেকটি অঙ্গকে একাদিক্রমে দেখতে হবে এভাবে :

'অজ্ঞানতার নিঃশেষ নিরোধের ফলে সংস্কারগুলোর নিরোধ হয়, সংস্কারগুলোর নিরোধের ফলে বিজ্ঞানের নিরোধ হয়, বিজ্ঞানের নিরোধের ফলে নামরূপের নিরোধ হয়, নামরূপের নিরোধের ফলে ছয়টিআয়তনের নিরোধ হয়, ছয়টি আয়তনের নিরোধের ফলে স্পর্শের নিরোধ হয়, স্পর্শের নিরোধের ফলে বেদনার নিরোধ হয়, বেদনার নিরোধের ফলে তৃষ্ণার নিরোধ

হয়, তৃষ্ণার নিরোধের ফলে আসক্তির নিরোধ হয়, আসক্তির নিরোধের ফলে ভবের নিরোধ হয়, ভবের নিরোধের ফলে জন্মের নিরোধ হয়, জন্মের নিরোধের ফলে জরা, মৃত্যু, শোক, বিলাপ, শারীরিক ব্যথা, মানসিক ব্যথা, এবং হতাশা নিরুদ্ধ হয়।'

(মধ্যমনিকায়, ৩৮)

আগের মতোই সংস্কারগুলোর কার্যকারণজাত এবং ক্ষণিক উৎপত্তি ও বিলয়গুলো দেখুন। এরপর এই দুটো পদ্ধতিকে একসাথে চর্চা করুন। উদাহরণস্বরূপ, অজ্ঞানতাকে দেখতে গিয়ে আপনি দেখবেন যে, অজ্ঞানতা সংস্কারের কারণ হয়; অজ্ঞানতার নিঃশেষ নিরোধের সাথে সাথে সংস্কারগুলোরও নিরোধ হয়; অজ্ঞানতা অনিত্য, সংস্কারগুলোও অনিত্য।

প্রতীত্যসমুৎপাদ-নীতির অন্যান্য অঙ্গগুলোকেও এভাবে চর্চা করুন। প্রতীত্যসমুৎপাদ-নীতিকে এভাবে অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিকভাবে দেখতে হবে, অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে নিয়ে।

সংস্কারগুলোর উদয়-বিলয় সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জনের জন্য এটি খুবই সংক্ষিপ্ত একটি আলোচনা মাত্র।

দশ উপক্লেশ (বিদর্শনের দশটি অপূর্ণতা)

এই ধাপে, উপর্যুক্ত পদ্ধতিগুলোর চর্চা করতে গিয়ে আপনার বিদর্শন আরও শক্তিশালী হয়ে উঠবে, এবং তখন বিদর্শনের দশ উপক্লেশ উৎপন্ন হতে পারে।

এই দশটি উপক্লেশ হচ্ছে : আলো *(ওভাসো)*, জ্ঞান *(ঞাণ)*, প্রীতি *(পীতি)*, প্রশান্তি *(পস্সদ্ধি)*, সুখ *(সুখ)*, আত্মবিশ্বাস *(অধিমোকখ)*, প্রচেষ্টা *(পগ্গহ)*, স্মৃতি *(উপটঠান)*, এবং আসক্তি *(নিকন্তি)*। এগুলোর মধ্যে কেবল আলো [আলো কুশল হতে পারে না] এবং আসক্তি কুশল মানসিক অবস্থা নয়। বাদবাকি আটটি হচ্ছে কুশল মানসিক অবস্থা, সেগুলো আসলে উপক্লেশ নয়। তবে তারা অকুশল অবস্থার কারণ হতে পারে যদি আপনি তাদের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েন। যদি এগুলোর কোনো একটি উপক্লেশের মুখোমুখি হন, তাহলে আপনার সেগুলোর প্রত্যেকটিকে দেখতে হবে অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম হিসেবে যাতে করে আপনি আসক্তি কাটিয়ে উঠতে পারেন এবং ক্রমান্বয়ে উন্নতি করতে পারেন।

ভঙ্গ জ্ঞান (বিলুপ্তি জ্ঞান)

সংস্কারগুলোর উৎপত্তি ও বিলয়ের জ্ঞান অর্জন করে আপনার সংস্কার সম্বন্ধীয় বিদর্শন এখন দৃঢ় এবং বিশুদ্ধ। এরপর অর্জন করতে হবে সংস্কারগুলোর ভঙ্গ জ্ঞান বা বিলুপ্তি জ্ঞান। এটি করতে গিয়ে সংস্কারগুলোর উৎপত্তিকে অগ্রাহ্য করে কেবল তাদের ক্ষণিক নিরোধ এবং বিলুপ্তির প্রতি মনোযোগ দিন। আপনি সংস্কারগুলোর উৎপত্তি-দশাকে দেখবেন না, সংস্কারগুলোর স্থিতিদশাকে দেখবেন না, কোনো একটি সংস্কারের নিমিত্তকেও দেখবেন না, অথবা সংস্কারগুলোর আদিকেও (পবত্ত) দেখবেন না। এই বিদর্শন জ্ঞানের শক্তির কারণে আপনি কেবল সংস্কারগুলোর বিলুপ্তিকেই দেখবেন।

ত্রিলক্ষণের মধ্যে অনিত্যকে দেখতে গিয়ে আপনি সংস্কারগুলোর ধ্বংস, পতন এবং বিলুপ্তিকে দেখুন। এরপরে দুঃখকে দেখার জন্য সংস্কারগুলোর বিরামহীন বিলুপ্তিকে ভয়ের চোখে দেখুন। এবং সবশেষে অনাত্মকে দেখার জন্য স্থায়ী কোনো কিছুর অনুপস্থিতিকে দেখুন।

কেবল নামরূপের বিলুপ্তিতে ত্রিলক্ষণকে দর্শন করলেই হবে না, বিদর্শন-মনগুলোর বিলুপ্তিতেও ত্রিলক্ষণকে দর্শন করতে হবে। অর্থাৎ, আপনি রূপের বিলুপ্তিকে দেখুন এবং জানুন যে এটি অনিত্য। এরপর দ্বিতীয় বিদর্শন-মন দ্বারা প্রথম বিদর্শন-মনের বিলুপ্তিকে দেখুন এবং জানুন যে এটিও অনিত্য। এভাবে নামকেও দেখতে হবে এবং একইভাবে নামরূপের বিলুপ্তিকে দেখতে হবে যাতে তাদেরকে দুঃখ এবং অনাত্ম হিসেবে জানতে পারেন। এই অনুশীলনগুলো বার বার চর্চা করতে হবে, অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিকভাবে পালাক্রমে চর্চা করতে হবে, নামরূপ, কার্যকারণজাত সংস্কার ও বিপাক সংস্কার, অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের মধ্যে।

অবশিষ্ট জ্ঞানগুলো

এভাবে সংস্কারগুলোর বিলয় এবং নিরোধকে দেখার চর্চা করতে করতে আপনার সুদৃঢ় ও শক্তিশালী বিদর্শন অবশিষ্ট বিদর্শন জ্ঞানগুলোর মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হবে। এগুলো হচ্ছে :

ভয় জ্ঞান
আদীনব জ্ঞান (বিপদের জ্ঞান)
নির্বেদ জ্ঞান (মোহমুক্তি জ্ঞান)
মুক্তিকাম্যতা জ্ঞান (বিমুক্তির জন্য আকাঙ্ক্ষার জ্ঞান)

প্রতিসংখ্যা জ্ঞান (চিন্তার জ্ঞান)
সংস্কারোপেক্ষা জ্ঞান (সংস্কারগুলোর প্রতি উপেক্ষা জ্ঞান)

যেহেতু আপনি প্রথম পাঁচটি বিদর্শন জ্ঞানকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে গঠন করেছেন, এই শেষের বিদর্শন জ্ঞানগুলো তাড়াতাড়ি গঠিত হবে। এগুলোর জন্য কয়েকটি নির্দেশনা আছে, তবে সেগুলো ব্যাখ্যার সময় এখন নেই।

এই বিদর্শন জ্ঞানগুলোর পরে, আপনি যখন প্রত্যেক সংস্কারের উদয়-বিলয়কে দেখতে থাকবেন, সেগুলো থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষায়, আপনি একসময় দেখবেন যে সব সংস্কার থেমে গেছে। আপনার মন সরাসরি এবং সম্পূর্ণ সচেতনভাবে সংস্কারহীন নির্বাণকে তার বিষয়বস্তু হিসেবে দেখবে।

এরপর আপনি চার আর্যসত্যের সত্যিকার জ্ঞানকে অর্জন করবেন এবং নিজে নিজেই নির্বাণকে উপলব্ধি করবেন। এই উপলব্ধির মাধ্যমে আপনার মন বিশুদ্ধ হয়ে যাবে এবং মিথ্যা দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মুক্ত হবে। যদি এভাবে ভাবনা করতে থাকেন, তাহলে আপনি অর্হত্ত্ব এবং পরিনির্বাণ লাভ করতে সক্ষম হবেন।

বিদর্শন ভাবনা বিষয়ে আরও অনেক কিছু আছে, কিন্তু সেগুলোকে আমার বাদ দিতে হয়েছে যাতে করে এই ব্যাখ্যা যতটা সম্ভব ছোট করে করা যায়। এই ভাবনা সম্পর্কে শেখার সবচেয়ে ভালো উপায়টা হচ্ছে কোনো সুদক্ষ গুরুর অধীনে একটি ভাবনা কোর্স করা, কারণ সেখানে আপনি একটা সিস্টেমের মধ্যে, ধাপে ধাপে শিখতে পারবেন।

প্রশ্নোত্তর পর্ব - ৭

প্রশ্ন ৭.১ : *সংজ্ঞা এবং সংজ্ঞাস্কন্ধের মধ্যে পার্থক্য কী? বেদনা এবং বেদনাস্কন্ধের মধ্যে পার্থক্য কী?*

উত্তর ৭.১ : এগার প্রকার সংজ্ঞাকে একত্রে বলা হয় সংজ্ঞাস্কন্ধ। এগার প্রকার বেদনা বা অনুভূতিকে একত্রে বলা হয় বেদনাস্কন্ধ। কোনো এগারটি? অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ, অভ্যন্তরীণ, বাহ্যিক, স্থূল, সূক্ষ্ম, হীন, উত্তম, কাছে এবং দূরে। সকল পঞ্চস্কন্ধকে এভাবে বুঝা উচিত। এর বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য দেখুন সংযুক্তনিকায়ের স্কন্ধবর্গের স্কন্ধ সুত্র।

প্রশ্ন ৭.২ : *স্মৃতি (memory), অনুমান, এবং সৃজনশীলতা এগুলো কোন চৈতসিকের অধীনে থাকে? তারা পঞ্চস্কন্ধের অংশ, কিন্তু তারা কীভাবে দুঃখ হয়?*

উত্তর ৭.২ : স্মৃতি কী? যদি আপনি অতীত, বর্তমান, এবং ভবিষ্যতের পরমার্থ নামরূপ এবং তাদের কারণগুলোকে স্মরণ করতে পারেন বা উপলব্ধি করতে পারেন এবং সেগুলোকে অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম হিসেবে দেখেন, তাহলে সেটিই সম্যক স্মৃতি, যে স্মৃতি বিদর্শন জ্ঞানের সাথে সম্পর্কিত। এই স্মৃতি চৌত্রিশ প্রকার চৈতসিকের সাথেও সম্পর্কযুক্ত, যা একত্রে চারটি নামস্কন্ধ গঠন করে। বুদ্ধ, ধর্ম, সংঘকে এবং অতীতে তাদের পূজা করাকে মনে করতে পারাটাও সম্যক স্মৃতি। কোনো কর্মের স্মরণের ফলে যদি কুশল ধর্ম উৎপন্ন হয়, তবে তাও সম্যক স্মৃতি, কিন্তু যদি অকুশল ধর্ম উৎপন্ন করে তাহলে সেটা সম্যক স্মৃতি নয়। এটি হচ্ছে অকুশল সংজ্ঞা, যে সংজ্ঞাগুলো অকুশল ধর্মের সাথে সম্পর্কযুক্ত। এগুলোও চারটি নামস্কন্ধ। কুশল এবং অকুশল নামস্কন্ধগুলো অনিত্য। উৎপন্ন হওয়া মাত্র তারা বিলীন হয়ে যায়। তারা প্রতিনিয়ত উদয়-বিলয়ের অধীন এবং সেজন্য তারা দুঃখ।

প্রশ্ন ৭.৩ : *'বিষয়বস্তু হিসেবে নেওয়া'র কাজে কোন চৈতসিক জড়িত?*

উত্তর ৭.৩ : সকল চিত্ত এবং চৈতসিকগুলোই কোনো একটি বিষয়বস্তু নেয়। বিষয়বস্তু ছাড়া তারা উৎপন্ন হতে পারে না। চিত্ত এবং চৈতসিকগুলো হচ্ছে কর্তা। আলম্বনীয় ধর্মগুলো *(আরম্মণিক-ধম্ম)* বিষয়বস্তু বা আলম্বন *(আরম্মণ)* ছাড়া উৎপন্ন হতে পারে না। আলম্বনীয় ধর্ম হচ্ছে একটি ধর্ম বা ঘটনা যার জন্য একটি বিষয়বস্তু লাগে। অন্য কথায় যে আলম্বনীয় ধর্ম তার বিষয়বস্তুকে জানে। বিভিন্ন গ্রুপের চিত্ত ও চৈতসিকগুলো বিভিন্ন বিষয়বস্তু গ্রহণ করে। ঊননব্বই প্রকার চিত্ত আছে, এবং বায়ান্ন প্রকার চৈতসিক আছে, তারা সবাই তাদের নিজ নিজ বিষয়বস্তু গ্রহণ করে। উদাহরণস্বরূপ, মার্গচিত্ত ও সহজাত চৈতসিক এবং ফলচিত্ত ও সহজাত চৈতসিকগুলো নির্বাণকে বিষয়বস্তু হিসেবে নেয়। আনাপান ধ্যানের চিত্ত এবং তৎসহজাত চৈতসিকগুলো একটিই বিষয়বস্তু নেয়, সেটি হচ্ছে আনাপান প্রতিভাগ-নিমিত্ত। কিন্তু, কামাবচর চিত্ত ভালো-মন্দ অনেক বিষয়বস্তু নেয়। যদি বিস্তারিত জানতে চান, তাহলে আপনার অভিধর্ম বিষয়ে পড়াশোনা করা উচিত, বিশেষ করে অভিধর্মার্থ-সংগ্রহের আলম্বন অংশে দেখুন।

প্রশ্ন ৭.৪ : *সংঘের কাজ কি একজনের ভাবনায় প্রভাব ফেলে? এটি কি ব্যক্তিবিশেষের উপর নির্ভর করে? নাকি ভাবনার একটি পর্যায়ে গিয়ে বাইরের কাজ আর কোনো প্রভাব ফেলে না?*

উত্তর ৭.৪ : অনেক সুত্রে বুদ্ধ ভিক্ষুদের নিম্নোক্ত কাজগুলো করার জন্য সমালোচনা করেছেন :

১. কর্মপ্রিয়
২. বাক্যপ্রিয়
৩. নিদ্রাপ্রিয়
৪. সঙ্গপ্রিয়
৫. ইন্দ্রিয়গুলোতে অসংযম
৬. ভোজনে মাত্রাজ্ঞানহীন
৭. অজাগরণশীল
৮. শমথ-বিদর্শন ভাবনায় অলস ভিক্ষু।

তাই যদি সংঘের জন্য অথবা নিজের জন্য কোনো কাজ করতে হয়, তাহলে সেটা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব করে ফেলার চেষ্টা করুন এবং এরপর শান্ত মন নিয়ে নিজের ভাবনায় ফিরে যান। কিন্তু যদি আপনি খুব বেশি কাজ করতে পছন্দ করেন, তাহলে সেটা ভাবনার জন্য একটি বাধা। সেই কর্মপ্রিয়তা ভালো সমাধি গড়ে তুলতে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। কারণ, এমন কর্মপ্রিয়তা নিয়ে সমাধিতে প্রবল ও শক্তিশালী স্মৃতি লাভ করা যায় না।

প্রশ্ন ৭.৫ : *কোনো ব্যক্তি যদি খারাপ উদ্দেশ্য নিয়ে ধ্যান লাভ করতে চায়, তাহলে সেই ধ্যান লাভ করে কি কোনো সুবিধা পাওয়া যাবে? অথবা উদাহরণস্বরূপ এক ব্যক্তি সংঘের টাকা নিজের ব্যক্তিগত কাজে খরচ করল, এবং সে এটিকে খারাপ হিসেবে মনে করল না। যখন সে চতুর্থ ধ্যান পর্যন্ত লাভ করবে, তার মন বা দৃষ্টিভঙ্গি কি পাল্টাবে?*

উত্তর ৭.৫ : এক্ষেত্রে আপনার একজন গৃহী ও একজন ভিক্ষুর মধ্যে পার্থক্য বুঝা উচিত। একজন ভিক্ষু কোনো আপত্তি করে থাকলে সেটা তার ধ্যান লাভের অন্তরায়। উদাহরণস্বরূপ, যদি সে সংঘের টাকা ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করে থাকে, তাহলে তার জন্য ধ্যান লাভ সহজ হবে না, যদি না সে তার আপত্তিকে সংশোধন করে। অর্থাৎ সে যত টাকা খরচ করেছে তার সমপরিমাণের জিনিসপত্র বা চতুর্প্রত্যয় ফেরত দিতে হবে। তারপর তাকে সংঘের সামনে অথবা অন্য কোনো ভিক্ষুর সামনে তার অপরাধ স্বীকার করতে হবে। অর্থাৎ তাকে একটি আপত্তি দেশনা করতে হবে। এভাবে তার দোষকে সংশোধন করে যদি সে শমথ-বিদর্শন চর্চা করে, তাহলে সে ধ্যান, মার্গ ও ফল লাভ করতে পারবে। যদি তার আপত্তিকে সংশোধন না করে সে সত্যিই ধ্যান লাভ করে থাকে, তাহলে হয়তো সে সত্যিকারের ভিক্ষু নয়, তাই এই অপরাধটা তার জন্য প্রকৃতপক্ষে কোনো অপরাধ নয়।

যদি ব্যক্তি গৃহী হয়, তাহলে ঘটনা অন্যরকম হয়ে দাঁড়ায়। গৃহী লোকদের

জন্য, ভাবনার সময়ে শীলবিশুদ্ধ থাকা আবশ্যক। ভাবনার সময়ে তাদের শীল যদি বিশুদ্ধ থাকে, তাহলে তারা ধ্যান লাভ করতে পারে, যদিও ভাবনার আগে হয়তো তারা দুষ্ট ছিল। উদাহরণস্বরূপ, ধর্মপদের অর্থকথায়, খুজ্জুত্তরা নামের এক দাসীর গল্প আছে। সে ছিল রাজা উদয়নের রাণী শ্যামাবতীর দাসী। প্রতিদিন রাজা উদয়ন তাকে রাণীর জন্য ফুল কিনে আনতে আটটি মুদ্রা দিতেন। প্রতিদিন খুজ্জুত্তরা চারটি মুদ্রা পকেটে রেখে দিত, এবং বাকি চারটি মুদ্রা দিয়ে ফুল কিনে আনত। একদিন, বুদ্ধ ভিক্ষুসংঘসহ ফুলওয়ালার বাড়িতে পিন্ডচারণের জন্য আসলেন। খুজ্জুত্তরা ফুলওয়ালাকে পিন্ডদান করতে সাহায্য করল। খাওয়ার পর্ব শেষে বুদ্ধ একটি ধর্মদেশনা দিলেন, এতে খুজ্জুত্তরা স্রোতাপন্ন হলো। সেদিন আর সে চারটি মুদ্রা পকেটে রেখে দিল না, পুরো আটটি মুদ্রা দিয়েই ফুল কিনে আনল। যখন সে ফুলগুলো রাণী শ্যামাবতীকে দিল, রাণী বেশি ফুল দেখে অবাক হলেন। তখন খুজ্জুত্তরা নিজের দোষ স্বীকার করল।

অঙ্গুলিমাল ভন্তের কথা ধরুন না। সে ছিল বিখ্যাত খুনী। কিন্তু ভিক্ষু হিসেবে সে তার শীল বিশুদ্ধ করল এবং কঠোর ভাবনা করল। তাই সে অর্হত্ত্ব লাভ করল। এই তথ্যটিও বিবেচনা করুন, এই সংসারচক্রে প্রত্যেকেই ভালো-মন্দ কর্ম করেছে। এমন কেউ নেই যে খারাপ কাজ থেকে মুক্ত। কিন্তু যদি তারা ভাবনা করার আগে তাদের শীলকে বিশুদ্ধ করে নেয়, তাহলে আগের খারাপ কাজগুলো আর তাদের ধ্যান লাভে বাধা দিতে পারে না। তবে সেই খারাপ কাজগুলো আনন্তরিক কর্ম হতে পারবে না। পাঁচটি আনন্তরিক কর্ম হচ্ছে :

১. নিজের মাকে হত্যা করা
২. নিজের বাবাকে হত্যা করা
৩. একজন অর্হৎকে হত্যা করা
৪. খারাপ উদ্দেশ্য নিয়ে বুদ্ধের দেহ থেকে রক্তপাত ঘটানো
৫. সঙ্ঘে বিভেদ সৃষ্টি করা

যদি এগুলোর কোনো একটি করা হয়ে যায়, তাহলে সে আর ধ্যান, মার্গ বা ফল কোনোটাই লাভ করতে পারে না, যেমন রাজা অজাতশত্রু। রাজা অজাতশত্রুর শ্রামণ্যফল সূত্র দেশনা শোনার পরে স্রোতাপন্ন হওয়ার মতো পারমী ছিল। কিন্তু, তিনি নিজের বাবা রাজা বিম্বিসারকে হত্যা করেছিলেন। এই খারাপ কাজ তাকে আর্যপুদগল হতে বাধা দিয়েছে।

আপনি জিজ্ঞেস করেছেন, এমন লোকের মন বা ধারণা পাল্টায় কি না।

ধ্যান দীর্ঘ সময় ধরে নীবরণগুলোকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারে। দীর্ঘ সময় বলতে আমি বুঝাচ্ছি যে যদি তারা এক ঘণ্টার জন্য ধ্যানে প্রবেশ করে, তাহলে সেই এক ঘণ্টা নীবরণগুলো ঝামেলা করতে পারে না। যখন তারা ধ্যান থেকে উঠে আসে, অযোনিশ মনস্কারের কারণে নীবরণগুলো আবার আসতে পারে। তাই আমরা নিশ্চিত করে বলতে পারি না সেই ব্যক্তি ধ্যান লাভ করতে পারবে কি না, তার মন পাল্টাবে কি না। আমরা কেবল বলতে পারি যে যখন সে ধ্যানে থাকবে, তখন নীবরণগুলো আসবে না।

এর ব্যতিক্রমও আছে, যেমন মহানাগ মহাথেরো। তিনি ছিলেন ধর্মদিন্ন নামের এক অর্হৎ ভিক্ষুর গুরু। তিনি ছয় বছর ধরে শমথ ও বিদর্শন চর্চা করেছিলেন কিন্তু তখনো পৃথকজন ছিলেন। যদিও তিনি পৃথকজন ছিলেন, কোনো ক্লেশ তার কাছে ঘেঁষতে পারে নি তার শক্তিশালী শমথ ও বিদর্শন ভাবনার কারণে। এ কারণে তিনি ভেবেছিলেন তিনি একজন অর্হৎ। কিন্তু তার শিষ্য ধর্মদিন্ন জানত তিনি অর্হৎ নন, এখনো পৃথকজন। তাই ধর্মদিন্ন তাকে পরোক্ষভাবে উপলব্ধি করাল যে তিনি এখনো পৃথকজন। যখন মহানাগ মহাথেরো আবিষ্কার করলেন যে তিনি এখনো পৃথকজন, তিনি বিদর্শনে মন দিলেন এবং কয়েক মিনিটের মধ্যে অর্হত্ত্ব লাভ করলেন। কিন্তু এটি হচ্ছে চরম ব্যতিক্রমী একটা ঘটনা।

আপনার এই জিনিসটিও স্মরণে রাখা উচিত : তিনি ছিলেন পরিয়ত্তি ও প্রতিপত্তিতে দক্ষ। তিনি ছিলেন একজন ভাবনা গুরু, তার ধর্মদিন্নের মতো অনেক অর্হৎ শিষ্য ছিল। যদিও তিনি শমথ-বিদর্শন ভাবনায় দক্ষ ছিলেন, তিনি একই ধরনের অভিজ্ঞতাকে অর্হত্ত্ব বলে ভুল ভেবেছিলেন। তাই যদি আপনি ভেবে থাকেন যে 'আমি প্রথম ধ্যান লাভ করেছি, ইত্যাদি' তাহলে আপনার অভিজ্ঞতাকে অনেক দিন ধরে, অনেক মাস ধরে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নিরীক্ষণ করা উচিত। কেন? যদি এটি সত্যিকারের ধ্যান হয়, সত্যিকারের বিদর্শন হয়, তাহলে সেগুলো আপনার জন্য উপকারী, তারা আপনাকে নির্বাণ লাভে সাহায্য করবে। আর নির্বাণ হচ্ছে থেরবাদী বৌদ্ধধর্মে বিশুদ্ধ-ভূমি (Pure land)। কিন্তু কৃত্রিম ধ্যান এবং কৃত্রিম বিদর্শন এই সুবিধাটা দিতে পারে না। আপনি কি আসল সুবিধা চান নাকি নকল সুবিধা চান? আপনার নিজেকে এই প্রশ্ন করা উচিত।

তাই আমি পরামর্শ দিতে চাই যে, অন্যদের খুব শীঘ্রই বলবেন না, 'আমি প্রথম ধ্যান পেয়েছি, ইত্যাদি', কারণ এতে হয়তো কেউ একজন বিশ্বাস করবে না। আপনার অভিজ্ঞতা হয়তো সত্যি, কিন্তু এটি মহানাগ মহাথেরোর মতো

ভুলও হতে পারে। তাই এই সমস্যার ব্যাপারে আপনাদের সতর্ক থাকা উচিত।

প্রশ্ন ৭.৬ : *কলাপ ও পরমার্থ রূপের মধ্যে পার্থক্য কী?*

উত্তর ৭.৬ : কলাপ হচ্ছে ক্ষুদ্র কণা। ভাবনাকারী যখন কলাপগুলোকে বিশ্লেষণ করেন, তখন তিনি পরম রূপকে দেখেন। একটি কলাপে কমপক্ষে আট প্রকার রূপ থাকে। এগুলো হচ্ছে : পৃথিবীধাতু, আপধাতু, তেজধাতু, বায়ুধাতু, বর্ণধাতু, গন্ধধাতু, রসধাতু এবং ওজধাতু। এই আটটি ধাতু হচ্ছে পরম রূপ। কিছু কিছু কলাপে নবম একটি ধাতুও থাকে : জীবিত-রূপ। অন্যান্য কলাপে দশম রূপও থাকে : ভাবরূপ অথবা প্রসাদ-ধাতুরূপ (স্বচ্ছ ধাতুরূপ)। এই আট, নয় অথবা দশটি ধাতু হচ্ছে সকলেই পরম রূপ।

প্রশ্ন ৭.৭ : *কলাপ এবং পরম রূপকে দেখতে সমর্থ হলে কোনো ভাবনাকারীর চিত্ত ও দৃষ্টিভঙ্গি কি পাল্টায়?*

উত্তর ৭.৭ : যখন সে বিদর্শন জ্ঞানের দ্বারা প্রত্যেক কলাপের পরম রূপকে দেখে, তার মন এবং দৃষ্টি পাল্টায়, কিন্তু কেবল সাময়িকভাবে। কারণ, বিদর্শন জ্ঞান দৃষ্টি এবং অন্যান্য ক্লেশগুলোকে কেবল সাময়িকভাবে দূর করে দেয়। এটি হচ্ছে আর্যমার্গ যা ধাপে ধাপে মিথ্যাদৃষ্টি এবং অন্যান্য ক্লেশকে সম্পূর্ণরূপে দূর করে দেয়।

প্রশ্ন ৭.৮ : *কীভাবে সমাধি চিত্তবিশুদ্ধি করে? সমাধির মাধ্যমে কোন ধরনের ক্লেশগুলো দূরীভূত হয়?*

উত্তর ৭.৮ : সমাধির চর্চা হচ্ছে পঞ্চ নীবরণের সরাসরি বিপরীত। উপচার এবং প্রথম ধ্যান সমাধি পঞ্চ নীবরণকে দীর্ঘ সময়ের জন্য দূরে রাখে। দ্বিতীয় ধ্যান বিতর্ক ও বিচারকে দূরে রাখে। তৃতীয় ধ্যান প্রীতিকে দূর করে। চতুর্থ ধ্যান সুখকে দূর করে। এভাবে মন সমাধি দ্বারা বিশুদ্ধ হয় এবং এটাকেই বলা হয় চিত্তবিশুদ্ধি।

প্রশ্ন ৭.৯ : *বিদর্শন কীভাবে দৃষ্টিবিশুদ্ধি করে? কোন ধরনের ক্লেশগুলো বিদর্শন দ্বারা দূরীভূত হয়?*

উত্তর ৭.৯ : পরমার্থ নামরূপ, তাদের কারণগুলো এবং তাদের অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম স্বভাবকে দেখার আগে ভাবনাকারীর এই মিথ্যা দৃষ্টিভঙ্গি থাকতে পারে, যেমন : 'এটি একটি পুরুষ, মহিলা, মা, বাবা, আত্ম বা নিজ, ইত্যাদি।' কিন্তু যখন সে পরমার্থ নামরূপ, তাদের কারণগুলো, তাদের অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম স্বভাবকে দেখে, এই মিথ্যাদৃষ্টি সাময়িকভাবে দূরীভূত হয়। সাময়িকভাবে কেন? সে কেবল পরমার্থ নামরূপ ও তাদের কারণগুলোকে

দেখে। সে আরও দেখে যে উৎপন্ন হওয়া মাত্রই তারা বিলীন হয়ে যায়, যা তাদের অনিত্য স্বভাব। তারা সব সময়ই উদয়-বিলয়ের অধীন, যা তাদের দুঃখ স্বভাব। এই নামরূপ এবং তাদের কারণগুলোতে কোনো আত্ম বা নিজ বলে কিছু নেই, যা তাদের অনাত্ম স্বভাব। এটিই বিদর্শন জ্ঞান। এটিই সম্যক দৃষ্টি, যা মিথ্যাদৃষ্টিকে দূরীভূত করে।

অতএব, যখন ভাবনাকারী বিদর্শন ভাবনায় থাকে, তখন সম্যক দৃষ্টি বর্তমান থাকে। কিন্তু, যখন সে বিদর্শন ভাবনা বন্ধ করে তখন অযোনিশ বা অদক্ষ মনোযোগের কারণে দৃষ্টিভঙ্গি আবার আগের মতো মিথ্যাদৃষ্টিতে পরিণত হয়। সে আবার আগের মতো দেখে : 'এটি একটি পুরুষ, মহিলা, মা, বাবা, আত্ম, ইত্যাদি।' এর সাথে সংশ্লিষ্ট ক্লেশ যেমন, আসক্তি, অহংকার, ক্রোধ ইত্যাদিও তখন ফিরে আসে। কিন্তু যখন বিদর্শন ভাবনায় ফিরে যায়, এই মিথ্যাদৃষ্টি আবার দূরীভূত হয়। তবে যখন সে মার্গফল লাভ করে, তার মার্গজ্ঞান সেই মিথ্যাদৃষ্টি এবং অন্যান্য ক্লেশগুলোকে ধাপে ধাপে, সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে।

প্রশ্ন ৭.১০ : *চিত্ত ও দৃষ্টির মধ্যে পার্থক্য কী?*

উত্তর ৭.১০ : চিত্ত মানে মন, কিন্তু চিত্তবিশুদ্ধিতে চিত্ত বলতে বিশেষ করে বুঝায় : উপচার সমাধি চিত্ত অথবা অর্পণা সমাধি চিত্তকে। দৃষ্টি মানে মিথ্যাদৃষ্টি, এবং এটি একটি চৈতসিক। এটি চারটি মিথ্যাদৃষ্টি-সংযুক্ত লোভমূলক চিত্তের সাথে সাথে উৎপন্ন হয়।

একটি মিথ্যাদৃষ্টি হচ্ছে আত্মসংজ্ঞা। দু ধরনের আত্মসংজ্ঞা আছে। একটি সংজ্ঞা হচ্ছে এটি পুরুষ, এটি মহিলা, মা, বাবা, ইত্যাদি। এই মিথ্যাদৃষ্টি হচ্ছে প্রচলিত রীতিনীতির ফসল। আমরা এটিকে বিশ্বজগতের সাধারণ আত্মবাদী দৃষ্টি বলি। অন্য সংজ্ঞাটি হচ্ছে একটি ধ্বংস হয় না এমন কোনো আত্মার ধারণা। আমরা এটিকে বলি আত্মদৃষ্টি। এ ছাড়াও আরও দৃষ্টিভঙ্গি আছে যে এই শাশ্বত (ধ্বংসহীন) আত্মা কোনো সৃষ্টিকর্তা দ্বারা সৃষ্ট, যাকেও আত্মদৃষ্টি বলা হয়।

এই একত্রিশটি জগৎ বা লোকভূমিতে কোনো আত্মা নেই, কেবল নামরূপ এবং তাদের কারণগুলো বিদ্যমান। তারা সব সময় অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম। এই একত্রিশটি জগতের বাইরেও কোনো আত্মা নেই। এই বিদর্শন জ্ঞান হচ্ছে সম্যক দৃষ্টি। এটি মিথ্যাদৃষ্টিকে সাময়িকভাবে দূরীভূত করে, আত্মবাদসহ। কিন্তু মার্গজ্ঞান, যা হচ্ছে মার্গ-সম্যক দৃষ্টি, তা মিথ্যাদৃষ্টিকে সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত করে। তাই আমরা আসলে তিন ধরনের দৃষ্টি দেখতে পাই : মিথ্যাদৃষ্টি

যা লৌকিক, মার্গ-সম্যক দৃষ্টি এবং লোকোত্তর দৃষ্টি।

ব্রহ্মজাল সূত্রে সকল বাষট্টি প্রকার মিথ্যাদৃষ্টিকে আলোচনা করা হয়েছে। সেগুলো সবই নিজের সম্পর্কে মিথ্যা ধারণা। নিজের সম্পর্কে এই মিথ্যা ধারণাকে বলা হয় সৎকায় দৃষ্টি (ব্যক্তি সম্পর্কে ভুল ধারণা)। সৎকায় হচ্ছে পঞ্চস্কন্ধ, তাই সৎকায় দৃষ্টি পঞ্চস্কন্ধকে আত্মা হিসেবে দেখে। অনেক ধরনের সঠিক ধারণা আছে। যেমন ধ্যান-সম্যক দৃষ্টি, যা হচ্ছে ধ্যানাঙ্গগুলোর সাথে সংশ্লিষ্ট ধ্যানময় প্রজ্ঞা; নামরূপ-পরিগ্রহ সম্যক দৃষ্টি, যা হচ্ছে পরমার্থ নামরূপের বিদর্শন জ্ঞান; কর্মফল সম্যক দৃষ্টি, যা হচ্ছে কার্যকারণ সম্বন্ধে জ্ঞান; বিদর্শন-সম্যক দৃষ্টি, যা হচ্ছে নামরূপ এবং তাদের কারণগুলোর অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম স্বভাবকে দেখা; মার্গ-সম্যক দৃষ্টি এবং ফল-সম্যক দৃষ্টি যা নির্বাণকে দেখে। এ সকল সম্যক দৃষ্টিকে বলা হয় চারি সত্য সম্যক দৃষ্টি।

প্রশ্ন ৭.১১ : *ভাবনাকারী কীভাবে তার দৈনন্দিন জীবনে এবং শমথ-বিদর্শন ভাবনায় যোনিশ মনোযোগের চর্চা করতে পারে?*

উত্তর ৭.১১ : সবচেয়ে বিজ্ঞতাসুলভ মনোযোগ হচ্ছে বিদর্শন। যদি আপনি বিদর্শনের স্তর পর্যন্ত চর্চা করে থাকেন, তাহলে আপনার সত্যিকারের বিজ্ঞতাসুলভ মনোযোগ থাকবে। তখন যদি আপনি দৈনন্দিন জীবনে বিদর্শন চর্চা করেন, তাহলে এটি ভালো ফল দেবে, যেমন এটি মার্গফল দেবে, যা নির্বাণকে দেখে। কিন্তু, যদি আপনি বিদর্শনের স্তর পর্যন্ত পৌঁছাতে না পারেন, তাহলে আপনাকে এই তথ্য বিবেচনায় রাখতে হবে যে সকল সংস্কার অনিত্য। এটিও যোনিশ মনোযোগ, কিন্তু খুব দুর্বল এবং সেকেন্ড হ্যান্ড।

আপনি চারটি ব্রহ্মবিহার, বিশেষ করে উপেক্ষা ব্রহ্মবিহার চর্চা করতে পারেন। এটি হচ্ছে উৎকৃষ্ট যোনিশ মনোযোগ, কারণ উপেক্ষা-ভাবনা করতে গিয়ে আপনি কর্মনিয়মকে দেখেন 'সব্বে সত্তাকম্মসকা'—'সকল প্রাণীই তাদের নিজ নিজ কর্মের কর্তা'। এ ছাড়া আপনি অযোনিশ মনোযোগ বা অবিজ্ঞতাসুলভ মনোযোগের ফলগুলো ভাবতে পারেন। অযোনিশ মনোযোগ একের পর এক অনেক অকুশল কর্মের কারণ হয়। এই অকুশল কর্মগুলো চার অপায়ে দুঃখ দেয়। এভাবে জানাটা হচ্ছে যোনিশ মনোযোগ। এভাবেই আপনার দৈনন্দিন জীবনে যোনিশ মনোযোগের চর্চা করা উচিত।

প্রশ্ন ৭.১২ : *যদি পঞ্চস্কন্ধ অনাত্ম হয়, তাহলে সেয়াদ, কে ধর্মদেশনা দিচ্ছে? অন্য কথায় যদি পঞ্চস্কন্ধ অনাত্ম হয়, তাহলে সেয়াদও ধর্মদেশনা দিচ্ছেন না। তাই, পঞ্চস্কন্ধ এবং আত্মার মধ্যে কি কোনো সম্পর্ক আছে?*

উত্তর ৭.১২ : দু ধরনের সত্য আছে : সম্মতি-সত্য এবং পরমার্থ-সত্য। এই দুটো সত্যের মধ্যে তফাৎটা বুঝা উচিত আপনার। সম্মতি-সত্য অনুসারে বুদ্ধ আছে, সেয়াদ আছে, বাবা আছে, মা আছে ইত্যাদি। কিন্তু পরমার্থ-সত্য অনুসারে কোনো বুদ্ধ নেই, কোনো সেয়াদ নেই, কোনো বাবা নেই, মা নেই ইত্যাদি। যথেষ্ট শক্তিশালী বিদর্শন জ্ঞান থাকলে আপনি নিজেই এটি দেখতে পাবেন। যদি আপনি বুদ্ধের দিকে বিদর্শন জ্ঞান নিয়ে তাকান, তাহলে দেখবেন কেবল পরমার্থ নামরূপকে, যা হচ্ছে পঞ্চস্কন্ধ। সেগুলো অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম। সেখানে কোনো আত্মা নেই। একইভাবে আপনি যদি আমার দিকে তাকান, বাবা অথবা মা ইত্যাদির দিকে তাকান, তাহলে সেই বিদর্শন জ্ঞানে আপনি দেখবেন কেবল পরমার্থ নামরূপকে, পঞ্চস্কন্ধকে; যা অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম। সেখানে কোনো আত্মা নেই। অন্য কথায় কোনো বুদ্ধ নেই, সেয়াদ নেই, বাবা, মা ইত্যাদি নেই। পঞ্চস্কন্ধ এবং তাদের কারণগুলোকে বলা হয় সংস্কার। তাই সংস্কার সংস্কার সম্বন্ধে কথা বলছে, মাঝে মাঝে নির্বাণ সম্পর্কে কথা বলছে। সেখানে কোনো আত্মা নেই। তাই সেখানে সম্পর্কের কথা আসছে কীভাবে?

উদাহরণস্বরূপ, যদি আপনাকে কেউ জিজ্ঞেস করে, 'খরগোশের শিংগুলো লম্বা না খাটো?' আপনি কীভাবে উত্তর দেবেন? অথবা যদি জিজ্ঞেস করা হয়, 'কচ্ছপের লোমগুলো কালো নাকি সাদা?' কীভাবে উত্তর দেওয়া উচিত? আত্মা বা নিজ যদি না-ই থাকে, সেখানে তো আর আমরা পঞ্চস্কন্ধের সাথে নিজের সম্পর্কের কথা বলতে পারি না। বুদ্ধও এ ধরনের প্রশ্নের উত্তর দেন নি। কেন? ধরুন আপনি বললেন খরগোশের শিংগুলো লম্বা; তার মানে আপনি মেনে নিয়েছেন যে খরগোশের শিং আছে। আর যদি আপনি বলেন যে খরগোশের শিংগুলো খাটো। সেটাও বুঝায়, তাদের যে শিং আছে এই ধারণা আপনি গ্রহণ করেছেন। আবার যদি আপনি বলেন কচ্ছপের লোমগুলো কালো, তার মানে আপনি কচ্ছপের লোম আছে বলে মেনে নিলেন। আর যদি বলেন যে কচ্ছপের লোমগুলো সাদা, তাতেও বুঝা যায় যে কচ্ছপের লোম আছে ব্যাপারটা আপনি মেনে নিয়েছেন। একইভাবে বুদ্ধ যদি বলতেন যে পঞ্চস্কন্ধ এবং আত্মা বা নিজ সম্পর্কযুক্ত তাহলে তার মানে হতো যে আত্মা আছে তিনি এই ধারণা গ্রহণ করেছেন। আর যদি তিনি বলতেন যে পঞ্চস্কন্ধের সাথে আত্মার কোনো সম্পর্ক নেই, তাহলে তাতেও বুঝাত যে তিনি স্বীকার করেন যে একটি আত্মা আছে। এজন্যই বুদ্ধ এ ধরনের প্রশ্নের উত্তর দেন নি। তাই আমি পরামর্শ দেব, আপনারা বিদর্শনের স্তর পর্যন্ত ভাবনা চর্চা করুন। কেবল

তখনিই এই আত্মবাদের ধারণা মুছে ফেলতে পারবেন।

প্রশ্ন ৭.১৩ : *বুদ্ধ ভিক্ষুদের সাপের মন্ত্র শিখিয়েছিলেন। সাপের এই মন্ত্রটা আবৃত্তি করা কি মৈত্রী-ভাবনার মতোই? মন্ত্র আবৃত্তি কি ব্রাহ্মণ্যবাদ থেকে বৌদ্ধধর্মে এসেছে?*

উত্তর ৭.১৩ : মন্ত্র কী? সাপের মন্ত্রই বা কী? আমি জানি না হিন্দুধর্ম থেকে কোনো মন্ত্র এসেছে কি না। কিন্তু থেরবাদী শাস্ত্রগুলোতে একটি পরিত্রাণ সূত্র আছে যাকে বলা হয় খন্ধ পরিত্রাণ। বুদ্ধ ভিক্ষুদের এই পরিত্রাণ সূত্রটি প্রতিদিন আবৃত্তি করতে বলেছেন। বিনয়ের একটি নিয়ম আছে, যাতে বলা আছে যে যদি কোনো ভিক্ষু বা ভিক্ষুণী এই পরিত্রাণ সূত্রটি দিনে কমপক্ষে একবার আবৃত্তি না করে, তাহলে তার আপত্তি হবে। একবার বুদ্ধের সময়ে অরণ্যচারী এক ভিক্ষুকে বিষধর সাপ কামড় দিয়েছিল। সে মারা গিয়েছিল। এ কারণে বুদ্ধ খন্ধ পরিত্রাণ শিখিয়েছেন। এই পরিত্রাণ সূত্রের কাজ মৈত্রী-ভাবনার মতো। এই সূত্রে বিভিন্ন ধরনের সাপ বা অন্যান্য সাপ জাতীয় প্রাণীদের কাছে বিভিন্নভাবে মৈত্রী বিস্তারের কথা আছে। ত্রিরত্ন এবং বুদ্ধ ও অর্হৎদের নিয়েও সত্যক্রিয়ার কথা আছে। আমি এই সূত্রটা আজ রাতে আবৃত্তি করব। এটি খুবই শক্তিশালী। আপনি এটিকে সাপের মন্ত্র বলতে পারেন। নামটি গুরুত্বপূর্ণ নয়। আপনি এটিকে যে নামে খুশি বলতে পারেন। বার্মার কিছু ভিক্ষু বিষধর সাপে কাটা ব্যক্তিদের জন্য এই সূত্র প্রয়োগ করে। এটি কার্যকর। যখন তারা এই সূত্র অনেকবার আবৃত্তি করে, বিষ ধীরে ধীরে নেমে যায়। সাধারণত তারা সুস্থ হয়ে ওঠে। কিন্তু প্রত্যেক ক্ষেত্রে ফল যে একই হয়, তা নয়। বুদ্ধ ভিক্ষুদের সাপের কামড় থেকে বাঁচার জন্য এই সূত্রের শিক্ষা দিয়েছেন। কোনো ভিক্ষু যদি শ্রদ্ধার সাথে এই পরিত্রাণ সূত্র পাঠ করে, এবং সকল প্রাণীর প্রতি মৈত্রী দেয়, সাপগুলোর প্রতিও, তাহলে তার কোনো বিপদ হবে না। সাধারণত যদি সে শীলগুলো পালন করে ভালোভাবে, তাতেও কোনো বিপদ হয় না। ❑

—ঃ সমাপ্ত ঃ—

ভাবনাকারীদের জন্য নির্দেশনা

ভাবনা করার সময়সূচি :
সকাল ৪:০০ - ৫:৩০
সকাল ৭:৩০ - ৯:০০
দুপুর ১:০০ - ২:৩০
বিকাল ৩:৩০ - ৫:০০
সন্ধ্যা ৬:০০ - ৭:৩০

১. ভাবনা করার সময়সূচিটা পা-অক বনবিহারের। তবে আপনারা নিজেদের সুবিধামতো করে কমপক্ষে পাঁচবার এবং প্রতিবারে ন্যূনতম এক ঘণ্টা বসে ভাবনা করতে পারেন মতো করে একটি রুটিন বানিয়ে নিন।

২. শুধু ভাবনার সময় নয়, বাদবাকি সময়েও ভাবনা চালিয়ে যাওয়া উচিত। দাঁড়িয়ে, বসে, শুয়ে থেকেও ভাবনা চালিয়ে যাওয়া উচিত।

৩. সবচেয়ে ভালো হয় সরাসরি মায়ানমারে পা-অক বনবিহারে গিয়ে ভাবনা করতে পারলে। সেখানে যাওয়ার দিকনির্দেশনা দেওয়া আছে মোনেয়্য ভিক্ষুর লেখা Teach and Train নামক বইয়ে। ওয়েবে একটু খোঁজ করলেই বইটি পেয়ে যাবেন। সেখানে বিস্তারিত লেখা আছে মায়ানমারে যাওয়ার নিয়ম, সেখানে থাকার নিয়ম, কী কী লাগবে ইত্যাদি।

পা-অক সম্বন্ধীয় তথ্যাবলীর জন্য অথবা সেখানে থাকার জন্য যেতে পারেন নিম্নোক্ত ওয়েবসাইটগুলোতে, অথবা এখানে দেওয়া ব্যক্তিদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন চিঠি লিখে, ফোনে, অথবা ই-মেইলের মাধ্যমে।

ওয়েবসাইট :

মালয়েশিয়া– www.Dhamma-s.org (চাইনিজ লেখা)
সিঙ্গাপুর – www.paaukforestmonastery.org
আমেরিকা – www.paauk.org

মায়ানমারের ভাবনা কেন্দ্রের ঠিকানায় চিঠি লিখতে পারেন বা ফোন করতে পারেন :

● Pa-Auk Forest Monastery
Mawlamyine, Mon State, Myanmar
Tel : (95) 57-27853 / (95) 57-27548

● International Buddhasāsana Meditation Centre
(Pa-Auk Tawya Branch)
Thilawar Road (near Kyaik-Khauk Pagoda)
Payargon Village, Than Lyin Township, Yangon

Tel : (95) 56-21927

ব্যক্তিগত যোগাযোগ করতে পারেন নিম্নোক্ত ব্যক্তিদের সাথে ফোনে, চিঠি অথবা ই-মেইলে :

● Mr & Mrs Yip Seng Foo
No-69 (A), University Avenue St
Bahan Township, Yangon
Tel : (95) 1-504011 / (95) 1-704314
E-mail : bluestar@mptmail.net.mm

● Daw Amy (Ms. Amy)
66 A, Sayarsan Road, Bahan Township, Yangon
Tel : (95) 1-548129 / (95) 1-556355
E-mail : attbbpp@myanmar.com.mm

● U Aung Pyone (Mr. Aung Pyone)
No (32), Kwet Thit St, Yay Kyaw (7th Qtr, near YMBA)
Pazundaung Township, Yangon
Tel : (95) 1-293847
E-mail : uap@mail4u.com.mm

আন্তর্জাতিক যোগাযোগের ঠিকানা

চীন

● Mdm. Liang Xinxin
Attention : Ms Ah Min
Guangzhou, Peoples Republic of China

Tel : (86) 20-84232438
E-mail : kaixinhuanzhaonin@126.com

জাপান

● Myanmar Theravāda Buddhist Association
Attention : Ko Ye Tun, Tokyo, Japan
Tel : (81) 90-22209886

মালয়েশিয়া

● Tusita Hermitage (Monastery)
Bodhivana Buddhist Hermitage (Nunnery)
c/o Kuching Bhagavan Buddhist Society
E-mail : jongjyi@gmail.com
Website : www.bhagavan.com.my
Contact : Sister Subha
52, Lot 3700, Dogan Garden, Jalan Dogan
93250 Kuching, Sarawak
Tel : +6012-8867353

● Nibbinda Forest Monastery
Mukim 5, Tempat Bukit Balik Pulau, Penang
Contact : Lee Hooi Chin
8N, Jalan Tunggal of Jalan Satu
11400 Air Hitam, Penang
Tel : +6012-4811984
E-mail : hclee7319@yahoo.com

● Nandaka Vihara Meditation Society
Lot 1250, Mukim 17, Off Jalan Kolam
Cheruk Tokun, 14000 Bukit Mertajam, Penang
APPENDIX IV : PA-AUK RESOURCE GUIDE 83
Contact : Ng Soon Beng
Tel : +6012-4855770 / +6016-4401250 (Chinese)
Email : nandakavihara@gmail.com

সিঙ্গাপুর

● Pa-Auk Meditation Centre (Singapore)
15, Teo Kim Eng Road, Singapore 416385
Tel : (65) 6611-9242 • Fax : (65) 6611-9242

E-mail : paauk.mc07@yahoo.com.sg
Contact : Teoh Soon Seng
E-mail : teohss@singnet.com.sg

● Cakkavala Meditation Centre
E-mail : cakkavala_sg@yahoo.com.sg
Tel : (65) 98488384 – Dr Ng Wai Chong

● Visuddha Meditation Centre
34 Bedok Walk, Singapore 469135
Tel : (65) 90101663
E-mail : visuddha77@yahoo.com.sg

শ্রীলঙ্কা

● Nā Uyana Āranya (monastery)
Pansiyagama 60554
Tel : (94) 37-3379036
E-mail : nauyana@gmail.com

● Dhammika Ashrama (nunnery)
Angulgamuwa, Pansiyagama 60554
Tel : (94) 37-5671258
E-mail : dhammikashrama@gmail.com

তাইওয়ান

● Taiwandipa Theravada Buddhist College
No 1 lane 85, Ming Chuen St. 8
Guei Ren Siang, 71148, Tainan
Tel : (886) 6-2301406 • Fax : (886) 6-2391563
E-mail : taiwandipa@gmail.com
APPENDIX IV : PA-AUK RESOURCE GUIDE
84

● Buddhist Hongshi College
No. 121-5, 11 Lin, Ta-toung Tsun, Kuan-yin Hsiang
Tau-yuan Hsien, Taiwan, 328, R.O.C.
E-mail : hong.shi@msa.hinet.net
Contact : Ven. Shih Shin Kuang
E-mail : 1220ssk@gmail.com

আমেরিকা

● Roland Win
15 Palmdale Ave, Daly City, CA 94015-3708
Tel : (1) 650-994-3750
E-mail : rolandwin15@gmail.com

● Robert Cusick
P.O. Box 151533-1533, San Rafael, CA 94915
Tel : (1) 415-847-1302 (mobile)
Skype ID : robertcusick
E-mail : robertcusick@gmail.com

● Ching-Der Wang
18525 38th Ave. N., Plymouth, MN 55446
Tel : (1) 763-478-8954
E-mail : USRC4439762@Usfamily.Net

আমি যতদূর জানি, থাইল্যান্ড বা সিঙ্গাপুর থেকে মায়ানমারের ভিসা পাওয়া সবচেয়ে সহজ। তাই নিচে এই দুটো দেশে অবস্থিত মায়ানমারের দূতাবাসগুলোর ঠিকানা দেওয়া হলো :

ব্যাংককের মায়ানমারের দূতাবাস :

● Embassy of the Union of Myanmar
132 Sathorn Nua Road, Bangkok, 10500
Tel : (66) 2-233-2237/ (66) 2-234-4698
Open : 9 : 00-11 : 30 am and 1 : 00-3 : 00 pm, Monday – Friday

সিঙ্গাপুরের মায়ানমারের দূতাবাস :

● Embassy of the Union of Myanmar
15 St Martin's Drive, Singapore 257996
Tel : (65) 67350209 • Fax : (65) 67356236
Open : 9 : 30 am - 12 : 30 pm, Monday – Friday

ভদন্ত করুণাবংশ ভিক্ষু অনূদিত ও সংকলিত কিছু বই :

১. বিনয়পিটকে পাচিত্তিয় (অনুবাদ) মূল্য : ২০০/-
২. পরিবাস দীপনী ও সানুবাদ কম্মবাচা মূল্য : ১৫০/-
৩. আধুনিক পালি ভাষা শিক্ষা (প্রথম খণ্ড) মূল্য : ৫০/-
৪. আধুনিক পালি ভাষা শিক্ষা (দ্বিতীয় খণ্ড) মূল্য : ১০০/-
৫. উচ্চতর পালি ভাষা শিক্ষা মূল্য : ১০০/-
৬. পট্‌ঠানুদ্দেস-দীপনী (অনুবাদ) মূল্য : ৫০/-
৭. যমক (প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড) (অনুবাদ) (পুরো সেট) মূল্য : ৬০০/-
৮. অপদান (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড) (অনুবাদ) (পুরো সেট) মূল্য : ৫৫০/-
৯. ৰেঙ্গৰ্ৰ্ৰ্ৰ (চাঙমা লেখা শেখার বই) মূল্য : ২৫/-

ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি হতে প্রকাশিত বইয়ের তালিকা

১. খুদ্দকনিকায়ে উদান ২০০/-
অনুবাদ : শ্রীমৎ জ্যোতিপাল ভিক্ষু

২. খুদ্দকনিকায়ে মহানির্দেশ ৩০০/-
অনুবাদকমণ্ডলী : শ্রীমৎ ইন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষু, শ্রীমৎ বঙ্গীশ ভিক্ষু
শ্রীমৎ অজিত ভিক্ষু, শ্রীমৎ সীবক ভিক্ষু

৩. খুদ্দকনিকায়ে অপদান (প্রথম খণ্ড) ৩৫০/-
অনুবাদ : ভদন্ত করুণাবংশ ভিক্ষু

৪. খুদ্দকনিকায়ে অপদান (দ্বিতীয় খণ্ড) ২০০/-
অনুবাদ : ভদন্ত করুণাবংশ ভিক্ষু

৫. খুদ্দকনিকায়ে চুলনির্দেশ ২০০/-
অনুবাদকমণ্ডলী : শ্রীমৎ ইন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষু, শ্রীমৎ পূর্ণজ্যোতি ভিক্ষু
শ্রীমৎ অজিত ভিক্ষু, শ্রীমৎ সীবক ভিক্ষু

* বই পেতে সরাসরি ফোন করুন : ০১৫২-১২৪১৩৬৯